মাশুল

শক্তিপদ রাজগুরু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৭

প্রিয় বন্ধু
প্রখ্যাত গীতিকার মোহিনী চৌধুরীর
স্মৃতির উদ্দেশে

লেখকের অন্যান্য বই

দিনের প্রথম আলো
অধিকার
অনিকেত
দিন অবসান
পরিক্রমা
শেষ প্রহর
সপ্তম গোস্বামী
রূপান্তর
মেঘে ঢাকা তারা
ঈশ্বরের ঠিকানা
গোঁসাইগঞ্জের পাঁচালী
নিঃসঙ্গ সৈনিক
শ্রেষ্ঠ গল্প
দূরের মানুষ
নবজন্ম
গ্রামে গ্রামান্তরে
দিন অবসান
স্মৃতিটুকু থাক

মাশুল

নটবর এই প্রথম ভোটে জিতেছে। অবশ্য এর জন্য নটবরকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। জগন্নাথপুরে এতদিন কেউ নটবরকে চিনত না। তার বাবা পাঁচখানা গ্রামে পুরোহিতগিরি করত। ছোট্ট সিংহাসনে লাল শালু মোড়া শালগ্রাম শিলা নিয়ে যজমানের বাড়ি বাড়ি সেই দেবতাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীপূজা করত।

অবশ্য বিয়ে-শ্রাদ্ধ-অন্নপ্রাশন এসব হত কমই। তখন নিত্যানন্দ ভটচাযের কিছু আমদানি হত। তবে সে সবই ছিল নিতু ঠাকুরের সংসার সমুদ্রে ধূলিকণার মতোই। নিমেষে তার মরুভূমির রুক্ষতার মতো অভাবের সংসারে তা জলকণার মতোই উবে যেত। তার সংসারের আয়পয় তেমন ছিল না। কিন্তু জনসংখ্যা ছিল বেশ বাড়-বাড়তির দিকে। চার ছেলে, মেয়েও গোটা পাঁচেক। কে যে কোথায় দিনভর থাকে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। খাবার সময় এসে হাজির হত। আর মাথা গুনতি করত নিতু ভটচায শোবার সময়। দেখে নিত ডালাই পাতা রাজশয্যায় সব কটা ঠিকমতো রয়েছে কি না।

নটবর এমনি হেলা-ফেলাতেই মানুষ হয়েছে। বাঁচার লড়াই করতে শিখেছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে যায় নটবর। অন্য ভাইবোনদেরও মা পাঠায়। কারণ—আলে-ডালে না ঘুরে তবু স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে আটকে থাকবে। আর এখন স্কুলে দুপুরেও খাবার যা হোক কিছু দেয়। ওরা সেই খাবারের জন্যেও স্কুলে যায় নিজেদের তাগিদে।

নটবর তখন থেকেই বেশ চালু। ওই ছেলেদের ভিড়ে মিশে দুবার খাবারও নিত। তবে পড়াশোনাও করত। স্কুলের মাস্টারমশাই বলতেন,—মন দিয়ে পড়াশোনা কর। লেখাপড়া শিখলে তবু একটা হিল্লে হবে। নটবর বন্ধু-বান্ধবদের বই নিয়ে কাজ চালাত। তার মনে হত, যেভাবে হোক তাকে আরও অনেক অনেক কিছুই পেতে হবে।

দেখেছে গ্রামের অনেক বাড়ির অবস্থা তাদের থেকে অনেক ভালো। বাড়িতে গোরু-বলদও রয়েছে। উঠানে ধানের মরাই-এ রাশ রাশ ধান। দালান বাড়ি। তাদের পাড়ার কিশোরদের বাড়িতে এখন বিজলির আলো জ্বলে। টিভিও এসেছে। বড় একটা বাক্সের মুখে কাচের পর্দায় কেমন ছবি ফুটে ওঠে। নাচ-গান হয়। দু'একবার দেখতেও গেছে কিশোরদের বাড়িতে ওই ছবি। কিন্তু কিশোরের বাবা, ওর পিসি-বউদিরা কেমন অখুশি হয়। তবু নটবরের মন চায় ওই সুন্দর প্রাচুর্যময় জীবনের ছবি দেখতে। তাই যেচে যেচেই যায় কিশোরদের বাড়িতে।

এখন নটবর প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে গ্রামের মাধ্যমিক স্কুলে এসে ঢুকেছে। এখানে আরও অনেক গ্রামের ছেলেরা পড়তে আসে। নটবর দেখে তাদের অনেকে সাইকেলে আসে। নটবরেরও ইচ্ছা হয় যদি সাইকেল তার একটা থাকত। অবশ্য বাবাকে বলতে সাহস হয় না তার। নটবরও জানে তাদের বাড়ির অবস্থা। কোনওমতে খাবারটা জোটে। ভালো জামাপ্যান্টও তেমন নেই। একটা প্যান্ট দিয়েই কোনওমতে চালাতে হয়। তবে নটবর অন্য ভাইদের প্যান্টজামাও আগে থেকে পরে বের হয়ে আসে। বাড়িতে এ নিয়ে অশান্তিও হয়। বাবা নটবরকে চড়-চাপড়ও মারে। ভাইরাও নটবরকে ফাঁক

পেলেই আক্রমণ করে। কিন্তু নটবর জানে, টিকে থাকতে গেলে লড়তেই হবে। সেই বাঁচার পাঠ সে বাড়ি থেকেই নেয়।

তার মনের বাসনাগুলোও যেন ভিড় করে আসে। নটবর পদে পদে এখন বুঝতে পারে তার জামা প্যান্ট-ভালো খাবার-ভালো কলম-বই কিছুই নেই। শখের কোনও বস্তুও তার ভাগ্যে মেলে না। এতদিন ধরে সে পদে পদে বঞ্চনাই সহ্য করে এসেছে। বাবা নিতু ভটচাযও বলে,—শখ-সাধ মেটাতে হয়, নিজে রোজগার করে মেটাও। আমার ওসব ক্ষমতা নেই বাপু।

নটবরের মা জননী কাদু ঠাকরুন জীবনে কোনওদিন কিছুই পায়নি। এই সংসারে এসে সে সন্তানের জন্ম দিয়েছে, আর অভাবের সংসারে ভাতের থালা বেড়েছে। পরনে কোনওদিন ভালো শাড়ি একখানা মেলেনি। ভটচাযমশাই যজমানদের বাড়িতে পুজো—বিয়ে—অন্নপ্রাশনের ফর্দ করার সময় কালেভদ্রে একখানা ভালো শাড়ি ফর্দে ঢুকিয়ে দিয়েছে। না হলে ক্যাটক্যাটে লাল শাড়ি পরেই তার জীবন কেটেছে। অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে চেহারাটা যেন শুকনো দড়ির মতো হয়েছে। মেজাজও তেমন উগ্র হয়েই থাকে। কাদু ঠাকরুন ফুঁসে ওঠে,—কী দিতে পেরেছ তুমি! বাবাই হয়েছ। বাবার কী কাজ করেছ। চালকলাই চিবোচ্ছি জীবনভোর।

নিতু ভটচায এত লোকের সংসারে যাগ-যজ্ঞ করে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্তি এনেছে। কিন্তু তার নিজের সংসারে ওই শান্তির কণামাত্র আনতে পারেনি।

নটবরও জেনেছে যে বাবা তাকে কিছুই দেবে না। যা কিছু তার দরকার তা নিজেকেই অর্জন করতে হবে, সে যেভাবেই হোক।

কিশোরের বাবা নন্দবাবু এই অঞ্চলের নামী লোক। এককালে শিক্ষকতা করতেন। অনেক জমি-জায়গা। একসময় ওরাই এদিকের জমিদার ছিল। জমিদারি চলে যাবার পর কিশোরের এক কাকা সদরে ভালো চাকরি করে, সেখানেও বাড়ি করেছে। বাবা রিটায়ার করে পেনশন পান। এখন এদিকের অঞ্চল প্রধান। ফলে নামডাকও আছে তাঁর। বাড়ির অবস্থাও ভালো। তাই কিশোরের সঙ্গে ওই হতদরিদ্র নটবরকে মিশতে দেখে ওর বাবা—মা—পিসিমা কেউই খুশি নয়।

কিশোর জলখাবার খাচ্ছে। ওদের খাবার ব্যবস্থাও আলাদা। বাড়িতে রান্নার জন্য লোক আছে। সে কিশোরকে লুচি, আলুর দম, বাড়ির তৈরি ক্ষীরের সন্দেশ দিয়েছে। নটবরকে আসতে দেখে বলে,

—বসো, তোমার জন্য জলখাবার আনছি।

নটবর স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে ভাগে একমুঠো মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা পেয়েছে মাত্র। তাতে পেটও ভরেনি। এসেছে খেলার মাঠে, খেলার জন্য কিশোরকে ডাকতে। কিশোরদের রান্নার লোক নটুর জন্যও একটা রেকাবিতে দুখানা লুচি—আলুর দম—সন্দেশ এনে দেয়। খাচ্ছে নটু। বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিল কিশোরের পিসিমা। সে ওইসব বস্তু নটবরের হাতে দেখে ওদিকে বামুন মেয়েকে বলে,

—এ কি দানছত্র পেয়েছ বাছা!

মেয়েটা অবাক হয়। বলে—কেন পিসিমা?

পিসিমা এবার গলা সপ্তমে তুলে বলে,

—যে আসবে তাকেই লুচি-মণ্ডা দিতে হবে? ওই হা-ভেতে ছেলেটা তো প্রায়ই ঘুর-ঘুর করে এখানে! ওটাকে এসব কেন?

কথাটা নটবরও শোনে। অবশ্য সে তখনও খাচ্ছে। সে জানে, তাকে সহজে কেউ কিছুই দেবে না। এসব কথা শোনা তার অভ্যাস আছে। সে খাওয়া থামায় না। তবে মনে হয়, এর জবাব সে একদিন দেবেই এদের। তার দিনও বদলাবে। সে যেভাবেই হোক।

নন্দবাবু সেবার ভোটে দাঁড়িয়েছেন। ভোটের ব্যাপারটা অবশ্য নটবর তখনও ঠিক বোঝেনি। তবে দেখেছে ভোটে জিতলে কী হতে পারে। নন্দবাবু ওই পঞ্চায়েতের প্রধান হয়ে বাড়িখানাকে আরও বাড়িয়েছিলেন। ওদিকে বাজারে এখন নতুন বিল্ডিং করে সেখানে গুদামও বানাচ্ছেন। দু-তিনজন লোকও কাজ করে। মাঝে মাঝে নন্দবাবুও গদিতে বসে সেই ধানচালের আড়ত সামলান। বাকি সময় কাটে পঞ্চায়েত অফিসে।

ইদানীং গাড়িও একটা কিনেছেন। এখান-ওখান যেতে কাজে লাগে। নটবর দেখেছে, ভোটে জিতেই এসব হয়েছে। তাই ভোটের সম্বন্ধে তারও কৌতূহল বাড়ে।

কিশোরও ভোটের মিছিলে যায়, আর নটবরও থাকে মিছিলে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মিছিলে। মিটিং-এ কিশোর, তার দলবল নিয়ে সামনের সারিতে বসে জোরে হাততালি দেয়। ওদের বৈঠকখানার ঘরে বসে পোস্টারও লেখা হয়। নটবরের লেখাটাও সুন্দর। বেশ গোটা গোটা করে লিখতে পারে। নন্দবাবুর ভোটে দেওয়ালে তার হাতের লেখাই ফুটে ওঠে। নন্দবাবু বলেন,

—তোর লেখাটা বেশ সুন্দর রে। টাকাটা রাখ। আরও দু-তিনটে দেওয়ালে লিখে দিবি।

নটবর এই প্রথম জীবনে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে। ঝকঝকে নোটটা পকেটে রাখে। আর দেখেছে নটবর, নন্দবাবু যেন তাকে একটু বেশিই ভালোবাসেন অন্যদের থেকে।

সেবার ভোটে নন্দবাবুই জিতলেন। অবশ্য তার জন্য নটবরের অবদানও কম ছিল না। নটবর এর মধ্যে তার দলবল নিয়ে এলাকাতে বেশ কিছু বিরোধীপক্ষের লোকদের ভোটই দিতে দেয়নি। সে ভোটের কিছুদিন আগেই বিরোধীপক্ষের মিছিলে বেশ কয়েকটা বোমাও ছুড়েছিল। তাতে অবশ্য তেমন কেউ জখম না হলেও ভয়ে অনেকেই আর ওদের মিছিলে যোগ দেয়নি। আর সেই অবকাশে নটবরও নন্দবাবুকে বলে,

—কাকাবাবু, রিলিফের চাল-কম্বল যা আছে এবার তা বের করে দিন। আমি কয়েকখানা গ্রামের মানুষের ভোট আপনার বাক্সেই এনে দেব।

নন্দবাবু নিজে লেখাপড়া জানা লোক। তিনি এমনিতে সৎ। পঞ্চায়েতের কাজে এসেছিলেন অনেকের অনুরোধে। আর সে কাজও তিনি যতটা পেরেছেন সততার সঙ্গেই করেছেন। বলেন তিনি,—ভোটের আগে চাল-কম্বল দিলে গ্রামের লোক কী ভাববে? ওইসব দিয়ে ভোট কিনছি। আর নরেশবাবুরাও তো কথা বলতে ছাড়বেন না। নিজেরা ক্ষমতায় আছি বলে কি ভোটে জেতার জন্য এ সব করব? রিলিফ ভোটের পরই দেব।

নটবর কিছুটা মরিয়া ধরনের। সে জানে, এসময় ওসব মাল ছাড়লে জনগণ তাদের

ভোটই দেবে। তাই বলে,—ওসব নীতি-টীতি ভোটের সময় চলে না কাকাবাবু। আমাকে ওসব করতে দিন। দেখবেন কী হয়!

দলের অন্যরাও জানে, এসময় ওসব দিতে পারলে কাজ হবে। তারাও চায়, চাল-গম-কম্বল বিলি করা হোক। তা হলে তার থেকেও বেশ কিছুটা তাদের হাতে আসবে। তাই ওসব মালপত্র বিলিও হতে লাগল। অবশ্য প্রকাশ্যে নয়, গোপনে। আর নটবর এইবারে আরও কিছু রোজগার করার সন্ধানও পেয়ে গেল।

এদিকে চাল-কম্বল, অন্যদিকে শাসানিও দেয় নটবর। ফলে ভোটের দিন অনেকেই আর ভোটের বুথেও আসে না ভয়ে। সেই সুযোগে নটবরই নরেশবাবুর দলের লোকদের বুথ থেকে বের করে দিয়ে নিজেরাই জনগণের ভোট সব উজাড় করে দেয় নন্দবাবুর বাক্সে। প্রতিপক্ষ নরেশবাবুর দল অবশ্য বাইরে বিক্ষোভও দেখায়। কিন্তু তাতে কোনও কাজই হয় না।

নন্দবাবু এবারও বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে আসেন। নটবর-কিশোর আর দলের অন্যরাও মিলে বিরাট বিজয় মিছিলও করে গ্রামে গ্রামে। নরেশবাবু দেখেন, একা নটবরই বাজিমাত করেছে।

নটবর অবশ্য তার আগেই স্কুলের পর্ব ইতি করে দিয়েছে। এমনিতে সে ক্লাসে প্রমোশন ঠিক পেয়ে এসেছে। অবশ্য পড়াশোনাতে ধীরে ধীরে তার মন আর বসে না। তখন সে নন্দবাবুর দলে কর্মী। তবে অন্য পরীক্ষার সময় সে স্কুলের মাস্টারদেরও বলত, "পাস-টাস করিয়ে দিতে হবে স্যার।" নন্দবাবুই স্কুলের প্রেসিডেন্ট। নটবর তাঁর কাছের লোক। তাই মাস্টারমশাইরাও তাকে ঘাঁটাতেন না।

সেবার স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক বিনয়বাবু তার খাতা দেখে মাত্র তিন নম্বরের বেশি কোনও মতেই দিতে পারেননি। আর তাতেই নটবরের প্রমোশন আটকে গেছে। নটবর বলে বিনয়বাবুকে,—একটা ব্যবস্থা করে দিন স্যার। পরের বছর ঠিক পড়াশোনা করে মেক আপ করে দেব। বিনয়বাবু অবাক হন ওর কথায়। ইংরেজির যা জ্ঞান নটবরের, তাতে এ জীবনে আর মেক আপ করা সম্ভব নয়। তাই বিনয়বাবু বলে,—ওটা আর করা যাবে না রে। তুই ইংরেজিতে খুবই কাঁচা। কী করে পাস করাই বল। তা হলে তো সব ছেলেকেই পাস করাতে হবে। নটবর বলে,

—আমি সকলের দলে নই স্যার। মুড়ি-মিছরি এক কববেন না। আমাকে পাস করিয়ে দিন স্যার। না হলে—

বিনয়বাবু আদর্শবান লোক। তিনি নিজের যোগ্যতায় এখানে চাকরি পেয়েছেন। তাঁর মতো শিক্ষককে আশেপাশের অনেক স্কুলই পেতে আগ্রহী। তিনি নন্দবাবুর সুপারিশের প্রয়োজন বোধ করেন না। তাই নটবরের নীরব শাসানিতে বিনয়বাবু চটে ওঠেন।

—কী বললি নটবর! তোকে পাস করাতে হবে? না হলে কী করবি?

কী করবে তা ভাবেনি নটবর। কিন্তু বিনয়বাবুর ওই কঠিন কণ্ঠস্বর শুনে নটবরও এবার চটে ওঠে মনে মনে। বিনয়বাবু যেন নটবরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান। নটবর জানে তাকে প্রতি পদক্ষেপ ফেলতে হবে নিজের জোরে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। পিছু হটলে চলবে-না। আর আদর্শ-নীতি, ওসব কথাগুলোর কোনও মূল্যই দেয় না নটবর। তাই বিনয়বাবুর কথার প্রতিবাদে নটবরও স্থির কণ্ঠে বলে ওঠে, প্রমোশনটা দিলে ভালোই

করতেন স্যার। ঠিক আছে, যখন দেবেন না, তখন আর কী বলব? তবে কাজটা ভালো করলেন না।

বিনয়বাবুও গর্জে ওঠেন,—বের হয়ে যাও। পড়াশোনা করে না—প্রমোশন দিতে হবে? কে তোমাকে প্রমোশন দেয় তাই দেখব।

নটবর বের হয়ে আসে। তখন সন্ধ্যা নেমেছে। বিনয়বাবুর স্ত্রীও শুনছিলেন ওদের কথা। নটবরকে তিনিও চেনেন। এর মধ্যে নটবর এই অঞ্চলে বেশ পরিচিতি লাভ করেছে। এর মধ্যে হাটতলাতে সে দু-একবার বিরোধীদলের সঙ্গে মারামারিও করেছে। হাটের দিন নটবর তার কিছু আমদানিরও ব্যবস্থা করেছে। গ্রামের পুরনো শিবমন্দিরের কাছেই নন্দবাবুদের বিরাট এলাকা জুড়ে বাগান। মন্দির লাগোয়া একটা বড় পুকুরও আছে। বাবা রত্নেশ্বর শিবের মন্দির। সারা এলাকার মানুষ ওই শিবকে পূজা দেয়। বাবা নাকি খুবই জাগ্রত। ওখানে পূজা মানত করে অনেকেরই অনেক দুরারোগ্য রোগও সেরেছে। অনেকের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। তাই প্রতি সোমবার ওখানে আসে বহু ভক্ত—মেয়ে-পুরুষ।

আর ওই ছায়াঘেরা বাগান—মন্দিরের আশেপাশে নটবরই এর মধ্যে একটা দোকান করে সেখানে তার এক ভাইকেও বসিয়ে দিয়েছে। ফুল-বাতাসা-ধূপ-বাবার পুজোর ডালি ছাড়াও ওদিকে একটা তেল-মশলা-টুকিটাকির দোকানও করে দিয়েছে। প্রতি সোমবার-শুক্রবার ওই বাগানে হাট বসে। আশেপাশের অঞ্চলের চাষিরা তাদের জমিতে যে সব আনাজপত্র করে, জেলেরা পুকুরে মাছ যা চাষ করে, সে সব নিয়ে পসার সাজায়। এ ছাড়াও আরও নানা দোকান বসে। দশখানা গ্রামের লোক আসে এখানে। তাই হাটও জমে উঠেছে।

নন্দবাবুও এ নিয়ে কোনও বাধা দেননি। লোকজন এসে আনাজপত্র-মাছ-অন্য সব জিনিস বিক্রি করে। আবার চলে যেতে বাগানে নামে স্তব্ধতা। পাখিদের কলরবে ভরে উঠত বাগান। গোরুগুলো বাতিল সবজির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে ফিরে চলে যেত। এবার নটবরই বলে নন্দবাবুকে,—জায়গাটা আপনার, ওরা ব্যবসা করছে। বাগান সাফ করার খরচ তো দিতে হবে ওদের কাকা। এত ময়লা ফেলে যায়। সেগুলো আমরাই সাফ করি, না হলে মন্দিরে ঢোকা যাবে না পচা আনাজের গন্ধে।

নন্দবাবু অবশ্য ওইসব পচা আনাজপত্রগুলোকে একটা বড় চৌবাচ্চায় ফেলায় প্রচুর সার পান। তার দামও অনেক। তিনি বলেন,—ওরা কিছু রোজগার করে, ওদের ভাতে হাত দেব কী করে! নন্দবাবুর বিবেকে বাধে। কিশোরও নটবরের সঙ্গে থেকে থেকে এবার আমদানির পথ বের করতে চায়। কিশোর বলে—বাবা, নটবর ঠিকই বলেছে। ওরা মাথাপিছু নিদেন একটাকা-'দু-টাকা করে দেবে। সেটা ওদের গায়ে লাগবে না। নটবরই বুদ্ধিটা বের করেছে। নটবর দেখেছে, তাতেও তাদের প্রত্যহ নিদেন তিন-চারশো টাকা হাতে আসবে। বলে নটবর,—ওরা তো ঘর থেকে দেবে না। ওরা খদ্দেরদের কাছ থেকে দ্বিগুণ নিয়ে, আমাদের অর্ধেক দেবে। ওদেরও লোকসান হবে না। ও নিয়ে আপনি ভাববেন না। ওসব আমি সামলে নেব। প্রথমে দু-একজন আপত্তি তুলবে, ওই নরেশবাবুর দলও হয়তো কিছু বাধা দেবে।

নন্দবাবু শান্তিপ্রিয় লোক। নরেশবাবুর দল ইদানীং মাথা তুলছে। নরেশবাবু কথায়

কথায় এলাকার শ্রমিক মজুরদের জমায়েত করে তারস্বরে ঘোষণা করেন, সর্বহারাদের জন্য তিনি লড়ছেন। মানুষের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চান তিনি। তাঁর কথায় বেশ জ্বালাও ফুটে ওঠে। সেই গরিব মানুষগুলোর কাছে তিনি ঘোষণা করেন—তোরাই খেটে চাষ করিস, ধান উৎপন্ন করিস, ওই ধান তোদের। এই সব গরম গরম কথায় হাঁড়িয়ার নেশায় মাতাল লোকগুলোও চিৎকার করে—তাই বলো বাবু, ইসব আমাদের। মদ খেয়ে টলতে টলতে সব কিছু পাবার স্বপ্ন নিয়ে তারা ঘরে ফেরে নরেশবাবুর জয়ধ্বনি দিতে দিতে। নন্দবাবু এসব দেখেছেন। বলেন, নরেশের দল আবার যদি গোলমাল করে!

নটবর বলে, জায়গা আপনার। বসার জন্য পয়সা না দেয় ওই ধান মাঠে গিয়ে বসুক গে আনাজপত্র-জিনিস নিয়ে। কেউ কিছু বলবে না।

কিশোর বলে,

—এসব নিয়ে তুমি ভেবো না বাবা। নটবর যা করার করবে।

নটবর এবার ওই হাটেও তোলা তোলার কাজ শুরু করেছে। প্রথম প্রথম ওরা অনেকে ঝুড়ি পিছু টাকা দিতে চায়নি। নরেশবাবুও এসে পড়ে। সেও তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শূন্য হাত তুলে ঘোষণা করে,

—এ নিছক অন্যায়, জুলুম! জুলুমবাজি মানব না। লোকজন প্রথমে একটু অবাক হয়। ওদিকে বেচাকেনাও বন্ধ। এত আনাজ নষ্ট হয়ে যাবে। দুপুরে হাটে যাবার সময়ও নেই। অন্যত্র কাছাকাছি কোথাও হাটও নেই। শেষ অবধি দু'টাকা-একটাকার দাবি মেনেই আবার আনাজ বিক্রি শুরু হয়। হাটের কাজও আবার চালু হয়।

ক্রমশ এটা এখন সয়ে গেছে ব্যাপারীদের। নটবরই তার দু'একজন বিশ্বস্ত ছেলেকে নিয়ে হাটের তোলা তোলে, আর ওদিকে একটা চালাঘর বানাচ্ছে। ওটাই এখন নটবরের অফিস কাম আস্তানা। বাড়িতে এখন নটবর কমই যায়। তবে তার দু-তিনটে ভাইকে দোকানও করে দিয়েছে মন্দিরতলায়। আর নন্দবাবুর ওখানেই তার বেশি সময় কাটে। আর এই অফিসে। এখানে আরও কয়েকজন বাপ-খেদানো ছেলে এসে আসর জমিয়েছে। সপ্তাহে দুদিনের তোলা থেকেই তাদের খাওয়া-দাওয়া চলে যায়। তারা এখন নটবরের বিশ্বস্ত অনুচর।

বিনয়বাবু নটবরকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েই দেন। ওঁর স্ত্রী মলিনা দেবী বলেন,

—ওই ছেলেটা এক নম্বরের বাজে ছেলে। ওকে চটালে?

বিনয়বাবু বলেন,

—জীবনে যা করিনি তাই করতে হবে? ওকে পাস করিয়ে দিতে হবে? নেভার—

স্কুলের অন্য শিক্ষকরাও শুনেছেন কথাটা। নটবর অবশ্য স্কুলে আসে কম। এখন সে ক্লাস টেনে এসে ঠেকেছে। অবশ্য তার পড়াশোনার শুরু হয়েছিল অনেক বয়সে। আর এখন সে তরুণই। দাড়ি-গোঁফের রেখা দেখা দিচ্ছে। কজন শিক্ষক বলেন,

—বিনয়বাবু, ওটাকে ছেড়েই দিন। মাধ্যমিকের বেড়া তো জীবনে পেরোতে পারবে না।

বিনয়বাবু অবশ্য জবাব দেন না।

সেদিন বৃষ্টি চলছে। এদিকে শীত চলে গেলেই গ্রীষ্ম নামে। আর আসে কালবৈশাখী ঝড়। শালবনে এখন আসে নতুন কচি পাতা। মহুয়া গাছের সব পাতা ঝরে যায়। পত্রহীন

ডালের প্রান্তে আসে থোকা-থোকা মঞ্জুরী। সন্ধ্যার পর মহুয়া ফুল ফোটে। হলুদ গোল গোল ছোট ফুল কী ব্যাকুল সৌরভে বাড়ির আকাশ ভরিয়ে তোলে। ওদের পরমায়ু এক রাতের। রাতভর ব্যাকুল সৌরভ আকাশ-বাতাসে তাদের অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে শেষ রাতে ঝরে যায়। পলাশের ডালে ডালে রক্তিম ফুলের বুকে সেই বেদনার রুক্ষতা।

বিকেলে লাল মাটির শালবনের উর্ধ্বাকাশে কালো টুকরো মেঘ ক্রমশ আকাশটাকে দখল করে নেয়। বাতাসে জাগে স্তব্ধতা। মাঠ থেকে গোরু বাছুরগুলো বাতাসে কী সর্বনাশের আভাস পেয়ে ল্যাজ তুলে দৌড়য় বাড়ির দিকে। গ্রামের লোকজনেরও সাজসাজ রব পড়ে যায়। উনুনের আগুনে জল ঢেলে রাখে। কারণ, এখন ধেয়ে আসবে সর্বনাশা ঝড়। খোলা উনুনে আগুন থাকতে সেই আগুনকে ছিটিয়ে অগ্নিকাণ্ড বাধাবে গ্রামে।

হঠাৎ কালো মেঘটা পিঙ্গল বর্ণের হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দূরে কোথাও ঝড় হচ্ছে। লাল ধুলোর আস্তরণে কালো মেঘ পরিণত হয়েছে সন্ন্যাসীর পিঙ্গল জটাজালে। এরপরই শুরু হবে প্রকৃতির বুকে বজ্রের প্রলয় নৃত্য। ঝড় এসে যায়। বনভূমি কেঁপে ওঠে। গাছগুলোর ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয় কোন ধ্বংসদূত। বাতাসে ওঠে মত্ত গর্জন। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার হয়ে ওঠে। এর পরই আসে বৃষ্টির ধারা। প্রলয়ের পর যেন নামে শান্তির স্পর্শ। সেই বৃষ্টির ধারায় তৃপ্ত হয় তৃষিত প্রকৃতি। মাটির বুক থেকে ওঠে মিঠে সোঁদা গন্ধ। বৃষ্টির জল ধুয়ে শাল-মহুয়া গাছের পাতায় আসে ঔজ্জ্বল্য।

সেদিন হঠাৎ ঝড়ের মুখোমুখি হতে হল। বিনয়বাবু সদরে গিয়েছিলেন। বাস থেকে নেমে জঙ্গলটা পার হলেই তাঁদের গ্রাম। এইটুকু পথ জোরে পা চালিয়ে গেলে ঝড়ের আগেই বাড়িতে পৌঁছে যাবেন। বনের বাইরে বাস স্টপ। কয়েকখানা গ্রামের লোকজন এখান থেকেই বাসে করে সদরে, না হয় দুর্গাপুরের দিকে যায়। তাই বনের বাইরের গাছপালা কেটে কারও মদতে এখানে বেশ কিছু দোকান পাটও বসে গেছে। রিকশা স্ট্যান্ডও হয়েছে। সাইকেল—সাইকেল রিকশা রিপেয়ারিং দোকান, চা-পান-বিড়ির দোকান—খাবার দোকানও গড়ে উঠেছে এখানে। বনের বাইরে এই জায়গাটা জমজমাট হয়ে উঠেছে। এখানে তবু আশ্রয় নেওয়ার জায়গা আছে। চেনাজানাও আছে অনেকে। কিন্তু বিনয়বাবু বের হয়ে পড়েন।

একটু এসেই জঙ্গলের শুরু। প্রায় দেড় কিলোমিটার অরণ্য এখনও এখানে টিকে আছে। তার ওদিকে কিছু ফাঁকা। তারপর গ্রাম।

বিনয়বাবু আসছেন বনের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ ঝড়টা ওঠে। রাজ্যের ধুলো উড়ছে। সেই ঘূর্ণি বাতাসে উড়ছে পাতা-কাঁকরও। বিনয়বাবু একটা ঝোপের আড়ালে চোখ বন্ধ করে মাথা নিচু করে বসে ওই ধুলোঝড় থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে ঝড়ের মত্ততা ছাপিয়ে ওঠে মেঘের গর্জন। তার পরই বৃষ্টি নামে। গাছগুলো যেন খুশিতে দাপাচ্ছে। বৃষ্টির শব্দ ওঠে পত্রপটে। বিনয়বাবু ভিজছেন।

হঠাৎ দেখেন ঝোপের ওদিক থেকে বের হয়ে আসছে নটবর আর তার দুই অনুচর। ওরা যেন বিনয়বাবুর জন্যই এই বনের মধ্যে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি ছিল। বিনয়বাবু দেখছেন ওদের। নটবরের জামাপ্যান্ট বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। অবশ্য তার দিকে ওদের ভ্রূক্ষেপও নেই। বিনয়বাবু বলেন,

—তোমরা? এসময়? এখানে?

নটবর বলেন—সেদিন বলেছিলাম স্যার, পাস না করিয়ে দিলে ভালো হবে না। দিলেন না। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তাই কী করতে পারি—এবার সেইটাই দেখাতে চাই।

বিনয়বাবু তবু বলেন,

—তোমাদের সাহস তো কম নয়! স্কুলের বাইরেও শাসাচ্ছ—কী করবে?

—কী করব? এবার নটবর ওর জামার নীচে হাত ঢুকিয়ে কোমর থেকে বের করে বস্তুটা। বিনয়বাবু এবার চমকে ওঠেন। একটা রিভলবারই। এ হেন জিনিস গ্রামের ছেলে নটবর কী করে পেল তা ভাবতেও পারেন না। নটবর বলে,

—এটা কী জানেন তো? এতে পাঁচটা দানা পোরা আছে।

চেম্বার খুলে পাঁচখানা বুলেট দেখিয়ে বলে নটবর,

—এর একটা দানা আপনার মাথায় সেঁদিয়ে দিলেই ফিনিশ! আমাকে ফেল করানোর দাম তো দিতেই হবে।

বিনয়বাবু স্থির দৃষ্টিতে দেখছেন নটবরকে। গ্রামের শান্ত পরিবেশও আজ বদলে গেছে। বদলে গেছে শিক্ষক-ছাত্রদের সম্পর্কও।

ওরা রাজনীতি নামক একটা হীন স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ভাবনার চক্রে পড়ে সব কিছুকে হারিয়েছে, এই প্রজন্মের জন্য শিক্ষক হয়ে আজ বিনয়বাবুও দুঃখবোধ করেন। কোথায় একটা শূন্যতারই সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে একটা দুষ্টচক্র ক্যানসারের মতো বেশ কিছু বিকৃত ভাবনার যুবককে একটা কঠিন দুরারোগ্য রোগে সমাজকে গ্রাস করেছে।

বিনয়বাবু বুঝেছেন ওর সঙ্গে তর্ক বৃথা। বোঝাবার চেষ্টাও হবে অর্থহীন। জনহীন এই বর্ষামুখর বনের মধ্যে দস্যু রত্নাকরও অতীতে কোনও ঋষিকে হত্যা করতে গিয়ে জীবনের এক পরম সত্য সুন্দর রূপকে আবিষ্কার করেছিল। আজ সে সব গল্প কাহিনিতে পরিণত হয়েছে।

আজ এরা অতীতকে, ভবিষ্যৎকে ভুলে বর্তমানের সন্ধানী হয়েই লুঠে নিতে চায় সব কিছু। নটবরের চ্যালা পচা বলে,

—গুরু, কাজ শেষ করে কেটে পড়ি চলো।

হঠাৎ এমন সময় সাইকেলের ঘণ্টার শব্দ শুনে সজাগ হয় ওঠে নটবর। নরেশবাবু জঙ্গলের ওদিকে কোনো গ্রাম থেকে মিটিং সেরে ফিরছিলেন। বনের মধ্যে দিয়ে। ঝড়টা তখন থেমেছে তবে বৃষ্টি চলছে, তাই তাড়াতাড়ি তিনিও পথটুকু পার হয়ে যাবার চেষ্টাই করছিলেন। ঘটনাটা দেখেছেন তিনি। নরেশবাবুও চমকে ওঠেন নটবরের হাতে ওই রিভলবার দেখে। ছেলেটা কেমন বেপরোয়া, মরিয়া আর খুবই জেদি।

না হলে পাস না করার জন্য কেউ এভাবে রিভলবার নিয়ে আক্রমণ করতে পারে না। আর ছেলেটা করিতকর্মাও। বাইরের দলের সঙ্গেও ইতিমধ্যে ওর যোগাযোগ গড়ে উঠেছে, না হলে এ ভাবে একটা রিভলবার জোগাড় করা কঠিন। ওর দাম অনেক টাকা আর অন্ধকার জগতে পরিচিতি না থাকলে এমন বস্তুর সন্ধানও করা যায় না। পাওয়াও যায় না। নটবর নরেশবাবুকে এ সময় দেখবে আশা করেনি। তাই সেও বস্তুটাকে এবার সটান কোমরের বেল্টে চালান করে জামা দিয়ে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করে। অবশ্য সবকিছুই

নরেশবাবু দেখেছেন জেনেছেন। তবু ওসব না দেখার ভান করে বলে,—কি বিনয়বাবু, সদর থেকে ফিরছেন বুঝি? তা কি রে নটবর! স্যারের সঙ্গে কী কথা বলছিলি?

নটবর আমতা-আমতা করে বলে,

—না, হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

নরেশবাবু বলেন,

—নটবর, ওসব পড়াশোনার ব্যাপার তুই ছেড়ে দে, দ্যাখ, ইয়ে মানে পঞ্চায়েত অফিসে যদি কাজটাজ পাস। নন্দবাবুকে বল। চলুন মাস্টারমশাই। এ সব নিয়ে আর কোনও ঝামেলা না করাই ভালো রে নটবর। মাস্টারমশাইও শান্তিপ্রিয় লোক। হাজার হোক তোর গুরুজন। শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কটা মানবি তো—

নটবর কী ভেবে সঙ্গী পচাকে বলে,

—চল, চলি স্যার—চলি নরেশদা।

নটবর চলে যেতে নরেশ বলেন বিনযবাবুকে,

—না, আপনাব সাহস আছে দেখছি মশাই, ওই বাঁদরটাকে মাথায় না তুলে ঠিক কাজই করেছেন। আর ঘাঁটাবে না আপনাকে, আর আপনিও এ সব কথা কাউকে বলবেন না।

বিনযবাবু বলেন,

—তা বলব না। কিন্তু এ সব কী হচ্ছে নরেশবাবু, সমাজের অবস্থা কী হবে?

নরেশবাবুও বৃষ্টিতে ভিজে গেছেন, তবু বিনয়বাবুর কথায় হেসে বলেন,

—এই তো নতুন প্রজন্মেব খেল মশায। এব শেষ হবে কোথায় কে জানে! একে ঠেকানো যাবে না মশায়। এইভাবে ঘোলা জলেই মাছ ধরে কাটাতে হবে। একটা প্রজন্মকে অন্ধকাবেই ঠেলে দিয়েছি আমরা—ওদের পর যারা আসবে, তারা যদি কিছু করতে পারে। আমাদের করার আর কিছুই নেই—শুধু দেখা ছাড়া—

বিনয়বাবু বলেন,

—তবু চেষ্টা করতে হবে মশায়। একে মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায় না।

নরেশবাবু বলেন,

—করে তো দেখলেন কী হতে যাচ্ছিল। তাই বলছি কোনও লাভই হবে না। চলুন বাড়ি ফেরা যাক, ভিজে ঢোল হয়ে গেছি।

মলিনাও বিনয়বাবুর পথ চেয়েছিলেন। লোকটার ফেরার কথা, এখনও ফিরল না। বাড়ির সবাই কোথায় রইল কে জানে। ঝড় থেমে গেছে—বৃষ্টিও এখন কমে আসছে।

এমন সময় বিনয়বাবুকে বিধ্বস্ত অবস্থায় ফিরতে দেখে চমকে ওঠেন মলিনা।—সব ঝড়-বৃষ্টি যেন ওর উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, বিনয়বাবুর মনের উপরও একটা তুমুল ঝড় বয়ে গেছে। নিজের প্রাণের ভয়টাই তাঁর কাছে আজ সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়নি। এতকাল শিক্ষকতা করে এসেছেন। বহু ছেলে তাঁর হাত দিয়ে মানুষ হয়েছে। কিন্তু আজ সেই যৌবনের আর এক সর্বনাশা রূপ দেখে তিনি শিউরে উঠেছেন। এই ছেলেরা সমাজের মধ্যে কী সর্বনাশ আনতে পারে সেইটা ভেবেই তাঁর মনে আজ নতুন ভয় জাগে।

এসব তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনা। কাউকে প্রকাশ করাও যাবে না। মনে হয় যৌবনের

এই বিকৃতির জন্য শিক্ষক হিসেবে তাঁরও দায়িত্ব রয়ে গেছে। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের কোনও পথই তিনি জানেন না।

মলিনা বলে,

—এই ঝড়-বৃষ্টিতে কোথাও দাঁড়াতেও পারনি? এই ভাবে ভিজে এলে? যাও, ওসব জামাকাপড় বদলে স্নান করে নাও। আমি চা করছি। বিনয়বাবু বারান্দার ওদিকে বাথরুমে এগিয়ে যান।

নরেশবাবুও বাড়ি ফিরেছেন। গ্রামের অন্যদিকে তাঁর বাড়ি। সাধারণ অবস্থা। ছাত্রজীবনে রাজনীতি শুরু করেন—তবে তার সঙ্গে বাঁচার রসদও দরকার। তাই দুর্গাপুরে কোনো এক কারখানাতেই কাজ নেন নরেশবাবু। সেই কারখানাতেই ক্রমশ নরেশবাবু শ্রমিকদের হয়ে মালিকদের সঙ্গে কথাও বলতে শুরু করেন তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে। বেশ বড় কারখানাই। কয়েক হাজার শ্রমিক এখানে কাজ করে, সেই কারখানায় নরেশবাবু প্রথম থেকে কাজ শুরু করেন। ক্রমশ শ্রমিক মহলেও তাঁর পরিচিতি বাড়তে থাকে। আর কারখানার কর্মকর্তারাও এবার বুঝেছেন নরেশকে তাদের দরকার। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া ন্যায্য হলেও সব তারা মেনে নিতে পারে না। নরেশবাবুও তা জানেন। তবু তিনি গেটমিটিং করেন। কারখানার শেডে শেডে ঘুরে শ্রমিকদের অবহিত করেন। তাদের দাবি আদায়ের জন্য যে প্রাণপণ লড়াইও করবেন এই কথাটাই তিনি তাদের বারবার জানান।

তখন নরেশবাবু কারখানার একটা ভালো পদেই প্রমোশন পেয়েছেন। অবশ্য তিনি বলেন,

—কাজে তিনি ফাঁকি দেন না। তাঁর নিজের যোগ্যতার বলেই—তিনি কারখানার এই পদে এসেছেন।

এদিকে নিজের মাইনেও বেড়েছে আর শ্রমিক কল্যাণে নিয়োজিত কারখানা থেকে তাই তাঁকে হালকা কাজই দেওয়া হয়েছে। নরেশ ইউনিয়ন অফিসেও বসেন। সন্ধ্যার পর তাঁদের কাজকর্ম, হিসাবপত্র শুরু হয় ইউনিয়ন অফিসে।

কয়েক হাজার শ্রমিকের স্বার্থ নিয়ে তিনি ব্যস্ত। মাঝে মাঝে শ্রমিকদের কাছ থেকে যে চাঁদা সংগৃহীত হয়, তার পরিমাণও কম নয়। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে বিশেষ দাবি আদায়ের জন্য বিশেষ আন্দোলন করতে হয়। তার জন্যও স্পেশাল ডোনেশনও নেওয়া হয়। আবার বিশেষ কোনও দাবি মিটলে সেই বাড়তি টাকা থেকেও বেশ কিছু টাকা বিশেষ তহবিল গঠনের জন্যও তোলা হয়। সব মিলিয়ে ইউনিয়নের আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকা।

নরেশ আর তাঁর দুজন সহকারী মিলে সে সব টাকার হিসাব রাখেন। নরেশ-এর সহকারী গোপাল এ ব্যাপারে উপযুক্ত। গোপাল ফ্যাক্টরির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কাজ করে। তার পর অফিসের ছুটি হলে সে-ই ইউনিয়নের হিসাবপত্র রাখে। গোপাল জানে কীভাবে দুধে জল মেশাতে হয়। হিসাবেও তেমনি সে নিপুণভাবে কারচুপি করে। বাৎসরিক

আয়ব্যয়ের হিসাবও বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস করিয়ে নেয়, নরেশবাবুও ওদের জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করছেন। দাবি আদায়ের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিনিময়ে নরেশবাবুও বেশ ভালো টাকাই পান। সব ডোনেশন পেমেন্ট তহবিলের হিসাবেই বিশেষ কারচুপিটা চলে গোপনে। নরেশ-এর মতো উৎসাহী নেতারাও কর্তৃপক্ষের কাছে গোপনে কিছু চুক্তি করেন। শ্রমিকদের সব দাবি না মানার জন্য কর্তৃপক্ষ নেতাদেরও খুশি করে দেয় গোপনে। আর নেতারাও ওদের সামনে চুপ করে থাকেন। আর বাইরে শ্রমিকদের সামনে প্রকাশ্যে কর্মকর্তাদের মুণ্ডপাত করেন। শ্রমিকদের হাততালি কুড়োন।

কারখানার প্রোডাকশন কী হচ্ছে তার দিকে নজর নেই শ্রমিকদের। মেসিন ব্রেকডাউন হলে তারা খুশি। নাইট শিফটে এসে পুরো প্রোডাকশন না করেই এখানে ওখানে ঘুমিয়ে রাত কাটায়। ক্যানটিনে ওদের আড্ডার সময়ও ফুরোয় না। সেকশন ম্যানেজার কিছু বললে শ্রমিকরা তাকেই তেড়ে যায়। স্লোগান ওঠে,

—কর্তৃপক্ষের জুলুম মানছি না, মানব না।

নরেশবাবুও সামান্য কোনও ঘটনা ঘটলে বৃষ্টির আগে বজ্রপাতের মতো এসে হাজির হয়ে আস্তিন গুটিয়ে হুংকার ছাড়েন,

—জুলুমবাজি বন্ধ করো, না হলে কর্মবিরতি ঘোষণা করা হবে।

এই সব আন্দোলনের ফলে প্রোডাকশন কমেছে। কারখানায় লোকসানের মাত্রাও বাড়ছে। তবু শ্রমিকদের দাবি কমে না।

কর্তৃপক্ষ শেষমেশ শ্রমিক সংখ্যা কমাতে চায়। তাই নিয়েই বাধে গোলমাল। উত্তেজিত শ্রমিকরাও থামবে না। শেষে একদিন সকালের শিফটে কর্মচারীরা কাজে এসে দেখে কর্তৃপক্ষ রাতারাতি লকআউট ঘোষণা করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তারাও সরে পড়েছে। শ্রমিকদের আন্দোলন চলতে থাকে গেটে, নরেশও সেখানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন।

অবশ্য তিনি আগেই জানতেন কর্তৃপক্ষ এমনি কিছু করবে। আর তার জন্য নরেশকেও ভালো টাকা দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। তিনিও চুক্তিতে সই করে দেন। ক্রমশ শ্রমিকদের বন্ধ গেটের সামনে বসে থাকার ব্যাপারে উৎসাহ কমে আসে। অনেকেই এখানে-ওখানে কাজের সন্ধান করছে, অনেকে অন্যত্র কাজও পেয়েছে। ফলে তারাও হতাশ হয়েই সরে যায়। আর নরেশবাবুও এর মধ্যে ইউনিয়নের কয়েক লাখ টাকার সামান্য কিছু শ্রমিকদের দিয়ে নিজেরাই ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে সরে পড়েন।

নরেশ যা গুছিয়ে নিয়েছেন তা কম নয়। আর ওই রাজনীতির ব্যাপারে তাঁরও অভিজ্ঞতা কম নয়। নরেশ এবার গ্রামে এসে এখানের কৃষকসমাজ, আর কৃষি মানুষদের কল্যাণে আবার তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে চান।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এখন গ্রামীণ সমাজকে অনেকটা পরিচালিত করে। সরকারও পঞ্চায়েতি রাজত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তার জন্য পঞ্চায়েতকে অনেক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। গ্রামসমাজে পঞ্চায়েতকে তাই দখল করতে চায় অনেকেই। নতুন একটা গড়ে ওঠা জমিদার শ্রেণিই পঞ্চায়েতকে কুক্ষিগত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। নরেশও তাই এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে দাঁড়াতে চান। তাই এখান থেকেই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার কাজ শুরু করেছেন। নরেশ-এর প্রতিপক্ষ ওই নন্দবাবু, নন্দবাবু নরেশের

মত কৌশলী নেতা নন। তিনি রাজনীতির মারপ্যাঁচ বোঝেন না। গ্রামের মধ্যশিক্ষিত মানুষ, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। এই অঞ্চলের মানুষ তাঁকে মান্য করে। তাই সেদিন সাধারণ মানুষের অনুরোধে ভোটে দাঁড়িয়ে তাদের ভোটে তিনি জয়ী হয়েছিলেন।

তখন রাজনীতি নিয়ে বেসাতির কাজটা প্রচলিত হয়নি। সমাজের উপকার করার জন্য তখন ওই সব পদে অনেকে যেতেন। নন্দবাবু তেমনই লোক ছিলেন। তার পর নরেশবাবু এখানে ফিরে আসার পর থেকেই পটভূমিকাই কেমন বদলে গেল, নরেশবাবু পা ফেলেন হিসাব করে। নিজের পায়ের নীচের মাটি শক্ত করার জন্যই পঞ্চায়েতের বেশ কিছু সভ্যকে হাতে আনেন। পঞ্চায়েতের সভ্যসংখ্যা তেরো। ওই তেরো জন সভ্যর মধ্যে বেশ কয়েকজন এর মধ্যে পঞ্চায়েতের ঠিকাদারি, অন্য সব স্কিমের কাজ থেকে মধু লোটার চেষ্টাও শুরু করেছে। তখন পঞ্চায়েতে তেমন মধু ছিল না। কিন্তু ক্রমশ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা, কাজের পরিধিও বাড়ছে। টাকার পরিমাণও বাড়ছে। আর সেই সঙ্গে লোভও বাড়ছে।

বিনয়বাবুকেও নরেশ তাঁর দলে টানতে চেষ্টা করেন। বিনয়বাবুকে এলাকার মানুষ শ্রদ্ধা করে। নরেশ ভেবেছিলেন বিনয়বাবুকে দলে পেলে তারও বেশ সুবিধাই হবে। বিশেষ এক শ্রেণির মানুষের সমর্থন পাবেন তিনি। কিন্তু বিনয়বাবু মনেপ্রাণে একজন শিক্ষক। তিনি স্কুলের কাজ নিয়েই ব্যস্ত। স্বামী-স্ত্রীর সংসার। তাদের সন্তান-সন্ততি নেই। প্রাইভেট টিউশনিও করেন না। স্কুলের ছুটির পর স্কুলেরই বেশ কিছু ছেলেকে নিয়ে বিনা পয়সার কোচিং ক্লাস করান। নিজের পড়াশোনা নিয়ে বাকি সময় কাটে। তিনি দেখেছেন সমাজের সেই বঞ্চনার রূপটা। স্বাধীনতা পাবার পর থেকেই ক্রমশ যন্ত্রসভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপরও যন্ত্রের প্রভাব পড়ল। মানুষ ক্রমশ যন্ত্রে পরিণত হতে লাগল, বিশেষ করে এক শ্রেণির মানুষের মন থেকে আদর্শবোধ-মানবিকতা-চেতনা এসব হারাতে বসল। কেউ কণামাত্র ত্যাগের কথা ভাবে না। ভোগের দিকেই ছুটে চলেছে। সেই ভোগ্যবস্তু পাবার জন্য যে কোনও পথ নিতে তারা প্রস্তুত। স্বাধীনতার পর বহু কলকারখানা তৈরি হল। প্রাচুর্য বাড়ল। কিন্তু মানুষকে এই যুগোপযোগী করে তোলার মতো কোনও কাজই করা হল না। তাই মানুষ তার মনুষ্যত্বই হারাতে বসল। ক্ষমতা অযোগ্য, স্বার্থপর, অমানুষদের হাতে পড়ে মানুষের যুগোপযোগী সংস্কারের কথা ভাবা হল না, বরং সমাজ সংস্কারের কথা ভেবে প্রভূত টাকার ব্যবস্থা করা হল।

কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হল না। বরং পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির মানুষ গ্রামীণ শান্ত জীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলার আয়োজনই করছে। বিনয়বাবু ওই নরেশের ব্যাপারেও চিন্তিত। এ যেন এক ঈশানের কালো মেঘ, এখন তার সর্বনাশা রূপের ইঙ্গিতই নিয়েছে মাত্র, পরে সারা আকাশ কালো করে ঝড় না তোলে। নরেশের আগেকার ইতিহাসটাও জানেন বিনয়বাবু। নরেশ ওই নেতাগিরি করে কৌশলে যা অর্জন করেছেন তা কম নয়। এবার পঞ্চায়েতেও ঢুকতে চান।

নরেশ এসেছেন বিনয়বাবুর বাড়িতে। নরেশ বলেন,—পঞ্চয়েতের যা করা উচিত তা করা হচ্ছে না। টাকাকড়ি যা আসে তাও ঠিকমতো ব্যয় করা হয় না। জনসাধারণও পঞ্চায়েতের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই ভাবছি আমরা যারা সমাজ সচেতন সেই সব মানুষ ওই পঞ্চায়েতে যাবার চেষ্টা করব, তাই আপনার কাছে এসেছি।

বিনয়বাবু বলেন,

—আমার তো সময় নেই। স্কুলের কাজ, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার কাজও করতে হয়।

নরেশ এতকাল শ্রমিকসেবা করেছেন, তবে কারখানার কাজ কিছু করেননি, তাই বলেন,

—পড়াশোনার জন্য অন্য শিক্ষকরা আছেন, তাঁরা পড়াবেন, আপনি সমাজসেবার কাজ করেন, স্কুলে না পড়ালেও হবে। আপনার ক্লাসগুলো আমরা নেব। আপনি মাসের শেষে গিয়ে সই করে মাইনেটা আনবেন।

বিনয় এহেন অধিকারের কল্পনাও করেন না। তাই অবাক হন বিনয়বাবু—সেকী! আমি শিক্ষক হয়ে ক্লাসে পড়াব না, মাসের শেষে গিয়ে মাইনে নিয়ে আসব? কী বলছেন আপনি?

নরেশবাবু বলেন,

—এই তো হয় মশাই।

—না, এ অন্যায়, যদি হয় তা হলে দেখবেন সরকার আইন করে শিক্ষকদের এই ধরনের রাজনীতি করা বন্ধ করবে। আমি একে সমর্থন করি না মশাই। এমন সমাজসেবার কাজ আমার দ্বারা হবে না।

নরেশবাবু হতাশই হন। বিনয়বাবু বলেন,

—কর্ম-সংস্কৃতি বলে একটা কথা আছে। সমাজের দেশের উন্নতির সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সেই কর্ম-সংস্কৃতিকে বজায় রাখতেই হবে। আমাকে আমার কাজ করতে দিন নরেশবাবু। ভালো কাজ যদি করেন আমার সমর্থন নিশ্চয়ই থাকবে। উঠি, স্কুলে যাবার সময় হয়ে গেছে। উঠে পড়েন বিনয়বাবু, নরেশবাবু হতাশই হন। অবশ্য তবু আশা ছাড়েন না তিনি।

নরেশবাবু বলেন,

—আজ চলি বিনয়বাবু। পরে কথা হবে।

নন্দবাবু এখন নানা কাজে ব্যস্ত। নটবরও এখন নন্দবাবুর বাড়ির একজন হয়ে গেছে। নন্দবাবুর ছেলে কিশোর অবশ্য এখন কলেজে পড়ে। কটা বছর কেটে গেছে। এবার বি-এ দেবে।

নটবরের পিতৃদেব নিত্যানন্দ ভটচাযের বয়স হয়েছে। আগেকার মতো গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন যজমানের বাড়িতে পুজো করতে যেতে পারেন না, অবশ্য এখন তাঁর দিন কিছুটা বদলেছে। নটবর-এর দৌলতে তাঁর দু-তিন ছেলে ওই মন্দিরতলায় হাটে দোকান করে ভালো রোজগার করেছিল। বাবা রত্নেশ্বর শিবের সেবাইত-এর বয়স হচ্ছে, তাঁর ছেলে নেই। দুটো মাত্র মেয়ে। জামাই বর্ধমানের কাছারিতে কাজ করে। মেয়ে-জামাই সেখানেই থাকে। নিজেদের বাড়িও ওখানে। আর ভদ্রলোক ভালোই রোজগার করেন, আর মন্দিরে এসে ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো করেন না।

সেবাইতেরও শরীর ভালো নেই! ওর এক ভাগ্নে এসে জুটেছে। সেইই নাকি সেবাইত হবে, এমন সময় কয়েকশো গ্রামের লোকজন নিয়ে নটবর তার চ্যালার দল নিয়ে এসে পড়ে মন্দিরে। ওই ভাগ্নেকে পুজো করতে দেওয়া হবে না। নটবরের দল চিৎকার করে, বাইরের কেউ মন্দিরে পুজো করবে না।

সেবাইতও এসে পড়ে। তার পক্ষেও দু-চারজন লোক যুক্তি দিতে চায়। তাই নিয়েই

বাধে বচসা, অন্য দলের সঙ্গে। তার পরই ওই শান্ত ছায়াঘন পরিবেশে পরপর কয়েকটা বোমা পড়ে। হইচই কাণ্ড। লোকজন যে যেদিকে পারে দৌড়োতে থাকে বোমার ভয়ে। গাছগাছালির বুকে পাখির দল কলরব করে। মন্দিরে সেবাপুজো বোধহয় হবে না। এ নিয়ে আবার জমায়েত হয়।

নরেশবাবুও এসে পড়েন। তিনি জানেন ঘোলাজলে কী করে মাছ ধরতে হয়। তিনি বলেন,—গ্রামের কোনও প্রবীণ পূজারিকেই এবার এই মন্দিরের সেবাপূজার ভার দেওয়া হোক। মূল সেবাইত যতদিন বাঁচবেন তিনি পাবেন মন্দিরের ছ-আনা প্রণামি। বাকি পাবেন যিনি পূজা করবেন তিনি। নটবরও এমনি একটা মীমাংসার কথাই বলেছিল। সে চায় তার বাবাই মন্দিরে বহাল হোক। তার আরও ভাইরা তো রয়েছেই। মন্দিরের আয়ও কম নয়। এছাড়াও কিছু নিষ্কর দেবোত্তর জমিও আছে। তার আয়ও আছে।

নটবর-এর এই আন্দোলনকে যে কোনও কারণেই হোক গ্রামের, আশপাশের গ্রামের অনেকেই সমর্থন করে। নন্দবাবু অঞ্চলপ্রধান। তিনি তখন বাইরে। নটবর ঠিক সময় বুঝেই এই আন্দোলন করেছে। এর পর নিতু ভটচায মন্দির দখল করেছে। অবশ্য নটবর এসব মন্দিরের ব্যাপারে আর তত আগ্রহী নয়। ও পঞ্চায়েতের হয়ে এখন বেশ কিছু পথ-কালভার্ট তৈরির কাজের ঠিকাদারি করছে।

মন্দিরের সেবাইত ভবতারণ চক্রবর্তীর বেশ বয়স হয়েছে। শরীর ভেঙে পড়েছে। এতটা পথ হেঁটে আর ওই মন্দিরে দুবেলা যাওয়া সম্ভব নয়। বাসন্তী পড়াশোনা করেনি। তবে দেখতে ও মোটামুটি সুন্দরীই। তাই তার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। মেয়েটা দেখেছে নটবরকে। পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা তারা। বাসন্তী দেখেছে নটবরকে নন্দবাবুর সঙ্গে মিটিং-এ মিছিলে। ইদানীং একটা পুরোনো মোটরবাইকও জোগাড় করেছে। তার ঠিকাদারিব কাজে এখন ভালোই আমদানি হচ্ছে।

ওসব কাজ দেখাশোনার জন্য মোটরবাইকের দরকার হয়, আর জিনস্ পরে শীতের দিন গায়ে জ্যাকেট টুপি পরে মোটরবাইকের গর্জনে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ঘুরে বেড়ালে লোকেও সমীহ করে। তাই নটবর ওটা কিনেছে। অনেক কিছুই পেতে চায় সে। মন্দিরের সেবাইত-এর লোভনীয় পদটা সে আপাতত গায়ের জোরে দখল করে ওর বাবাকে সেখানে ফিট করেছে। কিন্তু এর মধ্যে সেবাইতের ভাগ্নে সমর এই দাবি ছাড়তে নারাজ। সেও এখন নন্দবাবুর কাছে দরবার শুরু করেছে। পঞ্চগ্রামের লোকেদের ডেকে এনে মিটিং করেছে। অবশ্য নটবর সেই মিটিং-এ তার লোকেদের ফিটফাট করে গোলমালও করেছিল। কিন্তু ভাগ্নে বাবাজিও বেশ এলেম রাখে। সে নন্দবাবুকে এর মধ্যে প্রভাবিত করেছিল। নন্দবাবু বলেন, এসব গোলমাল করা ঠিক নয়। সেবাইতই এসবের মালিক, সে তার নিজের পছন্দমতো লোককে সেবার কাজে লাগাতে পারবে।

নটবর সেদিনই বুঝেছিল যে নন্দবাবুর জন্য সে এত কিছু করেছে, যাকে গুরু বলে মেনে এসেছে সেই নন্দবাবু তার এই পূজারির পদটা দখলের চেষ্টাকে সমর্থন করেন না। এখন তাই বিপদে পড়েছে নটবর। ওদিকে ভাগ্নে বাবাজিও সদরে মামলা করেছে। অবশ্য মন্দিরের মামলার দিন নটবর নিজে দু-তিন জন সাক্ষীর বাড়ি গিয়েছিল। মন্দিরের পাশেই থাকেন জলধরবাবু। জলধরকে নটবর বলে,

—কাল মামলার সাক্ষী দিতে গেলে ভালো হবে না জলুকাকা।

জলধরবাবু বলেন,

—কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি। সেবাইত ঠাকুরই মালিক। নটবর এবার পিঠ চুলকানোর ভঙ্গিতে জামাটা ঈষৎ তুলে চেষ্টা করতে কোমরে গোঁজা সেই রিভলবারের বাঁটটাও দেখা যায়। ওটা কী বস্তু তা জলধরবাবুর জানা আছে। নটবর বলে,

—সাক্ষী দিতে যাবেন যান। কিন্তু তার পর আমাকে দোষ দেবেন না। বাইরের কে না কে এসে মন্দিরের দখল করবে। এটা হতে দোব না। যা করবেন বুঝেসুঝেই করবেন।

চলে যায় নটবর। জলধরের এবার বুক কাঁপে। এর আগে বিনয়বাবুর ঘটনাটাও জলধর জেনেছিল। সেদিন নরেশ না থাকলে কী হত কে জানে।

জলধরও তাই আর সাক্ষী দিতে যায়নি অসুস্থতার ভান করে।

সেই মামলার আবার দিন পড়েছে।

নটবর তাই ভাবছে, এবার তাই একটা অন্য পথই নিতে হবে তাকে, ওই মন্দিরের জমিদারি সে ছাড়বে না।

সেদিন নটবর বাড়িতেই রয়েছে। বাড়ির বাইরে একটা ঘর তুলে এখন সেখানেই দলবল নিয়ে থাকে নটবর। হঠাৎ বাসন্তীকে আসতে দেখে চাইল। বাসন্তীকে চেনে নটবর। হঠাৎ বেশ কিছুদিন পর দেখে চমকে ওঠে নটবর। বাসন্তীর সারা দেহে যৌবন যেন উপচে পড়েছে। ডাগর চোখে কী যেন অতল সাগরের রহস্যময়তা।

নটবর এই ঘরে বসে তার ঠিকাদারির হিসাব দেখছিল। এবার দু-তিনটে কাজে সে বেশ লাভই করেছে। নটবর বলে,

—এসো—এসো। বাসন্তী!

বাসন্তী এসেছে নটবরের কাছে। এই প্রথম কেউ নটবরকে যেন স্বীকৃতি দিতে এসেছে তার ক্ষমতার। বাসন্তী বলে,

—এসব কী করছ তুমি? বাবার শরীর খারাপ। ওই মন্দিরের আয়েই আমাদের দিন চলে। সেটুকুও কেড়ে নিতে চাও তুমি?

নটবর বলে,

—তোমার বাবা তো ভিনগ্রাম থেকে এক ভাগ্নেকে এনে ওসব দিতে চায়। সে তো তোমাদের ঠকাবে দুদিন পর। সব কিছু চলে যাবে অন্য জনের হাতে।

বাসন্তী বলে,

—তা হয়তো পরে যাবে। কিন্তু বাবা যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন তো তিনি, আমরা কিছু পাব, এখন তুমিই তো আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছ, আমাদের চলবে কী করে ভেবেছ?

নটবর এই প্রথম কথাটা নতুন করে ভাবছে বাসন্তীর জন্য। আজ নটবরও যেন বদলে যায় ওই সুন্দরী মেয়েটার কথায়।

নটবর বলে,

—আমি ভেবে দেখছি কী করলে সবকিছু বজায় থাকে। তোমার সমস্যারও সমাধান হয়।

বাসন্তী বলে,

—তোমার তো অনেক ক্ষমতা এখন। নন্দবাবুও তোমার কথা শুনবে।

নটবর এবার নন্দবাবুর ব্যবহারে খুশি হতে পারেনি। ভোটের আগে নন্দবাবু ছিল নটবরের উপর নির্ভরশীল। এখন কিশোর পাস করে এসে বাবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে পঞ্চায়েতের কাজ দেখছে। আরও আশ্চর্য হয়েছে নটবর যে বিশালপুরের নদীতে একটা ছোট-বাঁধ দিয়ে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প থেকে ওখানে জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে। তার জন্য ড্যাম—নদীর দুদিকে ক্যানেলও তৈরি হবে। প্রায় ষাট লাখ টাকার কাজ।

নটবরও ভেবেছিল ওই কাজটা হাতে পাবে সে। অবশ্য নন্দবাবুর সমিতির মাতব্বরদের দিয়ে-থুয়েও ভালোই থাকবে তার। আর একটা বড় কাজ করতে পারলে সরকার থেকে আরও বড় কাজ পাওয়া যাবে। এই নিয়ে নটবরও যাতায়াত শুরু করে। দু'-একজনকে এর মধ্যে বেশ কিছু প্রণামিও দিয়েছে কিন্তু তাদের কথামতো টেন্ডারও জমা করে ঘোরাঘুরি করছে। নন্দবাবুকে ধরেছিল নটবর।

—কাকু ওই কাজটা আমি যেন পাই। জানেন তো ওসব করার এলেম আমার আছে।

নন্দবাবু বলেন,

—টেন্ডার দাও। ওদের সঙ্গে আলোচনা করি।

নটবর তার টেন্ডার পেপারটা দেখায় নন্দবাবুকে। ওঁকে সে দেবতার মতো মান্যি করে। উনিই তাকে রাজনীতিতে এনেছিলেন। নটবর বলে,

—সদরে ওদের কথামতোই এই টেন্ডার জমা দিয়েছি।

নন্দবাবুও টেন্ডারপত্রটা দেখে বলেন,

—ঠিক আছে, জমা দাও। আমিও সদরে চেষ্টা করছি যাতে কাজটা পাও।

নটবর অনেক আশা নিয়েই টেন্ডার জমা দেয়, হাঁটাহাঁটি শুরু করে। কিন্তু টেন্ডার বের হবার দিন সে দেখে টেন্ডার পাস হয়েছে। তবে তার নয়, ওই কাজটা পেয়েছে কিশোরই, নন্দবাবুর ছেলে। সে লেখাপড়া জানে। বাবার টাকা, প্রতিষ্ঠা কোনও কিছুরই অভাব নেই। তাই ওই কাজটা সে পেয়েছে। নটবর বুঝেছে এবার থেকে নন্দবাবু আর তার দিকে চাইবেন না। এত বড় কাজটা তাকে পেতে দিলেন না। নটবরও বুঝতে পারে নন্দবাবুকে টেন্ডারটা দেখিয়ে সে ভুলই করেছিল। নন্দবাবু কিশোরের টেন্ডারে তার থেকেও কিছু টাকা কম রেট দিয়েছিল। তাই আইনত কিশোরের কাজ পেতে বাধা হয়নি। নন্দবাবু নটবরকে বলেন,

—কী করে কী হল বুঝছি না নটবর। তবে তোকে রাস্তার ঠিকাদারি আরও দুটো পাইয়ে দেব।

নটবর জানে, মনের রাগটা মুখে প্রকাশ করতে নেই। সে তাই নন্দবাবুর কথায় বলে,

—দেখুন কী করা যায়।

তবে মনে মনে নটবর জ্বলে উঠেছে। তার জেদ-রাগ এবার সেও নন্দবাবুকে এমন আঘাত হানবে যে নন্দবাবুও সেটা জীবনে ভুলতে পারবে না। এরপরই নন্দবাবু ওই মন্দিরের সেবাইতের পদ নটবর দখল করতে গেলে তাকে সাহায্য করেনি। বরং সেই ভাগ্নেকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। নটবর এবার নিজের চেষ্টাতেই এসব বাধা দূর করে। আর পথও যেন পেয়ে গেছে সে।

বাসন্তীকে বলে নটবর,

—এ নিয়ে তুমি ভেবো না। সেবাইত মশাইকে বোলো আমি তাঁকে বঞ্চিত করতে চাই না।

সেবাইত ভবতারণ পণ্ডিত এবার বিপদেই পড়েছে, এতদিন শরীর সচল ছিল। বড় মেয়ে-জামাই বর্ধমানে রয়েছে। বাসন্তীর বিয়ে থা-র চেষ্টা করছে। কিন্তু এবার শরীর ভেঙে পড়তে ভবতারণও বিপদে পড়েছে। এতটা পথ ভেঙে ভোরে মন্দিরে যেতে হয়। মন্দিরে পুজো—যজমান ভক্তদের পুজো করতে বেলা দুপুর হয়ে যায়। তার পর মন্দির বন্ধ করে বাড়ি ফিরে খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে গিয়ে মন্দির খুলতে হয়। সন্ধ্যারতি শীতলভোগের পর মন্দির বন্ধ করে বাড়ি ফিরতে রাত আটটা-নটা বাজে। এ তো প্রাত্যহিক ব্যাপার। আবার সোম-শুক্রবার বা কোনও উৎসবে বিশেষ করে চৈত্র মাসে শিবরাত্রির সময় আমদানিও যেমন হয়, পরিশ্রমও করতে হয় তেমনি। এই বয়সে এত ধকল সহ্য হয় না, তাই ভাগ্নেকে এনেছিল, সে তার হয়ে পুজো পাঠ করবে। নিজে কিছু রেখে বাকি সবই দেবে ভবতারণকে। কিন্তু ভাগ্নে বাবাজি এখানে সোনার খনির সন্ধান পেয়ে নিজেই সেবাইত পদের জন্য একেবারে কোর্ট-কাছারি পর্যন্ত করছে।

বাসন্তীও বাবার সমস্যাটা বুঝেছে। তাই এখন তাকেই পাশের গ্রামে রমন ডাক্তারের কাছে যেতে হয় বাবার ওষুধপত্র আনতে।

ভাগ্নে বাবাজির মামাকে দেখার সময় নেই। ভাগ্নে শীতলচন্দ্র এর মধ্যে নন্দবাবুর ছেলে কিশোরকে মুরুব্বি ধরে এখন মামাকে আউট কবে মন্দির দখল করার স্বপ্ন দেখছে।

বাসন্তীই ভবতারণকে বলে,

—এমন ভাগ্নেকে আনলে যে তোমাকেই না ঠকায়। ও তো নিজেই সবকিছু দখল করতে চায়। এ যে খাল কেটে কুমির আনলে বাবা।

ভবতারণের স্ত্রীও বলে,

—ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে, ভূত বলে আমি পেলাম কাছে। এ হয়েছে তাই। এখন সর্বস্ব না যায়।

এমনি দিনে বাসন্তী গিয়েছিল নটবরের কাছে। বাসন্তী ভেবেছিল নটবর তাকে পাত্তাই দেবে না। মন্দির এখন তার দখলে। তার ওটা আটকে রাখার মতো শক্তিও আছে কিন্তু নটবর বাসন্তীর কথা শুনেছে। তাকে কথাও দিয়েছে।

ক'দিন পর মোটরবাইকের শব্দ শুনে হঠাৎ চাইল বাসন্তী। ওদিকে বাবাও বসেছিল। সেও দেখে নটবর এসেছে তাদের বাড়িতে। এখন সে এলাকার নামী লোক। ঠিকাদারি করে ভালো রোজগার করে। নটবর-এর হাতে একটা প্যাকেট, সদর থেকে আনা—আপেল-বেদানা-কলা তাছাড়া শহরের নামী দোকানের এক প্যাকেট সন্দেশ।

নটবর বলে,

—শহরে গেছলাম, তাই এগুলো আনলাম। সামান্য ফল, রাখুন।

ভবতারণ বলে, .

—এসো বাবা। তা এতসব কেন?

মাও এসে পড়ে, সে বলে,

—ওরে বাসন্তী নুটুর জন্য চা কর। কদিন পর এলে বাবা। এখন তো কী যে আতান্তরে পড়েছি। ঘরে ওই আইবুড়ো মেয়ে। মন্দিরের আয়েই দিন চলছিল। ওই শীতলকে আনলাম। ও এসে সব কেমন গোলমাল পাকিয়ে দিল।

নটবরও দেখেছে এদের সংসারের অবস্থা। এখন এদের সাহায্যের খুবই দরকার। নটবরও কথাটা ভেবেছে। মন্দিরের আয়ের তার দরকার নেই। কিন্তু এটা দখল করার শক্তি সে রাখে শুধু সেটা দেখাবার জন্যই নটবর মন্দির দখল করেছে।

নটবর বলে,

—ওই শীতল কেন মন্দিরের দখল নেবে কাকিমা? মন্দির আমাদের, ওর হাত থেকে বাঁচার জন্যই আমি আটকে রেখেছি।

ভবতারণ বলে,

—কিন্তু এর মধ্যে শীতল কিশোরবাবুকে হাতে এনে আমাকেই হঠাতে চায়, কী যে করি বাবা। অথর্ব হয়ে গেছি। লোকবল, অর্থবলও নেই, একা বাসন্তীই বা কী করে?

নটবর বলে,

—একটা পথ আছে চক্রবর্তী মশাই,

ভবতারণ শুধায় ব্যাকুল কণ্ঠে,

—কী পথ বাবা?

—যদি আপনাদের অমত না থাকে তো বলি। অবশ্য সব কিছুই আপনাদের মতামতের উপর নির্ভর করে আছে।

ভবতারণের স্ত্রীও শীতলের হাত থেকে বাঁচতে চায়। তাই বলে,

—কী পথ বাবা, উপায় থাকলে নিশ্চয়ই মত দেব।

—আমাকে কি ভরসা করতে পারেন আপনারা? এখন আমার অবস্থা কিছুটা ভালোই। নিজের বাড়িও তৈরি করেছি। দুটো পয়সাও রোজগার করি খেটেখুটে।

ভবতারণ বলে,

—এসব কথা উঠছে কেন বাবা?

নটবর বলে,

—আমরা আপনাদের পালটা ঘরও। যদি বাসন্তীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেন, তা হলে বাসন্তীই হবে মন্দিরের সেবাইত, আইন তাই বলে। আপনিও মন্দিরের আয়পয় সব পাবেন।

ভবতারণ কথাটা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। ওর স্ত্রীও অবাক হয়। সে বলে,

—এ কী বলছ বাবা! বাসন্তীর কি এমন ভাগ্য হবে?

নটবর বলে,

—সেটা নির্ভর করছে আপনাদের মতামতের উপর। এটা হলে সবদিকই রক্ষা পাবে সুষ্ঠুভাবে।

ভবতারণও ভাবতে পারেনি যে নটবরের মতো ছেলে যেচে এসে এই প্রস্তাব দেবে। নটবরের সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। তবু ও যে এই অঞ্চলের মধ্যে মাথা তুলেছে নিজের জোরে সেটা সকলেই জানে। ভবতারণবাবুও। বাসন্তীও সুখী হবে। আর

সব চেয়ে বড় কথা, ভবতারণবাবুদেরও একটা নির্ভর হবে। ভবতারণ বলে,

—তোমায় কী বলে আশীর্বাদ করব বাবা জানি না, এ তো সুখের কথা।

বাসন্তী চা নিয়ে আসছিল। সেও ভাবতে পারেনি যে নটবর আসবে তাদের বাড়িতে এমনি প্রস্তাব নিয়ে। বাসন্তী দেখেছে বাবা-মায়ের অসহায় অবস্থাটাকে। সে নিজে কিছু করতে পারেনি। আজ নটবর এসেছে তাকে বিয়ে করে এই হতভাগ্য পরিবারকে সাহায্য করতে, ওই নটবর সম্বন্ধে বাসন্তীর ধারণাটাও বদলে যায়।

চায়ের কাপটা নামিয়ে দিয়ে সে বের হয়ে আসে।

—তা হলে তোমাকেই যা করার করতে হবে। আমি তো অক্ষম।

—ওর জন্য ভাববেন না। আমি তো আছি, তবে একটা কথা—

ভবতারণ চাইল, নটবর বলে,

—এসব কথা এখন বাইরে জানাবেন না, সব ব্যবস্থা করি—দিনক্ষণ ঠিক হলে তখন তো সবাই জানবে।

ভবতারণ বলে,

—তাই হবে বাবা।

নটবর বের হয়ে আসছে। বাইরে খামারবাড়ির কাছে বাইকের কাছে বাসন্তীকে দেখে চাইল নটবর। বাসন্তী বলে,

—তুমি কি আমায় দয়া দেখাতে এসেছিলে?

নটবর বলে,

—না-না। ওসব কথা কেন বলছ বাসন্তী। তোমাকে সেদিন দেখে মনে হয়েছিল আমার পাশে একজনকেই চাই যে আমাকে সাহস দেবে। তোমার সেই সাহস আছে।

—তাই নাকি? বলে বাসন্তী।—কী করে জানলে?

নটবর বলে,

—তোমার সেই সাহস না থাকলে আমার মতো একটা বেপরোয়া ছেলের কাছে জেনেশুনে প্রতিবাদ জানাতে যেতে না। সেদিনই তোমাকে চিনেছিলাম। আর ঠিক করেছিলাম তোমাকেই পাশে চাই। চলি—

নটবর চলে যায় মোটরবাইকের গর্জন তুলে। বাসন্তীও যেন নতুন এক নটবরকে দেখছে যে বিপদের দিনে তাদের পাশে এসেছে। নটবরের বাবা নিতু ভটচায এখন ছেলের জন্য গর্বিত। সে ভাবতে পারেনি যে সেই বাতিল ছেলেটা আজকের সমাজের একজন হয়ে উঠবে।

ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে বিয়েতে তাই নিতু ভটচাযও আপত্তি করেনি। এর মধ্যে অবশ্য নটবর গ্রামের ওদিকে বেশ কিছুটা জায়গা কিনে হাটতলার কাছেই বাড়িও করেছে। বাড়ির লাগোয়া বিঘে দেড়েক জায়গাতে গাছগাছালিও রয়েছে।

পঞ্চগ্রামের মানুষ এবার জেনেছে যে ভবতারণের মেয়ের সঙ্গে নটবরের বিয়ে হচ্ছে। খবরটা শুনেছে নন্দবাবুও। নটবর অবশ্য শহর থেকে বেশ সুন্দর দামি বিয়ের কার্ড ছাপিয়ে এনে নিজেই গেছে নন্দবাবুর কাছে। ওঁকে কার্ড দেয়। কিশোরকে বলে,

—তোমাকে বিয়ের কাজকর্ম দাঁড়িয়ে থেকে দেখাশোনা করতে হবে কিশোর। কিশোর এর মধ্যে বাবার নিপুণ সহকারী হয়ে উঠেছে। এখন সে ড্যামের কাজ ছাড়াও পঞ্চায়েতের

বেশ কিছু কাজ করছে। নটবরকে এখন কাজকর্ম দেয় ওরা, কিশোর বুঝেছে নটবরের চালটা, কিশোরও চেয়েছিল ভবতারণের ভাগ্নে শীতলকে সামনে রেখে সেই নটবরের দখলদারি ঘুচিয়ে দেবে।

কিশোরও সারা এলাকার মানুষকে নিয়ে মন্দির কমিটি গড়ে নিজের প্রাধান্য পেতে চায়। ওই হাটতলার বিশাল জায়গা মন্দিরের, ক্রমশ এদিকে বসতি বাড়ছে। বড় রাস্তা হয়ে গেছে ফলে হাটের গুরুত্বও বাড়ছে। কিশোর-এর সঙ্গে শীতলের অলিখিত চুক্তিও হয়েছে, যদি শীতল সেবাইতগিরির পদ পায় কোর্টের রায়ে সে মন্দির নিয়ে খুশি থাকবে। আর কিশোর দখল করবে ওই মূল্যবান বিঘে দশেকের বাগানসহ হাটের সব অধিকার।

কিন্তু এবার মূল সেবাইতের মেয়েকে বিয়ে করে নটবর ওদের সব চেষ্টাতেই জল ঢেলে দিয়েছে। বাসন্তীই আইনত মন্দিরের সেবাইতের পদ পাবে। আর নটবর তার স্বামী হলে স্ত্রীর সম্পত্তিতে হবে তারই অধিকার। তাই কিশোরও এবার ভাবনাতে পড়েছে। আর মুষড়ে পড়েছে শীতলও। নটবর যে এমনি একটা মোক্ষম চাল চালবে তা ভাবেনি।

খবর পেয়ে শীতলই আসে ভবতারণের কাছে, সঙ্গে কিশোরও। শীতল বলে,

—এ কী করলে মামা। বাসন্তীর মতো মেয়েকে তুলে দেবে নটবরের মতো একটা বখাটে ছেলের হাতে?

কিশোর বলে,

—এ যে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। চক্রবর্তী মশাই আমি বাসন্তীর জন্য সুপাত্র দেখে দেব। মেয়েটার জীবন বরবাদ করবেন না। ও ব্যাটা সব পারে। মেয়েটার সর্বনাশ না করে।

শীতল বলে,

—ঠিক কথা। তাই এসব শুনে ছুটে এলাম।

বাসন্তীও সব শোনে ওদের কথা। সে বুঝেছে কিশোরই শীতলকে নিয়ে এসেছে তার নিজের স্বার্থে। শীতলও মন্দিরের দখল পেতে চায়। ভবতারণের স্ত্রী বলে,—নটবর তবু নিজে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াতে চাইল শীতল, এতদিন তো তুমি আসনি, আজ এসেছ। আর কিশোরবাবু আপনি তো আমাদের কথাও ভাবেননি, এতদিন পরে আজ হঠাৎ এত দরদ উথলে উঠল কেন?

বাসন্তী নটবরকে চিনেছে। আজ সে তবু পায়ের তলে মাটি পেতে চায়। ওই কিশোব শীতলদের বিশ্বাস করে না।

ভবতারণও স্ত্রীর কথার জের ধরে বলে,

—আমি কথা দিয়েছি ওকে। বিয়ে নটবরের সঙ্গেই দেব।

শীতল বলে,

—আপনার মেয়ে, তাকে গলায় কলসি বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন মামা, পরে বুঝবেন।

নটবর সবই শোনে। সে ভাবেনি যে কিশোর যেচে ভবতারণ চক্রবর্তীর বাড়ি এসে তার নামে এইসব বলবে। কিশোর, নন্দবাবু এবার নটবরের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বিরোধেই

নামতে চায়। ওদের কাছে নটবরের দিন ফুরিয়েছে। নটবরও এবার দেখিয়ে দেবে সে কী করতে পারে।

শীতলের মামলার দিন পড়েছে। শীতল এখন কিশোরের বাড়ির লোক। সেদিন শীতল ফিরছে সদর থেকে। নটবরের চ্যালা নিবারণ আর কেষ্টলালও তৈরি ছিল। তখন রাত হয়েছে। শীতল সাইকেল রিকশা থেকে নেমে কিশোরদের বাড়ির দিকে যাবে। এবার নিবারণ আর কেষ্ট তার গলাটা টিপে ধরে, চিৎকার করার সাধ্য নেই। দুজনে ওকে তুলে নিয়ে চলে যায় পুকুরের ওদিকে। ওদিকটা নির্জন। সেখানে শীতলকে বেদম প্রহার দিয়ে বলে, —এই রাতেই চলে যা। যদি প্রাণে বাঁচতে চাস। এখানে পরদিন সকালে দেখলে তোকে আর আস্ত রাখব না। কিশোরের বাপও তোকে বাঁচাতে পারবে না।

ওরাই একটা রিকশা ভ্যানে চাপিয়ে ওই রাতে বাস রাস্তায় এনে ভোরের বাসে তুলে দিয়ে বলে,

—চলে যা, ফিরে এলে লাশ হয়ে যাবি।

শীতলও বুঝেছে তার আর করার কিছু নেই। বাসন্তীর বিয়ে হয়ে গেলে ওই মামলা লড়বে নটবর। সেটা যে খুব সুখের হবে না, কোনও ফলও হবে না, এটা বুঝেই শীতল সরে যেতে চায় এখান থেকে। ওদের বিশ্বাস নেই। তাই শীতল শূন্য হাতে প্রাণটা নিয়েই ফিরে গেল।

নটবর বিয়েতে অবশ্য আয়োজনের ত্রুটি করেনি। নতুন বাড়িটাকে সাজিয়েছে রঙিন আলোয়। অতিথিদের আদর-আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি করেনি। অবশ্য নন্দবাবু সস্ত্রীক এসে সোনার বালা দিয়ে নববধূকে আশীর্বাদ করে যান। কিশোর আসতে পারেনি, সে কাজ নিয়ে সাইটে পড়ে আছে। নিতু ভটচাযও সেজেগুজে বরকর্তা হয়ে অতিথিদের আপ্যায়ন করেছে। আর এসেছেন নরেশবাবু। তিনি এখন নটবরের কাছের লোক। উৎসব সমারোহে কেটে গেছে।

বাসন্তী এসেছে নিজের ঘরে। ভবতারণ চক্রবর্তীও নিশ্চিন্ত হয়েছে। নটবরও তার কথা রেখেছে। সেই তার ভাইকে দিয়ে পুজো করায়। মন্দিরের অন্য সব কিছুই আসে ভবতারণের ঘরে। ভবতারণের স্ত্রী বলে,

—বাবা মহাদেবই দয়া করে এসব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন গো। বাসন্তীও ভালোই আছে।

ভবতারণও নটবরের কাছে ঋণী। সে অন্তত একটা পরিবারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

উৎসবের ঝামেলা চুকতেই এবার নটবর আবার কাজে মন দেয়। সেদিন পঞ্চায়েত অফিসে গেছে। এখন প্রধানের অফিসে নন্দবাবু সব সময় থাকে না। অফিসের কাজকর্ম দেখে কিশোরই। ওর সম্বন্ধে বেশ কিছু অভিযোগই উঠেছে। অনেকের কৃষিঋণ ঠিকমতো দেয়নি। বেশ কিছু স্বনির্ভর প্রকল্পের টাকাও কয়েকটা গ্রুপের কাছে পৌঁছয় না। ওদিকে সে উলটে নটবরের দুটো বিলের টাকাও আটকে দিয়েছে। নটবর তাই গেছে পঞ্চায়েত অফিসে।

নটবর এতদিন পঞ্চায়েত অফিসে অবাধেই যাতায়াত করেছে। এ তার খুব চেনা জায়গা। কেরানিও জানত ও নন্দবাবুর লোক। তাই ওর বিলও আটকাত না। এখন কেরানিই বলে,

—আমার করার কিছুই নেই নুটুবাবু। কিশোরবাবু এখন সব কাজকর্ম দেখছেন, তিনিই আপনার বিল আটকেছেন।

নটবর জানে কিশোরই এবার তাকে মাথা তুলতে দিতে চায় না। কিশোর বাবার পদটা পাবার জন্য ভোটেও দাঁড়াবে। তাই এখন থেকেই তৈরি হচ্ছে।

নটবর বলে,

—কিশোরবাবু কে? নির্বাচিত সভ্য ও নয়। ওর কী অধিকার আছে বিল আটকানোর। অন্য মেম্বাররা কেন ওকেই মেনে নেবে, যা করার প্রধানই করেন, না হয় মেম্বাররা। ও কে?

কেরানি বলেন,

—অন্যেরাও কিছু বলে না। ওদের দলেরই লোক।

নটবর কিশোরের কাছে যেতে চায় না। সে ওকে মানেও না। তাই নটবর সেদিন এসেছে নন্দবাবুর বাড়িতে। নন্দবাবু এখন নিজের ব্যবসাপত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। ব্যবসাও বেড়েছে। ভেবেছিলেন কিশোরও ব্যবসার কাজকর্ম দেখবে। কিন্তু কিশোর পদমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মোহেই আটকে পড়েছে। সে এখানে পঞ্চায়েতের অলিখিত কর্মকর্তা। তার দলের দু-চার জন সভ্য অবশ্য এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ভেবেছিল নন্দবাবুর অনুপস্থিতিতে তারাই হবে কর্মকর্তা। কিন্তু তা হয়নি। কিশোর যেন এই পঞ্চায়েতকে তাদের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে নিয়েই দখল নিয়েছে। নিজে সরকার। শুধু নন্দবাবু সই করে খালাস।

নন্দবাবু নটবরকে আসতে দেখে চাইল। বলে,

—আয় নটবর।

—আসতে হল কাকাবাবু। আমার কটা বিল আটকে দিয়েছেন। নতুন রাস্তার কাজটা দেবেন বলেছিলেন, সেটাও পাইনি।

নন্দবাবু বলে,

—এখন ওসব দেখছে কিশোর। ওকেই বলগে—

নটবর বলে,

—কিশোর কে? ওর তো এসব দেখার কোনও অধিকার নেই। যা করার তা আপনিই করেন। ওর কাছে আমি যাব কেন?

নন্দবাবু এবার বুঝেছে নটবরও এখন আর মুখ বুজে থাকবে না। কিশোরকে নন্দবাবুও সাবধান করেছে। এই নটবরকে যেন না ঘাঁটায়। কিন্তু কিশোর ওই মন্দির নিয়েই নটবরের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই করতে পারেনি।

নটবর শীতলকেই তাড়িয়ে দিয়েছে, সেই মামলাও খারিজ হয়ে গেছে। নন্দবাবু কিশোরের কাজকর্মের ব্যাপারে খুশি নন। এর মধ্যে অনেকে তাঁর কাছেও অভিযোগ করেছে।

কিশোরকেও বলে লাভ হয়নি। কিশোরের আশপাশে বেশ কিছু লোক জুটে গেছে। তারাই কিশোরকে যেন বিগড়ে দিয়েছে। তারা নটবরকেও দেখতে পারে না।

নন্দবাবু ভিতরের খবর নটবরকে জানতে দিতে চায় না। বলে,

—আমি দেখছি নটবর, তুই তিন-চার দিন পরে খবর নিবি।

নটবর বলে,

—তাই হবে। তবে কাকাবাবু, আপনি যদি নিজে নির্বাচিত প্রধান হয়ে নিজের কাজ না করেন—তাহলে এমন গোলমালই হবে। আর লোকে এটাকে মুখ বুজে মেনে নেবে না।

নটবর নন্দবাবুকে যেন সাবধানবাণী শুনিয়েই বের হয়ে গেল। নন্দবাবুও বুঝেছেন। নটবর যেন যুদ্ধের ডাকই দিয়ে গেল। ওই ছেলেটাকে নন্দবাবুও সমীহ করেন। ওর অসাধ্য কোনও কাজই নেই। সাহস-বুদ্ধি ওর আছে। তার জন্যই নটবর আজ জিরো থেকে হিরো হতে পেরেছে—যা কিশোর পারেনি।

বরং কিশোরের আত্মসম্মানে লাগে বাবার কথাগুলো। নন্দবাবু সেদিন বিকেলে নিজেই প্রধানের অফিসে এসেছিলেন। বাইরে তখন অনেক লোক অনেক দাবি-দাওয়া তাদের অসুবিধার কথা ও নানা সমস্যার কথা নিয়ে এসেছে। তারাই নন্দবাবুকে ঘিরে ধরে।

—বাবু আপনি কদিন আসেননি। অন্যদের কৃষিঋণ, বলদঋণ কিছুই পাইনি। কে বলে,

—কিশোরবাবু তো সব সময়ই নাকি ব্যস্ত। দেখাই করেন না।

নন্দবাবু ওদের কোনওমতে থামিয়ে ভিতরে যান। কিশোর তখন বন্ধু-বান্ধব কজনকে নিয়ে চা-পানে ব্যস্ত। চা-সিঙাড়া-সন্দেশ। দামি-সিগারেট সবই এসেছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। ও এই সময় নন্দবাবুকে ঢুকতে দেখে অবাক হয়।

নন্দবাবুকে দেখে এবার কিশোরের বন্ধুরাও কেটে পড়ে। নন্দবাবু এবার ওইসব কৃষিলোনের ফাইল দেখে অবাক হন। এতদিনের কোনও লোন স্যাংকশন হয়নি, অন্য বহু কাজও পড়ে আছে।

নন্দবাবু বলেন,

—এ তো তোমার টাকা নয়, সরকারের টাকা। ওদের দিলে তোমারই সুনাম হবে, ওদেরও কাজে লাগবে, এসব লোন কেন দাওনি?

কিশোর অবশ্য আসল কারণটা জানাতে পারে না। ধরণীবাবু ওই লোন যারা নেবে তাদের সঙ্গে এখনও রফা করে উঠতে পারেনি। আর অন্য কাজগুলোর জন্য কিশোরের ভাবনাও নেই। নন্দবাবু বলেন,

—সামনের ভোটে দাঁড়াতে গেলে, গদি বজায় রাখতে গেলে এসব কাজ তাড়াতাড়ি করতে হবে।

তার পরই আসে নটবরের বিলের কথা। কিশোর এতক্ষণ বাবার অনেক কথাই শুনেছে। এবার বুঝতে পারে বাবার আসার আসল কারণটা। তাই কিশোর বলে,

—ওর কাজের ইনস্‌পেকশনের রিপোর্ট এখনও পাইনি, ওরা রিপোর্ট না দিলে টাকা স্যাংশন হবে কী করে,

নন্দবাবু বলেন,

—ওটা পাওনি, না পেতে চাওনি। ও কাজ শেষ করে বিল দিয়েছে এক মাস আগে। ইনস্‌পেকশন রিপোর্ট তো সাতদিনের মধ্যে পাবার কথা। না পেলে তুমিই তাগাদা দেবে। সে সব তো কিছুই দাওনি।

কিশোর বলে,

—ওর কাজও ঠিকমতো হয়নি, তিন ইঞ্চি ঘেরা দেবার কথা—ও তা ঠিকমতো দেয়নি। লেবাররা তাই বলেছে।

নন্দবাবু বলেন,

—এটা তোমার কথা। এর কোনও দামই নেই। ইনস্‌পেকশনের রিপোর্ট দিতে বলো সাতদিনের মধ্যে, ওর টাকাটা মিটিয়ে দাও।

কিশোর চুপ করে থাকে। নন্দবাবু নিজেই সেই রিপোর্ট চেয়ে চিঠি দেন। নটবরেরও লোক আছে অফিসে, তারাও যেন কিশোরের কাজে মোটেই খুশি নয়। ওরা দেখছে কিশোরবাবুর মেজাজ সব সময়ই যেন বিগড়ে আছে। আর পয়সা না হলে কোনও কাজই হয় না। আগে তবু পয়সা দিলে কাজ হত, এখন পয়সা বেশি দিলেও কাজ হয় না, কিশোরের বন্ধুরাও হাত পেতে থাকে। নটবরও বুঝেছে এই কিশোর তার ব্যবসাপত্র শেষ করে দেবে। ও নিজেই সব লুঠতে চায়।

নটবর এবার ভাবছে কী করবে। কিশোর ওর প্রায় দেড়লাখ টাকার বিল আটকে রেখেছে। আবার গেছে নটবর নন্দবাবুর কাছে। নন্দবাবুও জানতেন নটবর আসবে। কিশোরও ওভারসিয়ারকে বলে কড়া ইনস্‌পেকশন করিয়েছে। সব কাজেই ওদের ঠিকমতো স্পেশিফিকেশন মানা হয় না। কিছু জল মেশাতেই হয়। আর সে বিল পাসও হয়ে যায়।

কিন্তু কিশোর ইচ্ছা করেই ওই রিপোর্টে সেই অনিয়মের কথাই লিখেছে আর বিলও আটকে রেখেছে। নন্দবাবু কিশোরকে এ সমস্ত করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু তবু কিশোর শোনেনি, কিশোর বলে,

—এত বড় অনিয়মের কাজ করবে, আর বিল পাস করতে হবে। চোরেদের আমি প্রশ্রয় দিই না। সরকারি টাকা এইভাবে অপচয় হতে দোব না।

নটবরও খবরটা পেয়েছে, সে নন্দবাবুকে বলে,—ও যা ভালো বুঝেছে করেছে। এবার আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দিন।

নটবর বেরিয়ে আসে।

মন-মেজাজ ভালো নেই, বাড়িতে এসে চুপচাপই রয়েছে। বাসন্তীও দেখে নটবরকে। সে বলে,

—কদিন থেকেই কেমন চুপচাপ রয়েছ, কী হয়েছে বলো তো। আবার নন্দবাবুদের সঙ্গে কোনও গোলমাল করলে নাকি?

—গোলমালটা আমি করিনি বাসন্তী। গোলমাল শুরু করেছে ওই কিশোর। ও এখন প্রধান না হয়েই নিজেকে প্রধান মনে করছে, ধরাকে সরা দেখছে। আমার এতগুলো টাকা আটকে দিল।

বাসন্তী বলে,

—দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কী করে সব ঠিকঠাক হবে তা জানে না নটবর। বাসন্তী বলে,—ওই নন্দবাবুই দেখবে

যেচে আসবে তোমার কাছে ভোটের আগে। ওকে তুমিই জিতিয়েছ। এবারও জিততে গেলে তোমার কাছেই আসতে হবে।

আজ গ্রামীণ রাজনীতিতে ক্রমশ এই সংকীর্ণতাই জুড়ে বসেছে, আগে গ্রামের জীবনে ছিল আনন্দ। গান-যাত্রাগান-সং-উৎসব এগুলো নিয়েই গ্রামের মানুষ অবসর যাপন করত। কাজের পর তারা গ্রামে বসাত বাউল, মেলার আয়োজনও হত। রাতভর চলত কবিগান। গ্রামবাংলায় অভাব অনটন ছিল ঠিক কথা। তবে ছিল আনন্দ-গান-সুর। কবিগানের আসর বসত রাতভর। বিনয়বাবু এই সামাজিক বিবর্তনের রূপটাকে দেখেছেন। তাই মনে হয়েছে আজ গ্রামবাংলায় চিন্তা মানসকে বিকৃত করেছে ওই রাজনীতি। বিনয়বাবুর মনে হয় দেশের মানুষ গড়ার কাজ না করে দেশ গড়ার কাজ কোনওদিন সুষ্ঠুভাবে করা যাবে না। সেই কাজটা না করেই আজ দেশের সব কিছুর ভার অপ্রস্তুত কিছু মানুষদের হাতে তুলে দেবার ফলেই এইসব সমস্যা দেখা দিয়েছে। যা গ্রামজীবনের পক্ষে যতটা কল্যাণকর হবে ভাবা গিয়েছিল তা হয়নি। মানুষের জীবন থেকে সুখ-শান্তি-সুর-আনন্দ সব মুছে গিয়েছে।

নরেশবাবু অবশ্য সব খবরই রেখেছিলেন। কিশোর এখন সদ্য গজিয়ে ওঠা নেতায় পরিণত হয়েছে। সে এখন নিজে একটা গাড়িও কিনেছে। নতুন গাড়িতে চড়ে ধুলো উড়িয়ে এখন সে যাতায়াত করে। এতদিন নটবরই মোটরবাইক চড়ে ঘুরত। সেই দু-চাকার গাড়িকে পাল্লা দিয়ে এখন চকচকে নতুন গাড়ি চড়ে ঘোরে। নটবরও দেখছে সেটা। তারও মনে হয় এবার কিশোরকে টেক্কা দিতে হবে। সেদিন বাড়িতে রয়েছে নটবর। হঠাৎ নরেশবাবুকে আসতে দেখে একটু অবাক হয়। নরেশবাবুকে ভালো করেই চেনে নটবর।

লোকটা এখনও একটা নড়বড়ে সাইকেলে চাপে। ওর দলেও এখন লোকজন কম নেই। নরেশবাবুও এলাকার বেশ কিছু মানুষকে একত্রিত করেছেন, লোকটা ভালো বক্তা। মানুষের জীবনে এখন সমস্যার পর সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়েছে। হঠাৎ সামাজিক পটভূমিকাই যেন বদলে গেছে। এদিকের শিল্পাঞ্চলেও যে সমৃদ্ধি বাড়বাড়ন্ত ছিল আর তা নেই। তখন দুর্গাপুরে বড়-বড় কয়েকটা কারখানা চালু হয়েছিল। ফলে প্রচুর শ্রমিকও কাজে যেত এখান থেকে। ছোটখাটো বেশ কিছু কলকারখানাও চালু হয়েছিল। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল থেকে শতশত মানুষ গিয়ে সেখানে কাজ পেত। ক্রমশ নানা কারণে সেসব কারখানা রুগ্ণ হয়ে পড়ল। ফলে ধুঁকতে ধুঁকতে তারা বন্ধই হয়ে গেল। ছোট-ছোট কারখানাগুলোর কাজও বন্ধ হয়ে গেল। আর বেকার হয়ে পড়ল হাজার হাজার মানুষ।

গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্য টাকার আমদানিও বন্ধ হয়ে গেল। তারপর বিশ্বায়নের ফলে ছোট কারখানা যা গড়ে উঠেছিল আশপাশে, সেগুলোরও নাভিশ্বাস উঠেছে। তাই গ্রামের রূপটাও বদলে গেছে।

চাষিরাও বিপদে পড়েছে, এখন খরচ-খরচাও বেড়েছে। মাঠে ধান-আলু যা হচ্ছে তার দামও বেশি। কিন্তু বিশ্বায়নের ফলে অন্যদেশ থেকে খোলাবাজারে চাল অনেক কম দামেই মিলছে। সমৃদ্ধ সেইসব দেশের চাষিদের সরকারও একটা বিরাট পরিমাণ টাকা ভরতুকি বাবদ দেয়। ফলে বিদেশেও তারা কম দামে চাল-গম পাঠাতে পারে।

এবার তাই চাষিরাও গভীর সঙ্কটে পড়েছে। সব মিলিয়ে স্বাধীনতার পর দেশের মানুষ যে সুখ-সমৃদ্ধির আশা করেছিল, স্বাধীনতার এতগুলো বছর পর তার মুখও দেখেনি অনেকে, নরেশবাবু সেই বঞ্চিত মানুষদেরই দলে টানছেন। তাদের সংখ্যাও বাড়ছে। ক্রমশ তাই লোকজন বাড়ছে। তারা এই সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে চায়।

নটবরও বুঝেছে এবার তাকে একটা পথই নিতে হবে। দেশের মানুষের বিপদের সময় তাদের কতটা সাহায্য করতে পারবে তা জানে না। কিন্তু নিজের পায়ের তলে মাটি পেতে গেলে এখন তাকেও নতুন কিছু ভাবতে হবে।

বাসন্তী চা নিয়ে আসে। নরেশবাবুই বলেন,

—নটবর তোমার মতো কাজের ছেলে ওই কিশোরবাবুর ওখানে পড়ে থাকবে কেন? তাই ভাবি হে। নিজের তো ভবিষ্যৎ আছে, তোমার ক্ষমতা আছে, বুদ্ধি আছে, দশখানা গাঁয়ের লোক তোমাকে মান্যি করে।

নটবর শুনছে ওর কথাগুলো। নিজেও এসব কথা ভেবেছে। নরেশবাবু বলেন,

—নন্দবাবু এতদিন তোমার ঘাড়ে ভর করে ভোটে জয়ী হয়েছে। এবারে তার ছেলে কিশোরকেও দাঁড় করাচ্ছে, জানে তুমি আছ। তুমি কি চিরকাল ওদের তল্পি বয়েই বেড়াবে?

নটবরও এবার ওদের হয়ে কাজ করবে না ঠিক করেছে, এর মধ্যে সেও বেশ কিছু টাকা করেছে। মন্দিরের সব কিছুই এখন তার হাতে। ওখানের হাটে-বাজারের দোকান মায় হাটের তোলাও ভালোই পাচ্ছে। ভেবেছিল নটবর ওইসব দলটল ছেড়ে দিয়ে এবার বাজারের দিকে একটা দোকান দেবে। কিন্তু আজ নরেশবাবুর কথাগুলো তার মনে একটা নতুন আশার সঞ্চার করে। নটবর বলে,

—কিশোরের জন্য আমি ভোটে খাটছি না নরেশদা।

নরেশ অবশ্য তার কারণটা জানেন। তিনি সব জেনেশুনেই এসেছেন।

নরেশ বলেন,

—তাই তোমার কাছে এসেছি নটবর। তুমি সত্যিকার কিছু কাজ করতে পারবে। তোমার সেই শক্তি, সাহস, বুদ্ধি আছে। তুমি এবার ভোটে দাঁড়াও। নটবর যেন স্বপ্ন দেখছে। সেও এমনি একটা স্বপ্ন দেখেছিল মনে মনে। কিশোরদের ওই নন্দবাবুকে সে মুখের মতোই জবাব দিতে চায় আর সেই জবাব সে দিতে পারবে যদি কিশোরদের সে হারাতে পারে।

আজও নটবরের কোনও বিল তারা পাস করেনি। দেড়-দু লাখ টাকার বিল আটকে রেখেছে। আর নতুন কোনও কাজও দেয়নি নটবরকে। এখন সেখানে কিশোরের নতুন বন্ধুরাই সব কাজ করছে। আর কাজের নামে ফাঁকিবাজি শুরু করেছে তারা। নটবর বলে,

—আমাকেই ভোটে দাঁড়াতে বলছেন নরেশদা?

—হ্যাঁ, তুমি আমার দলে এসো। আমার দলের হয়ে নতুন প্যানেল করেছি আর তুমিই যদি চাও তোমাকে আমরা জয়ী করব। তোমার কথাও ভাবা হবে।

নটবর জানে এসব ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। তাই বলে,

—আপনার কথাও শুনলাম নরেশদা। আমাকে একটু ভাবতে দিন।

নরেশেরও দরকার নটবরকে, নরেশ জানেন নটবরের হিম্মত আছে। তার কিছু বিশ্বস্ত

চ্যালাও আছে যারা ভোটের ব্যাপারে ঠিকঠাক কাজও করতে পারে।

তাই নরেশ নটবরকে বলেন,

—নিশ্চয়ই, যা করবে ভেবেচিন্তেই করবে, এ পথে হুট করে কাউকে কথা দিও না নটবর। রাজনীতি বড় কঠিন কাজ। এখানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। তুমি ভেবে দ্যাখো। তোমার মত পেলে আমি সদরের নেতাদেরও জানিয়ে দেব। তার পর ভোটের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ব।

নটবর বলে,

—অবশ্য সে সব কথা এখন কাউকে বলবেন না নরেশদা। জানেন তো এতদিন একটা দলে ছিলাম। ওরা জানতে পারলে চাপ দেবে।

—না-না, এসব কথা কাকপক্ষীতে টের পাবে না, চলি পরে কথা হবে। তুমি ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি ভাবো।

নরেশবাবু চলে যেতে বাসন্তীও বের হয়ে আসে। বাসন্তী বলে,—নরেশবাবু কীসব বলছিল গো? তুমি নাকি এবার ভোটে দাঁড়াবে। হ্যাঁ গো তুমি কি কিশোরবাবুদের টেক্কা দিতে পারবে? যদি ভোটে জিততে পারো আমি বাবা রত্নেশ্বরকে সোনার চুড়ো গড়িয়ে দেব।

নটবর বলে,

—বাবা রত্নেশ্বরের আর কাজ নেই খেয়েদেয়ে, তোমার সোনার চুড়ো পাবার লোভে আমায় জিতিয়ে দেবেন।

বাসন্তী বলে,

—না গো, বাবা রত্নেশ্বর খুব জাগ্রত দেবতা। উনি দয়া করলে সবই হয়ে যাবে।
নটবর বলে,

—ওসব পরে হবে। এখন এসব কথা পাঁচকান কোরো না।

খবরটা তবু কীভাবে প্রকাশ হয়ে যায়। দেওয়ালেরও কান আছে। না হয় বাসন্তী মন্দিরে যায়। সেইই এখন সেবাইত। তাই মন্দিরে যায়। আর সেখানেই হয়তো বাবা রত্নেশ্বর মহাদেবকে সোনার চূড়া দেবার কথাটা প্রকাশ করেছে। আর সেখান থেকেই খবরটা ছড়িয়েছে।

খবরটা নন্দবাবুর কানে আনে কিশোরই। সে বলে,

—শুনেছ বাবা, তোমার নুটুর কাহিনি।

—কেন সে আবার কী করল। বিল পাস করিসনি, কেস-টেস করেছে নাকি।

কিশোর বলে,

—না-না, তার চেয়েও বড় কাজ করতে চলেছে সে। সে নিজেই এবার ভোটে দাঁড়িয়েছে।

নন্দবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি জানেন নটবরকে। নটবর যে অনেক কিছুই করতে পারে, অনেক অঘটন ঘটাতে পারে। তা নন্দবাবুও দেখেছেন, না হলে এবার নরেশের দলকে হারিয়ে নন্দবাবুর দল জিতত না। নটবরের দলবলই সেই আসল কাজটা করেছিল। নন্দবাবু বলে,

—তাই নাকি, নটবর দাড়াচ্ছে?

—গো-হারা হারবে ব্যাটা। কিশোর বলে,

নন্দবাবু বলে,

—নটবরকে চাই রে। ও না হলে তোর গদি কায়েম হবে না। ওকে থামাতেই হবে।

কিশোর বলে,

—কী বলছ বাবা!

—হ্যাঁ রে! তুই ওকে চটাসনে। ওর বিল সব পাস করে দে, নতুন কাজও কিছু দে। আমিই ওকে বুঝিয়ে বলছি।

নটবর অবশ্য মনে মনে এবার স্বপ্ন দেখে সেইই জয়ী হয়ে এসেছে পঞ্চায়েতে। এখানেই শেষ নয়, ধাপে ধাপে সে আরও উপরে উঠবে।

এখানে এম. এল. এ হবে। আর এর মধ্যে সদরেও সে নরেশবাবুর সঙ্গে গিয়েছে নেতাদের কাছে। তারাও চায় নটবরকে, তারাই বলেছে তুমি আমাদের হয়ে দাঁড়াও। তোমার মতো কাজের লোককে আমরা পঞ্চায়েতেই আটকে রাখব না হে। আরও উপরেই তুলে দোব।

নটবরও এবার প্রকাশ্যে নরেশের দলে যাবার কথাই ঘোষণা করে। তার পর শুরু হবে তাদের ভোটের প্রচার। নটবরের চ্যালারাও এখন ব্যাপারটা জেনেছে। পচা বলে,

—গুরু তাই করো, ওই ব্যাটা কিশোরবাবুর প্রচার তো শুরু হয়ে গেছে। ওদের সব প্রচারকেই দোব একেবারে কেঁচিয়ে। সারা এলাকার মানুষও এবার খেপে আছে।

নটবর বলে,

—শুভদিন দেখেই এবার কাজে নেমে পড়ব।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামে, নটবর সদর থেকে ঘুরে এসে বাড়িতে সবে হাতমুখে ধুয়ে চা-মুড়ি নিয়ে বসেছে। হঠাৎ এমন সময় টর্চের আলোর আভাস জাগে। দু-তিনজন লোক এসেছে তার বাড়িতে। আর তাদের দেখে নটবর-ও অবাক হয়।

—আসুন, আসুন, কাকাবাবু। হঠাৎ গরিবের বাড়িতে!

নটবর বেশ খুশিই হয়েছে। একটা প্যাঁচ দিতেই এতদিনের জ্যাম হয়ে থাকা বাঁধন খুলেছে।

নন্দবাবু বলেন,

—নুটু কদিন বাড়িতে যাসনি, অফিসেও দেখা নেই। তাই ভাবলাম কী হল, শরীর-টরির খারাপ নাকি, তাই খবর নিতে এলাম।

—না-না। ওই মন্দিরের কাজ, বাড়ির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ভাবছি বাজারে একটা দোকান দেব। একটা কিছু করতে হবে তো। তাই সদরে মহাজনের কাছে গেছলাম।

নন্দবাবু বলেন,

—তা ভালো। বাজারে দোকান করছিস কর, ওদিকে ভোট এসে গেল। ওদিকের কাজকর্ম তো সব তোকেই দেখতে হবে। এবার ভাবছি কিশোরকে দাঁড় করাব। তোর বন্ধু, তুই তো ওর পাশে থাকবি। ওই নরেশের দল এবারও যেন.পা ফেলতে জায়গা না পায়। তাই করতে হবে।

নটবর চুপ করে থাকে। নন্দবাবু বলেন,

—হ্যাঁ তোর বিলগুলো পাস হয়ে পড়ে আছে। দোকান করতে গেলে তো টাকা লাগবে। ওগুলো কালই তুলে নে। আমি টাকার ব্যবস্থা করে রেখেছি।

নটবর বুঝতে পারে নন্দবাবু নিজের গরজে তার টাকা ঘরে পৌছে দিতেও প্রস্তুত—

নটবর বলে,

—কালই যাব কাকাবাবু, আপনি নিজে কষ্ট করে কেন এলেন? খবর দিলে আমিই যেতাম।

এর মধ্যে বাসন্তীও ওদের জন্য মন্দিরেব সংগৃহীত কিছু সন্দেশ-পেঁড়া এনে দেয়। খাবার জলও এনেছে।

নন্দবাবুকে প্রণাম করে সে বলে,

—বাবা রত্নেশ্বরের প্রসাদ।

নন্দবাবুও ভক্তিভরে প্রণাম করে বলে,

—আজ উঠি মা, চলি নুটু। তাহলে কাল আসছিস অফিসে। আমিও থাকব।

ওরা চলে যেতেই বাসন্তী বলে,

—নন্দবাবু কেন এসেছিল গো?

—নিজের পিঠ বাঁচাতে।

—পিঠ বাঁচাতে। কী বলছ? ওই নন্দবাবুকে কে কী করবে এই মুলুকে? এত বড় লোক, গাড়ি-বাড়ি। অঞ্চলের প্রধান।

নটবর বলে,

—ওসবই তো পেয়ে গেছে কৌশলে, কতদিন থাকে দ্যাখো. একা ওই কি রাজা হয়ে থাকবে?

বাসন্তী এ সমস্ত কথাব অর্থ বোঝে না। শুধু শুধোয়,

—তা হ্যাঁগো—অমন বড় মোটরগাড়ির দাম কত?

নটবর দেখছে বাসন্তীকে। এবার নটববও ভাবছে। স্বপ্ন দেখছে সে অমনি গাড়ি কিনেছে। অমনি গদিতে বসে হাওয়ায় ছুটে যাবে।

পরদিনই নটবর গেছে নন্দবাবুর অফিসে। এখন নন্দবাবু বুঝেছে কিশোরকে এসব দায়িত্ব দিয়ে তিনি ঠিক কাজ করেননি। কিশোর তার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে বেশ কিছু টাকা বেআইনি ভাবে খরচ করেছে। হিসাবপত্রও ঠিকমতো নেই। পরের মেম্বাররা যদি এসব কাগজপত্র দেখে নন্দবাবুর বিপদ হবে। এইসব কেলেঙ্কারি চাপা দেবার জন্য তাঁকে এবার জয়ী হতেই হবে। তাই তিনিও আবার নতুন করে জনসংযোগ বাড়াতে শুরু করেছেন।

নটবরকে আসতে দেখে নন্দবাবু খুশিই হন,

—আয় নুটু। ওহে ভূধর—

ভূধর অফিসের কেরানি। ভূধরবাবুও হাজির নন্দবাবুর ডাকে। নন্দবাবু বলে,

—ভূধর নুটুর ওই বিলগুলো ক্যাশ করে দাও। চেক আমি রেডি করে দিচ্ছি।

ভূধরই নিজে বের হয়ে গিয়ে অন্যঘর থেকে বিলগুলো এনে দেয়। নটবর সই-সাবুদ করে চেকগুলো নিয়েছে। এবার নন্দবাবু বলেন,

—তা হলে আজ সন্ধ্যায় বাড়িতে আয় নুটু। কিশোরও থাকবে, সদর থেকে দু-

তিনজন নেতাও আসবে। নির্বাচনের জন্য আমাদের তৈরি হতে হবে। এবার ফিরে এলে তোদের গ্রাম থেকে স্কুল অবধি রাস্তাটাও পাকা করে দোব। আর ইন্দিরা আবাস যোজনায় স্বনির্ভর প্রকল্পের কাজের দায়িত্ব তুই-ই নিবি। এলাকার ভোলই বদলে দোব। সবাই জানবে নন্দীপুর পঞ্চায়েত কাজ করতে জানে।

নটবর এখান থেকে সোজা ব্যাংকে যাবে। তার প্রধান কাজ এতগুলো টাকার চেক ক্যাশ করে তার নিজের অ্যাকাউন্টে ঢোকানো। তাই বলে,

—চলি কাকাবাবু, পরে দেখা হবে।

নন্দবাবু এবার নিশ্চিন্ত হন। তিনি নটবরকে খুশি করে দিয়েছেন ওই সরকারি টাকা দিয়ে। বরং কিশোরের বুদ্ধির প্রশংসাই করেন তিনি। সে-ই কায়দা করে এই টাকা আটকে রেখেছিল।

নরেশবাবুর লোকও রয়েছে এই অফিসেই। তারাও খবর রাখে যে নন্দবাবু এবারও নটবরকে হাতে এনেছে। না হলে শেষমুহূর্তে ডেকে এনে এতগুলো টাকা দিত না। নরেশবাবুও তাদের কাছে খবরটা শুনে অবাক হন। বলেন,

—সে কী। নটবরকে হাতে এনেছিলাম। ওকে পেলে এবার ভোটে সিওর মেজরিটি পেতাম। তা নয় টাকা দিয়ে নুটুকে কিনে নিল নন্দবাবুরা!

নটবর অবশ্য তার সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে। নটবরও জানে নন্দবাবুর দলে থাকার দরকার আর তার নেই। এখানে থাকলে তার ভাগ্যে কোনওদিনই গদি জুটবে না। তাকে জীবনভর কিশোর আর নন্দবাবুদের তাঁবেদারি করেই কাটাতে হবে। তাই এবার সে নিজের পথই করে নেবে। আর নরেশবাবু তাকে সেই পথের সন্ধানও দিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যার পর তাই নটবর আজ মন্দিরে গিয়ে বাবা রত্নেশ্বর মহাদেবের চরণে গড়াগড়ি দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। তার যাত্রা শুরু করে। তার গন্তব্যস্থল ওই নরেশদার বাড়ি কাম অফিস। নরেশবাবু তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ওই কথাই আলোচনা করছেন, নটবরকে ঢুকতে দেখে চাইলেন নরেশবাবু।

নটবর আজ তৈরি হয়েই এসেছে। সে বলে,

—এলাম নরেশদা। বাবা রত্নেশ্বরকে প্রণাম করে চলে এলাম। আর ওই নন্দবাবুর ওখানে যাচ্ছি না। এখন থেকে আপনার দলের হয়েই কাজ করব। এবার ভোটেও লড়ব। আর হারাবই ওই নন্দবাবু, কিশোরদের।

নরেশবাবু ওর কথায় খুশি হন।

নরেশবাবুও এবার নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। নটবরকে হাতে পেয়েছেন। তাঁরও ভরসা বেড়ে গেছে।

পরদিনই নরেশবাবুরা হাটতলায় মিটিং ডেকেছেন। নরেশবাবুর ওই মিটিং-এ হাটতলার মাঠ ভরে গেছে। বেশ কিছু গ্রামের মানুষজনও এসেছে। তারা এতদিন ধরে নন্দবাবু, কিশোরদের অনেক অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার সহ্য করেছে নীরবে। তাদের আবেদন নিবেদনেও কোনও কাজ হয়নি। কিশোরবাবু তাদের জন্য পথঘাট-স্বাস্থ্য এসবের দিকে নজর দেয়নি। তারা সরকারের সর্বপ্রকার দাক্ষিণ্য থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

তাই যেন প্রতিবাদ জানাতেই ওরা এসেছে। সেই মিটিং-এ মঞ্চে দেখা যায় শহরের নেতাদের সঙ্গে নরেশবাবুর পাশে বসে আছে নটবর। নন্দবাবুরা প্রথমে এই মিটিংকে

ততটা গুরুত্বই দেয়নি। ওরা জানে নরেশবাবুর সব চেষ্টাকে তারা শেষ পর্যন্ত বানচাল করে দেবে। আর তাদের দলে নটবর আবার এসেছে, কিশোরও জানে বাবার সঙ্গে তার কথাও হয়ে গেছে। তাই তারাও নিশ্চিন্ত। কিশোর তার দলবল নিয়ে নিজের ঘরে বসে আগামী পুজোয় কী নাটক হবে তারই আলোচনা করছিল।

হঠাৎ কিশোরের দলের নসু সাইকেলটা কোনওমতে বাইরে রেখে এসে ঘরে ঢোকে।

—দা-দা, দারুণ কাণ্ড হয়ে গে-গ-গ।

নসু একেই তোতলা। তবু সে গলা তুলে স্লোগান দিতে পারে। কিন্তু একটু উত্তেজিত হলেই বিপদ। একটা আঘাতেই তখন তার গলায় বাজতে থাকে। ফাটা রেকর্ডে পিন আটকে গেলে যেমনটা হয় আর কি। রাঘব বলে—গোঁ-গোঁ করছিস কেন? কী হয়েছে বলবি তো?

ততক্ষণে নসুও তার জিভটাকে খানিকটা মুক্ত করে বলে,

—হাটতলায় ন-নরেশের মিটিং—

কিশোর বলে,

—করতে দে ওদের মিটিং।

নসু বলে,

—সেখানে কে কে আছে জানো? ওই ন-নটবর এসটেজে গলায় মালা দিয়ে বসে আছে।

—অ্যাঁ, কী বললি? নটবর ওদের এসটেজে গলায় মালা দিয়ে বসে আছে? ঠিক দেখেছিস?

—তাই দেখেই তো ছুটে আসছি, তুমিও চলো দেখবে।

এবার সত্যিই বিপদে পড়ে কিশোর। এমন কাণ্ড ঘটাবে নটবর, সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কালই তাকে এতগুলো টাকা যা আটকে রেখেছিল, দিয়ে দিয়েছে। আর নটবর সেসব চুপচাপ নিয়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়েছে।

কিশোর গর্জে ওঠে,

—শালা বেইমান। গদ্দার। পটলা তোরা যা। দ্যাখগে কী ব্যাপার। আমি বাবাকে খবরটা দিই গে।

নন্দবাবু সব শুনে চমকে ওঠে,

—বলিস কী রে কিশোর। নটবর শেষে এইভাবে পিছন থেকে ছুরি মারল।

কিশোর বলে,

—ওকে আমিও ছাড়ব না বাবা।

নটবর অবশ্য এসব কাজ জেনেশুনে, হিসাব করেই করেছে। সেদিনের মিটিং-এ নটবরকে তাদের দলে পেয়ে নরেশবাবুও তেজস্বী ভাষায় এবার সমাজের বুক থেকে সব অন্যায়-অত্যাচারকে দূর করে দেবার ঘোষণা করেন। আগে ওদের মিটিং-এ প্রায়ই গোলমাল হত। দু-একবার বোমাবাজিও হয়েছিল, আর সে সব গোলমাল, বোমাবাজি করত নটবরের দল। এই ভাবেই নটবর নরেশবাবুদের মিটিং বানচাল করত।

ভোটের আগে থেকেই নটবরের দল নরেশের দলের লোকেদের পথে-ঘাটে ছুতোয়-নাতায় শাসাত। মিছিলেও বাধা দিত। আজ তারাই এখন নরেশের দলে। নটবর তার

পাশে বসে আছে সুবোধ বালকের মতো। আর তার সেই বোমারু বাহিনীও এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে মিটিং-এ শান্তিরক্ষার কাজ করছে।

তারা নন্দবাবুর দলের দু-দশ জন লড়াকু কর্মী যারা আছে তাদের চেনে। তাই ওরা সাবধান হয়ে আছে। আর বিনা বাধায় আজ নরেশবাবু, তারস্বরে ভাষণ দিয়ে চলেছে। এর মধ্যে অবশ্য নন্দবাবুর ক্যাম্পে সঠিক খবরই আসে।

নটবর শুধু ওদের দলেই যোগ দেয়নি, সে ভোটেও দাঁড়িয়েছে। নরেশবাবু সেই ঘোষণাও করেছে। কিশোর গর্জে ওঠে,

—শালা বেইমান। ফটকে, ওটাকে ঠিকানা লাগিয়ে দে।

কিশোরও চায় ওই বেইমান নটবরকে সাফ করে দিতে নটবর তাদের গদি ধরে টান দিয়েছে। নন্দবাবু বিচক্ষণ ব্যক্তি, তিনি বলেন,—ওসব কথা বলিস না কিশোর। দেওয়ালেরও কান আছে। ওসব কথা ভাবিস না। তার চেয়ে এবার নিজেরাই তৈরি হয়ে এখন থেকে প্রচারে নাম। নতুন ছেলেদের দলে যত পারিস নিয়ে আয়। মানুষের কাছে যা আর টাকাও খরচ কর। ওই দিয়েই বাজিমাত করতে হবে।

এবার ভোটের বাদ্যি বেজে ওঠে গ্রামে। নটবরের সময় নেই। বাড়িতেও বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। ওদিকে বাসন্তীও মা হতে চলেছে। বাসন্তীর মা-ই এখন এ বাড়িতে রয়েছে। অবশ্য এনিয়ে নটবরের মা-বাবা প্রথমে কিছুটা আপত্তি করেছিল। নটবরের বাবার অবস্থা কিছুটা বদলেছে। নটবর একাই নিজের ভাগ্য গড়ার জন্য লড়াই করেছে। নিজের অবস্থাও বদলেছে সে নিজের চেষ্টায়। সেই সঙ্গে তার ভাইদেরও হাল বদলেছে। ওর ভাইরা মন্দিরে, বাজারে দোকান দিয়ে ভালোই রোজগার করছে। নিতু ভটচাযও এখন মন্দিরের পূজারি। বাসন্তীর বাবা ভবতারণ চক্রবর্তী বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর মারা গিয়েছেন।

আর তাঁর মৃত্যুর পর সবকিছুর মালিক এখন আইনত বাসন্তী। অবশ্য বাসন্তীর বড়দি আর জামাইবাবুও বাবার মৃত্যুর পর সব কিছুর ভাগ নিতে এসেছিল। মন্দিরের অংশও চেয়েছিল। নটবর বাসন্তীর বড়দি আর জামাইবাবুকে বলে, মন্দিরের অংশ নিতে গেলে এখানে থেকে সেবাপূজা করতে হবে, আর শাশুড়ি ঠাকরুনের ভরণপোষণের ভারও নিতে হবে। তা হলে এখানে ছ-মাস করে থাকুন।

ভদ্রলোক কোর্টের পেশকার। তাঁর টাকাকড়ি আমদানিও কম নয়। সে সব ছেড়ে সামান্য দক্ষিণার প্রণামির জন্য পড়ে থাকা তাঁর সম্ভব নয়। তাই পিছিয়ে যান। নটবরের পিতৃদেবও নিশ্চিন্ত হয়। এইসব কিছু তার হাতেই এসেছে। তাই নিতু ভটচায আর বেশি মাথা ঘামায়নি। নটবরও বাসন্তীর মাকে এনে বাসন্তীর কাছেই রেখেছে। সংসারে তবু একজন গিন্নি মানুষ থাকলে নিশ্চিন্ত থাকবে নটবর।

নটবরের সন্তানও এখন দিদার স্নেহে মানুষ হচ্ছে। আর নটবর এখন এলাকার অন্যতম নায়ক রূপে বিরাজমান। বেশ কিছুদিন ধরে সারা এলাকার হাওয়া গরম হয়ে উঠল ভোটের প্রচারে। হাটে-মাঠে ওঠে মাইকের শব্দ। নন্দবাবু বুঝেছে এ তার বাঁচা-মরার সংগ্রাম। কিশোর বাহিনীও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদিকে নরেশ-নটবর বাহিনীও বসে নেই। ওরা এর মধ্যে ঘরে ঘরে গিয়ে ভোটের আবেদন জানাচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে নরেশের সেই চ্যালার দল। সোজা কথায় কাজ না হলে তারা অন্য পথই নেবে।

নন্দবাবুর টাকার অভাব নেই। কয়েকটা জায়গাতে তাঁর দলের ছেলেদের জন্য ঢালাও লুচি, আলুর দম, আর বোঁদের ব্যবস্থাও রয়েছে।

কিশোরের দলেও বেশ কিছু ছেলে জুটেছে। ওর বন্ধুরাও রয়েছে। তবে দু-একজন এর মধ্যে গোপনে নটবরদার সঙ্গেও যোগাযোগ রাখছে। তারাই নন্দবাবুর ভোটের প্ল্যানিং-এর খবর দেয়। আর নটবরও তার দলে সেই সম্বন্ধে সজাগ করে রাখে। নটবর এর আগে নন্দবাবুর ভোটের সময় ভুয়োভোট দেবার জন্য বাইরে থেকে বেশ কিছু ছেলেমেয়েদের এনে জোগাড় করত। তারাই ভোটের দিন ঘুরেফিরে ভোট দিত।

নটবর এবার ভোটের আগের রাতে নন্দবাবুর ক্যাম্প থেকে বেশ কয়েকটা ছেলে মেয়েকে হটিয়ে দেয়। অবশ্য তার জন্য বেশ কিছু বোমাবাজিও করতে হয়। সেই বোমার ভয়ে নিরীহ মানুষগুলোও সেই রাতেই পালিয়ে যায়। তাদের অনেককে নটবরই এনে রাখে ক্যাম্পে। নন্দ-কিশোররাও বুঝেছে বিপদের গুরুত্ব। তাদের সব চেষ্টাই এভাবে বানচাল করে দিয়েছে নটবর। নরেশবাবুও জানেন নটবরকে দিয়ে সে দলকে জেতাতে পারবেই। এতদিন পর নরেশের স্বপ্ন সফল হবে।

ভোটের দিন দেখা গেল নটবরের আসল খেলা। ওদিকে ভোটের লাইন আর নড়ে না। ভোটের বুথ জ্যাম। নন্দবাবুর এজেন্টকে কে এসে টেনে তোলে। হরিহর এতদিন ধরে নন্দবাবুর দলের হয়েই কাজ করেছে, ওর ধান-চালের আড়তে সে ওজনদারি করে। অবশ্য সেখানেও ভালো রকম বাণিজ্য চলে, কেনার সময় একরকম বাটখারা ব্যবহার করে যার ভিতরে সীসা ভরে ওজন খানিকটা বাড়ানো। আর বিক্রি করার সময় অন্য সেট বাটখারা ব্যবহার করা হয় যার খানিকটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। ওজন বেশ কিছুটা কমানো হয়েছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। তাই ভোটের এজেন্টদের কাজটা এতকাল সে ঠিকঠাকই করেছে। তার দলের ভুয়ো ভোটারদের সে চ্যালেঞ্জ করে না। বরং অন্যপথের জেনুইন ভোটারদেরই সে চ্যালেঞ্জ করে—ভোটদানের কাজে বাধা দেয়।

এবার তা হতে দেয় না। নটবরের চ্যালা ওকে তুলে দিয়ে বলে,

—বাঁচতে চাস তো বের হয়ে যা। না হলে হরিদর্শন করিয়ে দোব।

—হরিহর এতদিন ধরে এই কাজ করেছে, তাই বাধা পেয়ে সেও রুখে ওঠে—

—মানে।

দু-তিনজন হরিহরকে ঠেলে বের করে দেয়। হরি প্রিসাইডিং অফিসারকেও জানাতে চায় কথাটা। কিন্তু প্রিসাইডিং অফিসারও অসহায়। ওঁর পাশে একজন দাঁড়িয়ে আছে। তিনি দেখছেন তার কোমরে পিস্তলের বাঁটটা। তাই তাঁরও করার কিছু নেই। আর বিশেষ কারণে কর্তব্যরত পুলিশও তখন নেই।

নটবর বলে,

—ভোট হতে দিন স্যার। কইরে—

ওদের দলের ছেলেরা তখন যা করার করতে শুরু করেছে। বাইরে জনতা তখনও ভোটের জন্য প্রতীক্ষা করছে ওই রোদে। তখন তাদের ভোটদান পর্ব শেষ হয়ে যায়।

নটবর এখানের অপারেশন সেরে মোটরবাইক নিয়ে বের হয়ে যায় অন্য বুথে। নন্দবাবু কিশোররা গাড়ি নিয়ে ঘুরছেন বুথে বুথে। সর্বত্রই একই অভিযোগ। নরেশবাবুও

নটবরের এলেম দেখে অবাক হন। তিনিও এতদিন ভোট-এ অংশ নিয়েছেন। কিছু ভোটও টেনেছেন। কিন্তু তাঁর দলের মাত্র দু-তিনজন নির্বাচিত হতে পেরেছে। বেশি সিট দখল করে এসেছে নন্দবাবুরাই। আর তারাই দখল করেছে সবকিছু। এবার ছবিটাই বদলে গিয়েছে। অন্যবার ভোটে নাজেহাল হয়ে নরেশবাবুরাই অভিযোগ করেছেন। এবার সেই অভিযোগ তোলে নন্দবাবুরা। ভোটের ফলও বের হয়েছে। সন্ধ্যার আগেই ফল বের হয়ে যায়। এগারো জন সদস্যদের মধ্যে নরেশবাবুর দলের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে নয়জন। আর ওদিকে জিতেছে নন্দবাবু আর তার দলের মাত্র একজন।

নন্দবাবু এবার এতদিন পর বুঝেছেন যে নটবরই এবার এখানে মাথা তুলবে। নরেশবাবুও খুশি হয়েছেন। তাঁর এতদিনের চেষ্টা এবার সফল হয়েছে, তাঁর দলের সভ্যসংখ্যাই বেশি। নটবর এসেছে এবার প্রথম। আর এসেই সে বাজিমাত করেছে। নরেশবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা তিনিই হবেন অঞ্চলপ্রধান। দুর্গাপুর ছেড়ে আসার পর আর তেমন কোনও কৃতিত্ব তিনি পাননি। এবার তেমন একটা সুযোগই এসেছে।

নটবর জানে নরেশবাবুই ওই গদির দিকে হাত বাড়াবেন। আর নরেশবাবুই দলের এখানের প্রধান। সদরেও তাঁর অনেক হাত রয়েছে। নটবরও বুঝেছে আগে সেই ঘুঁটিগুলোকে হাতে আনতে হবে। তারপর নরেশবাবুর পিছনে লাগতে হবে। হঠাৎ জোর করে নরেশবাবুকে হটিয়ে সে গদিতে বসতে পারে, সেই ক্ষমতা তার আছে। কিন্তু ওইভাবে বসলে সেই বসাটা নিয়ে অনেক সমালোচনা হবে, হয়তো উপরের নেতাদের চাপে তাকে সরে আসতে হবে। না হলেও নরেশবাবুর মতো কৌশলী লোক নটবরকে বিপদেই ফেলবে। আর নন্দবাবুরাও এখন তার শত্রু। তাই নটবরকে বুঝেসুঝে চলতে হবে।

নরেশবাবুই এবার নিজেদের সভ্যদের মিটিং ডাকেন। সেইখানেই স্থির হবে পঞ্চায়েতের কমিটি কীভাবে গঠিত হবে। অবশ্য নরেশও এর মধ্যে তার বশংবদ কয়েকজনকে ফিট করে রেখেছেন। তারাই নরেশের নাম তুলবে প্রধান হিসেবে। তাঁর ভয় আছে নটবরই যদি সেই পদের দাবিদার হয় তা হলে অসুবিধাই হবে। কিন্তু নরেশবাবুই অবাক হন।

মিটিং শুরু হবার পর নটবরই উঠে বলে,

—এবার পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে আমি নরেশদার নামই প্রস্তাব করছি। উনিই আমাদের নেতা। তাই ওঁকেই নেতৃত্ব দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

নরেশের দলবল নটবরের ওই প্রস্তাবে সমর্থন করে।

নন্দীপুরের জীবনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। নরেশবাবুই এখন নতুন করে গদিতে বসেছেন। নটবর তাঁর একজন সভ্যমাত্র। অবশ্য নরেশবাবু তাকেই সহকারী প্রধান করেছে। কিন্তু নটবর এই ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ দেখায় না, সে এখন বাজারে নতুন দোকান করেছে। সেই ব্যবসাপত্র নিয়েই ব্যস্ত।

বাসন্তী অবশ্য আশা করেছিল নটবরই প্রধান হবে। সেও পাঁচজনকে বলতে পারবে যে সেও কেউকেটা নয়। তার বাবা ছিলেন মন্দিরের পূজারি। কিন্তু সামান্য পূজারির মেয়ে সে নয়। সেই এখন প্রধানের গিন্নি। মেয়েমহলে বাসন্তী অবশ্য কথাটা আগেই প্রচার করেছিল। পাড়ার বউ—গিন্নিরাও অনুভব করেছিল যে এবার বাসন্তীই হবে প্রধান গিন্নি। কিন্তু বাসন্তীও নটবরের ব্যাপার দেখে রীতিমতো হতাশই হয়েছে।

সেই বলে নটবরকে,

—একী করলে তুমি। এত খেটে, এত জান-প্রাণ লড়িয়ে ভোটে জিতলে আর গদি পেল ওই নরেশবাবু। আমি কত বড় মুখ করে সকলকে বলেছিলাম তুমিই গদিতে বসবে। মেয়েমহলে আমারও মান খাতির বাড়ত।

নটবর বলে,

—একেবারে ঠেলে উঠলে পিছলে পড়তে হয় গো। যা করতে হয় রয়ে সয়ে করতে হবে। একটু সবুর করো।

বাসন্তী এমন সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে খুশি হয়নি।

বাসন্তীর ছেলে ভবেশ এখন স্কুলে পড়ছে। কিন্তু নটবরের স্বপ্ন অনেক। সে এই গ্রামের ধানমাঠের স্কুলে তার ছেলেকে পড়াতে চায় না। এর মধ্যে তার ব্যবসারও উন্নতি হয়েছে।

এখন সে নন্দবাবুর আড়তের পাশেই তার আড়ত করেছে। সেই সঙ্গে সার-সিমেন্ট-লোহা এসবের এজেন্সি নিয়ে আড়ত করেছে। আর নরেশেরও সহযোগিতা পাচ্ছে সে। এখন নটবর তার ছেলেকে তাই শহরের বোর্ডিং-এ রেখেই পড়াতে চায়।

অবশ্য বাসন্তী প্রথমে আপত্তি তোলে,

—সেকি গো, একটা মাত্র ছেলে সেও ঘর ছাড়া হয়ে থাকবে?

কিন্তু নটবর বলে,

—ওকে আমি ডাক্তার বানাব। আমাদের ছেলে হবে এ-অঞ্চলের একমাত্র জুয়েল। তাই ওকে শহরের নামী স্কুলের হোস্টেলে রেখেই পড়াব।

নটবর এখন নরেশের সহকারী। অবশ্য নরেশবাবুও জানেন কী করে কাজ হাসিল করতে হয়। তিনি নিজেই এখন বেনামীতে বেশ কিছু কনট্রাক্টরিও শুরু করেছেন। নটবর ভেবেছিল ওইসব কাজ সেইই পাবে। ক্রমশ নটবর দেখে নরেশবাবুই সে সব কাজ তাঁরই চেনা দু'একজনকে দিয়ে শুরু করিয়েছেন। আর নটবরের জন্য যা থাকে তা সামান্যই। নটবর তবু চুপচাপই থাকে। সে এখন এলাকায় নিজেই ঘোরে গ্রামে গ্রামে। নিজেই বহুগ্রামের মহিলাদের নিয়ে নানা প্রকল্পের কাজে নামিয়েছে। তার জন্য টাকাও দিয়েছে। নরেশ চায় তার নিজের দলের লোকেদের জন্য কাজ করতে। গৃহনির্মাণ প্রকল্পের কিছু টাকা নরেশ তার দলের লোকেদের মধ্যে বিলি করতে চায়।

নটবর জানে কীভাবে তার জনপ্রিয়তা বাড়ানো যায়। সে এখন ওই কাজটাই করে চলেছে। সেই বলে নরেশকে,

—নরেশদা, এসব কাজের জন্য নিরপেক্ষ হতে হবে, যোগ্য লোকেদেরই টাকা দেব। না হলে গ্রামসভার মিটিং-এ অনেক কথাই উঠবে। কিশোরবাবু, নন্দবাবুরা যে ভুল করেছেন তা করবেন না। সামনের ভোটে তখন সামলানো যাবে না। ওই নন্দবাবু কিশোরের দলও তৈরি হয়ে আছে।

বাধ্য হয়েই নরেশবাবুকে কিছুটা মাথা নিচু করতে হয়। নটবরই বিভিন্ন গ্রামের যোগ্য প্রার্থীদের জন্য গৃহনির্মাণ কাজে টাকা দেয়। তবে তার এই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাকে এবার নরেশবাবুও অন্য চোখে দেখছেন। নরেশবাবুর মনে হয় তিনি নিজে ওই নটবরকে এনে পঞ্চায়েত দখল করে গদি পেলেও জনপ্রিয়তায় নটবর তাঁকে ছাপিয়ে যাচ্ছে। নটবর

ব্যবসার কাজে প্রায়ই সদরে যায়। সেই সময় সে সদরের নেতাদের সঙ্গেও দেখা করে। তাঁরাও নটবরকে বেশি করে বিশ্বাস করেন।

এখন নরেশবাবুরও তাই মনে হচ্ছে যেন নটবর একদিন তাঁকে চরম ঘা দিতে পারে। নরেশ যে খাল কেটে কুমির এনেছে সে একদিন তাঁকেই গ্রাস করবে।

একটা মধুভাণ্ডারকে কেন্দ্র করে যে বেশ কিছু মানুষের মধ্যে টানাপোড়েন চলছে এসব খবর নন্দীপুরের সাধারণ মানুষ অবশ্য রাখার প্রয়োজনও বোধ করে না। দিন চলে তার নিজের ছন্দে।

সতীশ চাটুজ্যে এই গ্রামের পুরোনো বাসিন্দাদের অন্যতম। শীর্ণ প্যাকাটির মতো লম্বা টিকটিকে চেহারা। মাথায় একটা টিকি, তাতে একটা বিবর্ণ টগর ফুলের টুকরো। বগলে ছাতা অবশ্য তাতে কয়েকটা তালি। শীর্ণ চেহারাটায় চোখদুটো বেশ বড়—আর সদা ঘূর্ণায়মান। নাকটাও খাঁড়ার মতো তীক্ষ্ণ। সতীশের পেশা একটা নয়—অবশ্য একটা পেশাতে তার সংসার চলে না। সে সংসারে জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধিও মানেনি। ফলে ঘরে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে সন্তান-সন্ততি বেশ কয়েকজন। বড় মেয়ে পিয়ালী স্কুলে পড়ে। অন্য কটা ছেলেমেয়ে অবশ্য কেউ স্কুলে যায়—কেউ এর বাগানে তার গাছে কোথায় ফলপাকুড় কী আছে তারই সন্ধানে ব্যস্ত।

সতীশ চাটুজ্যে গ্রামের এখানে-ওখানে ছড়ানো কয়েকটা শিবমন্দিরের পূজারিও। ওইসব মন্দিরের মালিকেরা গ্রামে থাকে না। বসত বাড়িটা তালাবন্ধ থাকে। তারা বাইরের লোক। ওইসব মন্দিরের দেবদেবীর পুজোর ভার সতীশ চাটুজ্যের উপর। সতীশ চাটুজ্যে সকালে উঠে স্নান সেরে একটা ডালায় পোয়াখানেক আতপ চাল আর ফুল-বেলপাতা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে সেইসব আপাত বেওয়ারিশ দেবদেবীর উদ্দেশে আতপচাল আর ফুল ছিটিয়ে পুজো সেরে এবার গ্রামের যজমানের বাড়িতে পুজোয় যায়।

নন্দবাবুর বাড়িরও পুরোহিত সে. আগে সতীশ চাটুজ্যেদের বেশ মান খাতির ছিল নন্দবাবুর বাড়িতে। সতীশ চাটুজ্যে প্রতিবারই ভোটের আগে নন্দবাবুর বাড়িতে মহাসমারোহে যজ্ঞ শান্তি স্বস্ত্যয়নও করেছে। সওয়া পাঁচ সের করে ঘি পুড়ল হোমে। বিশ্বজয়ী যজ্ঞের টিপ পরিয়ে দিত নন্দবাবুর কপালে। কিন্তু এবার তাতেও কোনও কাজ নেই।

নন্দবাবু ভেঙে পড়েছেন। এখন তাঁর নাকি শনির দশা চলছে। শনিগ্রহের তুষ্টিযজ্ঞের বিধান দেয় সতীশ। আর ফর্দও দিয়েছে বেশ গজখানেক লম্বা ফর্দ।

নন্দবাবু বলে,

—এতে কিছু কাজ হবে চাটুজ্যে? সেবার তো বিশ্বজয়ী যজ্ঞ করলে এত ঘটা করে। বিশ্বজয় করা তো দূরের কথা, পঞ্চায়েত জয়ই করতে পারলাম না।

সতীশ চাটুজ্যে এ ব্যাপারে খুবই পারদর্শী। বলেন,

—আজ্ঞে শনি মহারাজই যত গোল বাধালেন। ওঁকে খুশি করতে হবে। ব্যস্, দেখবেন তারপর কী হয়!

নন্দ বলে,—ভেবে দেখি।

—তাই দেখুন। তবে কাজটা করতে পারলে হাতে হাতে ফল পাবেন।

সতীশ সকলকে এরকম বিধানই দেয়। তার দিন চলার দরকার। গ্রামের শেষ প্রান্তে গাছগাছালিতে ঘেরা তার বাড়ি, ওদিকে তরু ঘোষের বাড়ি। তারাপদ ঘোষের বাজারে বড় মুদিখানার দোকান। জমিজায়গাও কম নেই। তরু ঘোষের সচ্ছল অবস্থা। তার দেহে মেদের পরিমাণও বেশি।

তারাপদ ঘোষ দোকানে বের হবে, এদিকে তার সাবেকি আমলের খড়ের চালের বাড়ির পাশেই এখন নতুন দোতলা বাড়ি বানিয়েছে, সামনে দু-তিনটে ধানের মরাই। ওর বাড়িটা গ্রামের একদিকে। তারপরই বাঁশবন, একটা মজা পুকুর, তার ওদিকে শুরু হয়েছে ধানজমি।

ওই বাঁশবনে কে একটা মরা গোরু ফেলে রেখে গেছে। এককালে ওদিকে ভাগাড়ই ছিল। এখন তারাপদ গ্রামের লোকেদের ধমক-ধামক দিয়ে মরা গোরু-বাছুর এদিকে ফেলতে দেয় না। কিন্তু কেউ রাতের অন্ধকারে ওই কাজটি করে গেছে। ফলে মরা গোরুর সন্ধান পেয়ে বেশ কয়েকটা শকুনও এসে জুটেছে। দু-চারটে কুকুরও চিৎকার করতে করতে সেখানে জুটেছে।

এর মধ্যে একটা শকুন উড়ে এসে ওই তারাপদর খড়ের ছাউনি দেওয়া গোয়ালের চালে বসে দম নিচ্ছে, আর ঠিক এ সময়ই সতীশ চাটুজ্যে এসে পড়ে। তারাপদ ঘর থেকে বেরোতে যায়, এমন সময় সতীশের চিৎকার শুনে চাইল ওরা।

চাটুজ্যে মানুষ হলেও ওর চোখের দৃষ্টি শকুনের মতোই তীক্ষ্ণ। সতীশ তার আমদানির পথটা সহজেই খুঁজে নিতে পারবে। সতীশ চাটুজ্যে চিৎকার করছে,

—গেল—গেল রে। এ কী করলে মা কালী করালী। অ্যাঁ—গৃহস্থের একী অকল্যাণ করছিস মা! মাগো—

ওর চিৎকারে তারাপদ বলে,

—কী হলো ঠাকুর!

সতীশ তখন মাথায় বাঁশের বাটটি শূন্যে তুলে নাড়ছে আর চিৎকার করে হুশ-হ্যাস। তারাপদ, ওর মা দুজনে তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। শীর্ণ চাটুজ্যেকে ওইভাবে তুড়িলাফ খেতে দেখে আর চিৎকার করতে দেখে এগিয়ে এসেছে। সতীশ বলে,

—ওরে বাবা তারাপদ। তোর একী অকল্যাণ হল রে। অ্যাঁ—এ যে সর্বনাশের সূচনা রে।

ইদানীং তারাপদর ব্যবসাও ঠিক আগেকার মতো জমছে না। তার সার-এর ব্যবসার প্রায় সবটাই দখল করেছে নটবর। আর অন্য ব্যবসাতে আগেকার মতো রমরমা নেই। কারণ বাজারে এখন আরও দু-তিনটে বড় বড় দোকান হয়েছে। তারাই তারাপদর ব্যবসাতে ভাগ বসিয়েছে। তাই তারাপদের মন-মেজাজও ভালো নেই। তারপর এই অকল্যাণ—সর্বনাশের কথাতে সেও ঘাবড়ে গেছে।

—কী বলছ ঠাকুর? অকল্যাণ, সর্বনাশ!

তারপর তারাপদের মা-ই ঘোলাটে দৃষ্টিতে দেখে ওই শকুনটাকে। বড় একটা শকুন তার পুরোনো বাড়ির খড়ের চালে বসে আছে স্থিরভাবে। মাঝে মাঝে লাল চোখে কী হিংস্র চাহনি মেলে দেখছে এদের। ওর মা আর্তনাদ করে ওঠে।

—ওরে তরু। এ কী সর্বনেশে ব্যাপার রে। পৈতৃক আমলের বসতবাড়ির খড়ের চালে শকুন বসেছে।

এবার তারাপদও দেখছে শকুনটাকে। সতীশ চাটুজ্যেও দেখছে যে মা-ছেলের নজরে এসেছে শকুনটা। চাটুজ্যে বলে,

—ওরে আগে তাড়া, যত বেশি সময় ধরে ওটা বসে থাকবে, গৃহস্থের সর্বনাশ তত বেশি হবে রে, শকুন মানেই মৃত্যুর অগ্রদূত। তাড়া—

তারপর নিজেই একটা মাটির ঢেলা তুলে শীর্ণ হাত দিয়ে সেটা ছুড়ে দেয় খড়ের চালের দিকে। শকুনটা অবশ্য এদিকে নজর দেয় না। তার পর তারাপদও ঢিল ছুড়তে থাকে। ওর মাও চিৎকার শুরু করেছে গলা ফাটিয়ে, যেন বাড়িতে ডাকাতই পড়েছে।

ওর চিৎকারে পাড়ার দু-চারজন এসে তারাই ইটপাটকেল ছুড়ে শকুনটাকে তাড়াল। সতীশ চাটুজ্যে বলে,

—এ যে সর্বনাশের সুচনা রে।

তারাপদের বউও তখন বের হয়ে এসেছে। তারাপদ বলে,

—কী হবে ঠাকুর, অন্য পাখপাখালি যেমন বসে, তেমন শকুনটাও খড়ের চালে এসে বসেছে।

তারাপদর মা বলে,

—তুই থাম তরু। ঠাকুরমশাই যখন বলছে তখন শোন। ও ঠাকুর এখন কী হবে গো? এত বাড়ি রইল ওই মুখপোড়া শকুন অন্য কোথাও বসল না, বসল কিনা আমার ঘরে। এখন যদি কোনও সর্বনাশ হয়, কিছু একটা বিহিত করো ঠাকুর।

পাড়ার অনেকেই বলে,

—শকুন বসেছে। এখন যদি বিপদ-আপদ কিছু হয়।

তারাপদ বলে,

—কী হবে ঠাকুর?

সতীশ চাটুজ্যে বলে,

—গৃহ শীর্ষে শকুনং ফলং মড়কং। সমুহ বিপদের কথা। দেখি শাস্ত্র ঘেঁটে, এর বিধান নিশ্চয়ই কিছু আছে। তবে খুঁজতে হবে।

তারাপদের মা বলে,

—ও বাবাঠাকুর তুমি তো কত শাস্ত্র জানো, দেখেশুনে এর পিতিকার করো বাবা, ও মা করালী এ কী সর্বনাশ করলি মা গেহস্থের।

তারাপদও বলে,

—তাই করুন চাটুজ্যে কাকা।

সতীশ বলে,

—তোরা আজ সাঁঝবেলাতে আয়। আমি এর মধ্যে পুঁথিপত্তর ঘেঁটে দেখি কী বিধান আছে।

—তাই যাব বাবা।

মা-বেটায় দুজনে সতীশকে ভক্তিভরে প্রণাম করে, খুটোয় বাঁধা একটা দলা পাকানো নগদ দশ টাকার নোটই রেখে দেয়। সতীশও নোটটাকে তুলে পকেটস্থ করে বলে,

—কোনও ভয় নেই। আমি গৃহবন্ধন করে যাচ্ছি। তোমরা সন্ধ্যায় এসো, এর প্রতিবিধান করবই। জয় তারা—

সতীশ চাটুজ্যে আবার পথ চলতে শুরু করে। এ গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে এসে পড়েছে। আজ সকালেই সতীশ একটা ভালো বায়নাই পেয়েছে তারাপদর ঘরে। পাশের গ্রাম। সংগতিপূর্ণ চাষিদের গ্রাম। গ্রীষ্মের দিন বেলাও বেড়েছে। এর মধ্যে রোদের তেজ খরতর হয়ে উঠেছে। ওদিকে দীপু দাসের বাড়ি। অবস্থাপন্ন চাষি। একদিকে তার বসতবাড়ি—গোয়াল। একটা ডোবার পাশে বেশ বড়সড় টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ি। পথের ওদিকে খামারবাড়ি।

বড়-সড় কয়েকটা পালুইও রয়েছে খড়ের। বাড়ির সামনে দীপুর একজোড়া বলদ বাঁধা আছে। গ্রীষ্মের সময় ইচ্ছে করেই চাষিরা বলদগুলোকে কিছু সময় রোদে বেঁধে রেখে রোদ খাওয়ায়, এটা না করলে নাকি ওরা বর্ষার জল সইতে পারবে না।

বিশালদেহী বলদগুলো ঝিমুচ্ছে। হঠাৎ সতীশের মাথায় বুদ্ধিটা এসে যায়। সতীশ-এর অনেক বিদ্যাই জানা আছে। সে মাঝে মাঝে কবিরাজি চিকিৎসা করে থাকে, গোরু-বাছুরেরও চিকিৎসা করে। আজকাল পাড়া গাঁ—সরকারি পশু চিকিৎসকের ব্যবস্থা আছে। তবে সেই ডাক্তারের সন্ধানও সব সময় পাওয়া যায় না, তিনি কলকাতার লোক, পাড়াগাঁয়ে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বেশির ভাগ দিন তিনি কলকাতাতেই থাকেন। তাই সতীশ চাটুজ্যেরাই ভরসা।

সতীশ চাটুজ্যে এবার হাঁকডাক শুরু করে গলা ফাটায়।

—নসু, নসুরে—অ্যাই নসু।

নসু ওদিকের খামারে ছিল। হাঁকডাক শুনে ছুটে আসে সে, সতীশকে দেখে শুধায়,

—কী গো ঠাকুর? কী হল?

সতীশ বলে,

—আমার কী হবে? তোর যে সর্বনাশ হতে চলেছে সে খেয়াল কি রেখেছিস?

—কী হল গো? কী সর্বনাশ হল।

এবার সতীশ চাটুজ্যে ওই সাদা-কালো নধর ঝিমন্ত বলদটাকে দেখিয়ে বলে,

—ওটা তো ঝিমুচ্ছে। দম নিতে পারছে না দেখছিস।—এরোগ ধরলে কী করে। তাজা বলদটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে। আর বড় জোর ঘণ্টাখানেক, তার পর ধড়ফড় করে শেষ হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে।

নসুর এবার খেয়াল হয়, গরুটা নিস্তেজ হয়ে রোদে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। জাবর কাটাও বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যেন দম নিতে পারছে না। তাজা বলদটা কয়েকমাস আগে আটহাজার টাকায় গৌড়বাজারের গোহাট থেকে কিনে এনেছে। দামি বলদের এহেন দশা দেখে নসুর বউও এসে হাউমাউ করতে করতে কাঁদতে থাকে।

—ই কি সব্বনাশ হল গো। সামনে কাজের মরসুম, এ কী করলে বাবা রত্নেশ্বর।

নসু বলে,

—এখন চেঁচামিচি করে কোনও ফল হবে না। ও ঠাকুর তুমি তো এসব বিদ্যে জানো। গরুটাকে বাঁচাও।

সতীশ তখনও যেন গরুটাকে নিরীক্ষণ করছে। সে বলে—একটা কিছু করতে হবে। না হয় এক্ষুনিই বিডিও অফিসে ওই ভেটের ডাক্তার আছে, ওর কাছে নে যা।

নসু জানে বিডিও অফিস এখান থেকে নিদেন আট-দশ কিলোমিটার পথ। এই বিপদে বলদটাকে এতটা পথ নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই সে এবার সতীশকেই ধরে।

—তুমিই কিছু উপায় করো ঠাকুর।

—যা খানিকটা খাঁটি সরষের তেল নিয়ে আয়।

নসুর বউ বলে।

—আছে গো, এসো—

নসু বউ-এর সঙ্গে সঙ্গে তেল আনতে বাড়ির ভিতরে চলে যায়। সেই ফাঁকে সতীশ চাটুজ্যে সামনেই খেজুর ঝোপ থেকে কয়েকটা খেজুর পাতা আর কিছু ঘাস তুলে নিয়ে একটা নুট মতো বানিয়ে নেয়। নসু ওর বউও এর মধ্যে একপাত্র তেল এনেছে। সতীশ চাটুজ্যে এবার হাতের তালুতে সরষের বেশ ঝাঁঝালো তেল নিয়ে বিড় বিড় করে অংবং করে মন্তর পড়তে থাকে।

সতীশ চাটুজ্যে এবার বলদটার কাছে এসে ওর দু-নাকে সেই সরষের তেল কিছুটা ঢেলে দিয়ে একটি থাপপড় মেরেছে। আর এই ফাঁকে হাতের কায়দায় বলদের নাক থেকে সেই সরষের তেল মাখানো খেজুর পাতার নুটিটা বেরিয়ে আসে। আর সরষের তেলের ঝাঁঝে তেজি বলদটাও এবার ঝিমুনি ছেড়ে লাফাতে থাকে। ঘাড় নাড়তে থাকে। ওর নড়চড়ায় একটা সতেজ ভাব ফুটে ওঠে।

নসুও খুশি। সতীশ হাতের সেই তেলমাখানো পুরিয়া দেখিয়ে বলে,

—এইটাই শ্বাসনালিতে আটকে ছিল রে। ইস্ বেঘোরে মরত রে বলদটা।

নসুর বউও বলে,

—বাবা রত্নেশ্বরই রক্ষা করেছেন গো—তুমি এসে পড়েছিলে।

নসুই সতীশকে এবার খুশি হয়ে নগদ পঞ্চাশ টাকাই দেয় আর নসুর বউও ঘর থেকে ডালায় করে সের দুয়েক রূপসাল চাল, বেশ কিছুটা ডাল, আনাজপত্র মায় একবাটি খাঁটি সরষের তেল ইত্যাদি সিধেও দেয়। সতীশ আজকের পরিক্রমা শেষ করে ওইসব মাল-টাকা নিয়ে ঘর ফেরে—

পিয়ালী এখন ক্লাস নাইনে পড়ছে। মেয়েটার পড়াশোনাও বেশ ভালো, ওকে পড়াবার জন্য সতীশকে কোনও খরচ-খরচাও করতে হয় না, পিয়ালী প্রাইমারি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে গ্রামের স্কুলে ভর্তি হয়েছিল, অবশ্য এর পিছনে ছিল বিনয়বাবুর অবদান। বিনয়বাবুর কাছেও যায় সতীশ চাটুজ্যে। বিনয়বাবুর সন্তানাদি নেই। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, ভালোই রোজগার করেন, তা ছাড়া এ গ্রামের পুরোনো বাসিন্দা, জমি-জায়গাও আছে ভালোই।

বিনয়বাবুর স্ত্রী পিয়ালীর পরীক্ষার ফল দেখে খুশি হয়। মেয়েটা এমনিতে দেখতে শুনতে মন্দ নয়। বাড়ির অভাব, দারিদ্র্যের ছায়া যেন হাসিখুশি তেজী মেয়েটাকে স্পর্শ করতে পারে না, ভালো একটা শাড়ি নিজের হাতে কেচে তাই পরে স্কুলে যায় সে।

খেলাধুলোতেও চৌকস। বেশ প্রতিবাদী ধরনের মেয়ে। অন্যায় দেখলে প্রতিবাদ করে। পরের বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা করে আর প্রথম হয়। বিনয়বাবুর স্ত্রী রমলারও ভালো লাগে মেয়েটাকে। ইংরেজি, অঙ্ক দুটো সাবজেক্টেই মেয়েটা ভালো ফল করে। বিনয়বাবু

জানে ওদের সংসারের কথা। এতগুলো ছেলেপুলে সতীশ চাটুজ্যের। ওরা অরণ্যবর্জিত গাছপালার মতো নিজের থেকেই বেড়ে ওঠে। আবার আপনা থেকে হারিয়ে যেতেও সময় লাগে না।

রমলা বলে,

—পিয়ালী তুই আমার বাড়িতে আসবি। সকাল-সন্ধ্যা এসে পড়ে যাবি।

পিয়ালীও চায় তাদের বাড়ির অভাব আর মায়ের ওই রক্তচক্ষু মেজাজ-এর ফলে বিকৃত পরিবেশ থেকে সরে আসতে। বাবার ওই লোককে ধাপ্পা দিয়ে—মিথ্যা ভয় দেখিয়ে রোজগার করার পথটাকে মেনে নিতে বাধে তার। তাই সেও এখন সকালে উঠেই চলে আসে রমলাদের বাড়িতে। পড়াশোনা করে রমলার সংসারের টুকিটাকি কাজও করে। ওখানেই তার সকাল রাত্রির খাবারও খায়।

বাড়িতে সতীশের স্ত্রী গজগজ করে,

—সংসারের কাজে নেই, মেয়ে তোমার বিদ্যেধরী হবে। তাই ওই দিনরাত রমলার বাড়িতেই পড়ে থাকে।

সতীশ চাটুজ্যেও এতে আপত্তি করেনি। বরং খুশিই হয়েছে। বলে সতীশ,

—ও তো কোনও অন্যায় করেনি। পড়াশোনায় কত নাম, আজকাল মেয়েরাও কত বড় বড় চাকরি রয়েছে। ও যদি পাস করে তেমন কিছু করতে পারে, দেখবে সংসারের হালই বদলে যাবে।

ভানুমতীর সংসার সম্বন্ধে একটা তীব্র হতাশাই জেগেছে। এই সংসারে এসে দেখেছে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। সেই অভাবের কালো ছায়া তাদের সংসারের আলোকে অন্ধকারে ভরিয়ে রেখেছে। তাই বলে,

—ছাই হবে। পাথর চাপা কপাল আমাদের বদলাবে না।

সতীশ চাটুজ্যে অবশ্য এত সহজে ভেঙে পড়ার লোক নয়। সে বলে,

—দিন একদিন বদলাবেই।

পিয়ালী সেদিন বাড়িতে রয়েছে। স্কুলের ছুটি। দেখে সতীশকে ওসব নিয়ে ঘরে ঢুকতে। বিজয়ীর মতো একগাল হেসে সতীশ ওসব নামিয়ে বলে,

—আজ ভালো করে রান্না করো।

—এসব পেলে কোথায়? ভানুমতী শুধোয়।

—যিনি খান চিনি তারে জোগায় চিন্তামণি, একটু ভড়কে দিলেই বের হয়। আজ ভালোই শিকার হয়েছে। এল নগদ পঞ্চাশ টাকা আর এইসব সিধে। তবুকে যা কড়া দাওয়াই দিয়েছি ছুটে এল বলে ও বেলায়। তোমার শাড়ি, শিবানীর শাড়ি-জামার ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। ছেলেগুলোর জামা-প্যান্টও। পিয়ালী শুনছে বাবার কথা। সে বলে,

—এই ভাবে লোক ঠকিয়ে যাবে নিজের স্বার্থে। এসব ঠিক নয়।

সতীশ চাটুজ্যে সবে বিড়িটা ধরিয়ে একটা টান দিয়েছে। বেশ মেজাজ নিয়ে মেয়ের কথায় বলে,

—আরে আমি না ঠকালে ওদের আর একজন ঠকিয়ে অনেক কিছু সাফ করে নিয়ে যাবে। আমি তো তবু অল্পে সন্তুষ্ট। আর ঠকানোর কথা বলছিস—একালে কাউকে ঠকাতে না পারলে তাতে নিজেকেই ঠকতে হবে। কী শেখায় ইস্কুলে? অ্যাঁ?

স্কুলে যে এই ঠকাবার বিদ্যেটা শেখানো হয় না এটার কারণে সতীশ বিরক্ত। ওর হাত থাকলে ও লোক ঠকানোর জন্য বেশ আধুনিক পন্থার কিছু সিলেবাস ঢুকিয়ে দিত।

পিয়ালী বলে,

—ওই তো নন্দবাবুরা তোমাকে ওদের দোকানে খাতা লেখার কাজ দিতে চেয়েছিল।

সতীশ বলে,

—আরে খাতা লেখার চাকরি করে কী হবে? পরের গোলামি। এই তো বেশ আছি, স্বাধীন ব্যবসা।

এবার ভানুমতী ধমকে ওঠে মেয়েকে—

—দু-পয়সার ইংরেজি পড়ে মাথা বিগড়ে গেছে তোর। কী করে যে দিন চলে তা তো জানিস না।

পিয়ালী বিনয়বাবুর সংসারে থেকে দেখেছে তাদের জীবনচর্চাকে, যা বাড়ির জীবনচর্চার সঙ্গে মেলে না। ভালোভাবে বাঁচার কোনও পথই এমনি বহু মানুষের সামনে নেই। তাই বাঁচার মাশুল দিতেই মনুষ্যত্ব নামক বস্তুটাকে তারা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

তারাপদ দোকানে গিয়েও মন দিয়ে কাজ করতে পারে না। বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘরের চালে বসা সেই ভীষণ দর্শন শকুনটার কথা। কী ক্রূর চাহনিতে সে দেখছে চারিদিক। ও যেন মৃত্যুর অগ্রদূত, কী অশুভ সংকেত নিয়ে এসেছে।

তাই ভয় হয়। তাই বিকেলেই দোকান যাবার আগেই এসেছে তারাপদ। এমনিতেই সে অনেক অন্যায় কাজই করে। সরষের তেলে হোয়াইট অয়েল মিশিয়ে দেয় রীতিমতো। মহাজনের কাছ থেকে দুনম্বরি মাল আনে। তাতেও ভেজাল মিশিয়ে বেচে। আর ওজনেও বেশ কারচুপি করে। এ সব কিছুই পাপ।

তাই এমনিতে নিজেকে পাপীই ভাবে তারাপদ। তার ওপর ওই শকুনের ব্যাপারটাতে আজ বেশ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে তারাপদ। তাই একটু কিছু ধর্মকর্ম করা দরকার। এই ভেবেই এসেছে সতীশের কাছে।

সতীশ চাটুজ্যেও সে কথা জানত, ওকে যা ভয় দেখিয়ে এসেছে তাতে ও আসবেই। আর তার পর কীভাবে কতখানি বধ করবে তার ফিরিস্তিও করে রেখেছে। বাইরের ঘরে সতীশের কারবারের ঠাট। একটা কাঠের আলমারিতে বেশ কিছু পুরোনো পঞ্জিকা সাজিয়ে রেখেছে। আর অনেক তুলট কাগজের বান্ডিলও তাড়া করে রাখা। দেওয়ালে কোনও ভৃগু মহারাজের কাল্পনিক ছবি। এদিক-ওদিক ছড়ানো কটা পুঁথি আর ঠিকুজি। ওসব কার কোষ্ঠি ঠিকুজি তা সতীশও জানে না। ওর পিতৃদেবের আমল থেকে ওসব তাড়া করা আছে। ওই দেখিয়ে সেও গ্রহরাজ সেজে বসে।

ওপাশে বেশ কিছু লতাপাতা শেকড় শুকনো। ওগুলো তার কবিরাজির উপকরণ। তারাপদ এসে প্রণাম করে বসে। সতীশ ওকে দেখেও দেখে না। সে তখন লম্বা কোষ্ঠিতে কী যেন ব্যস্তভাবে লিখে চলেছে। তারপর মুখ তুলে বলে—আরে সদরের কালী—তোমাদের এম. পি কালী হে ওর নাতির কুষ্ঠির জন্য তাড়া দিচ্ছেন। ওই নিয়ে ব্যস্ত। তবে হ্যাঁ তোমার ফর্দটাও করে রেখেছি। এই নাও।

ফুটখানেক লম্বা একটা সরু কাগজের ফালিতে ফর্দ করে এগিয়ে দেয়।

সতীশ বলে,

—পরশুই অমাবস্যা। পরশু দুপুরেই তোমার মহামৃত্যুঞ্জয় হোমটা করে দোব। হোমের বিভূতি ছড়িয়ে দেবে বাড়িতে। ব্যস, সব শান্তি। সব বাধাভয় কেটে যাবে হে।

তারাপদ ফর্দ দেখে বলে,

—আজ্ঞে শাড়ি চারখানা—গামছা চারখানা—তারপর এতসব স্বর্ণ-রৌপ্য-কাংস্য থালিকা—জলপাত্র।

সতীশ বলে,

—প্রেতযোনির ভোজন বলে কথা—ব্যাটারা সব কিছু ঠিকঠাক না পেলে রেগে যায় হে তরু। ও ব্যাটাদের তাই তৃপ্ত করতেই হবে। সামান্যর জন্য খুঁত রাখবে?

তারাপদ বলে,

—তা হলে কাজ নেই। আমি সব আয়োজন করে রাখছি। কালই আসুন। তবে দক্ষিণা দুশো একান্ন টাকা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে। দোকানদার মানুষ তারাপদর দরদাম করা অভ্যাস জেনেই সতীশ কিছু বাড়িয়ে রেখেছিল ওটা। সতীশ বলে,—দ্যাখো বাপু, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেবে খুশি হয়ে—ঠিক আছে ওটা পুরোপুরি দুশো একই করে দেবে। তা হলে কাল আমি যাচ্ছি তৈরি হয়ে। প্রেতযোনির কাজ। গৃহবন্ধন-দেহবন্ধন এসব ক্রিয়া করে তবে কাজ নামাতে হবে।

পিয়ালী শুনছে বাবার কথাটা। তার এসব ভালো লাগে না। কিন্তু বেশ জানে এসব ছাড়া তার বাবার করার কিছু নেই। লোকের মনের কুসংস্কারগুলোকে নিয়েই তার বেসাতি। পিয়ালী ভাবে সে বড় হলে লেখাপড়া শিখলে সমাজের কুসংস্কারগুলোকেই দূর করবে। আজকের সভ্য স্বাধীন বিনয়বাবুও পিয়ালীর এই মানসিকতাকে সমর্থন করেন। মেয়েটি এমনিতে জেদি।

বাবার ওইসব কাজকে সমর্থন করে না। বলে সে সতীশকে,

—এই ভাবে লোককে ঠকাবে?

ফুঁসে ওঠে সতীশ।

—তুই থামবি? খুব যে সৎ আদর্শবান রে, বিনয় মাস্টার তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে। এখানে সব কিছুই যদি এত খারাপ—আমরা যদি এত অসৎ—তা হলে পড়ে আছিস কেন এখানে?

পিয়ালী চুপ করে থাকে। সে মনে মনে এখান থেকে মুক্তিই চায়। কিন্তু পথ নেই, তাই যেন পিয়ালী বিনয়বাবুর বাড়িতেই আসে রমলার কাছে। রমলাও বলে– তোর অসুবিধা না হয় এখানেই থাকবি। আমার বাড়ি তো খালিই পড়ে আছে।

ওই সন্তানহীন দম্পতিও পিয়ালীকেই তাদের সন্তানের মতো দেখে। রমলা বলে বিনয়কে,

–মেয়েটাকে মানুষ করতে পারি না আমরা?

বিনয় বলে,

–পরের মেয়ে, জোর করার তো কিছুই নেই, ওর বাবা-মা আছে।

রমলা বলে,

—ওর বাবা-মা কী করেছে ওর জন্য ? মেয়েটার বুদ্ধি আছে, সাহস আছে। ও লেখাপড়া শিখলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। তবে ওর বাবা তো তা হতেই দেবে না। একটা মেয়ের জীবন নষ্ট করে দেবে এই অধিকারে।

বিনয়বাবু বলেন,

—এ নিয়ে ওদের কিছু বলে কাজ নেই। এটা পিয়ালীর ওপরেই ছেড়ে দাও। ও নিজের ভালো-মন্দ বোঝে। সঠিক পথই বের করে নেবে। তুমি তখন তাকে সাহায্য করবে।

পিয়ালীও এখন বেশির ভাগ সময় বিনয়বাবুর বাড়িতেই থাকে। পড়াশোনাতেও সে এখন স্কুলের সেরা ছাত্রী—পিয়ালীও চায় নিজের মতো করে বাঁচতে।

তারাপদর বাড়িতে এসেছে সতীশ চাটুজ্যে। তারাপদ স্নান সেরে উপোস করে হোম-যজ্ঞ নিয়ে ব্যস্ত। তারাপদ-র মাও পাটবস্ত্র পরে হাত জোড় করে বসে আছে। তারাপদ স্ত্রীও জোগাড়যন্ত্র করছে।

ঘি পুড়ছে হোমের আগুনে। সওয়া পাঁচসের ঘি পুড়ছে। অবশ্য সতীশ চাটুজ্যে এর মধ্যে সের খানেক একটা কাচের বোতলে তার পুষ্যিদের জন্য গামছা দিয়ে জড়িয়ে আলাদা করে রেখেছে। বাকিটা পুড়িয়ে দিতে হচ্ছে, উপায় থাকলে আরও কিছুটা সরাত। কিন্তু বুড়িও শকুনের মতো চেয়ে দেখছে সতীশের কার্যকলাপ। অবশ্য সতীশ চাটুজ্যেও জানে কীভাবে মোচড় মেরে মাল বের করতে হয়।

সতীশ এখন যেন সত্যি কোনও তপস্যারত ঋত্বিক। কপালে লাল ফেট্টি বেঁধে—একটা লাল জামা পরে বিকট স্বরে মন্ত্র পড়ে চলেছে। ধূপ-দীপ জ্বলছে সামনে, পঞ্চব্রতের জন্য পাঁচটি বেশ বড় সাইজের থালায় স্তূপাকার নৈবেদ্য সাজানো। ওদিকে ফলমূল-সন্দেশ এসবও রয়েছে। সতীশ এবার তারাপদর সামনে কলাপাতায় নটি বিশুদ্ধ গোবরের গুলি রেখে বলে,

—তারাপদ এই নটি মন্ত্রপূত গোবরের গুলি যে গ্রহণ করতে হবে। তা হলেই গ্রহ প্রায়শ্চিত্ত ও অঙ্গ প্রায়শ্চিত্তও হয়ে যাবে। তারপরই শুদ্ধ হয়ে উঠবে। আর আমিও যজ্ঞে পুষ্পাহুতি দিয়ে ব্রহ্মাদেবকে প্রণাম জানাব। সব বিপদ পাপমুক্তি ঘটে যাবে। নাও এক একটা করে গোবরের গুলিগুলো গিলে ফ্যালো। এবার তারাপদর চমক ভাঙে। আর্তকণ্ঠে সে বলে,

— বলেন কী ঠাকুরমশাই। ওই গোবরের গুলিগুলোকে গিলতে হবে এক-একটা করে!

সতীশ নির্বিকারভাবে বলে,

— গোবর পবিত্র বস্তু। শাস্ত্রের বিধান—নটি গোলাই সেবন করতে হবে। ভয় নেই। নাক টিপে এক-একটা গুলি মুখে ফেলে কপ করে গিলে নাও।

তারাপদ তো ঘাবড়ে গেছে। ওর মা বলে,

—ওরে বাবাঠাকুর যখন বলছে নে বাবা, কপ করে গিলে নে।

তারাপদ একটা গোবরের গুলি মুখের কাছে তুলে ওই বিশ্রি গন্ধে ঘাবড়ে গিয়ে নামিয়ে রেখে বলে,

— বোটকা বিশ্রি গন্ধ, ওরে বাবা, এ খেতে পারব না।

— সেকী তরু। যজ্ঞক্রিয়া যে অসমাপ্ত থাকবে বাবা। প্রেতের দলকে ব্যাহত করা যাবে না অঙ্গ শুদ্ধি না হলে। খাও —

—অন্য কোনও পথ নেই ঠাকুর?

সতীশ চাটুজ্যে এবার গম্ভীরভাবে বলে,

—আছে, তবে সে তো ব্যয়বহুল। মানে নটি গোবর গোলকের সমপরিমাণ স্বর্ণদান করতে হবে পূজারিকে।

এবার তারাপদ চমকে ওঠে। ওই গোবর গুলিগুলোর সমান ওজনের সোনা দান করার কথা শুনে তারাপদ ঘাবড়ে গেছে।

বেশ কয়েক ভরি সোনার ব্যাপার। তারাপদ এবার মনস্থির করে ফেলে। ওই গোবরই গিলে নেবে।

তাই নাক টিপে একটা গোবর গুলি মুখে পুরেই এবার লাফ দিয়ে ওঠে তারাপদ। সরে গিয়ে সবটা থু-থু করে ফেলে দিয়ে মুখ ধুতে থাকে। ওর মাও হাহাকার করে ওঠে।

—একি করলি রে তরু, না গিলে ফেলে দিলি?

তারাপদ বলে,

—ও রে বাবা, বমি আসছে গো। ওয়াক্।

কোনওরকমে সামলে নেয় তারাপদ। কিন্তু এখন কী হবে? তারাপদ কারবারি মানুষ। সবকিছুতেই দরাদরি করতে জানে, তাই বলে,

—ও ঠাকুরমশাই। একটা বিহিত করুন। এ খেতে পারব না। এত সোনা পাব কোথা থেকে?

সতীশও এবার বলে,

—তাহলে মূল্য ধরে দাও। নটা গোলা গেলানোর জন্য নিদেনপক্ষে পাঁচশো টাকা ব্রাহ্মণকে দাও। আমি দেখি অন্যপথে কিছু করতে পারি কি না, কিছু তো করতেই হবে।

তারপদ বলে,

—অনেক খরচা করে দিয়েছে ব্যাটা শকুন। দেখছেন তো চাটুজ্যেমশাই। আবার এত টাকা গুনাগার দিতে হবে? ওরে বাবা, শ-খানেক টাকা নিয়ে ক্ষ্যামা দেন। তারাপদর মাও এবার গেয়ে ওঠে,

—তাই করুন ঠাকুর।

—তা কী করে হয়?

শেষ অবধি মিনিট পাঁচেক দরাদরির পর নগদ তিনশো টাকা আরও নিয়ে সতীশ ট্যাকে গোঁজে। এবার পুষ্পাহুতি দেয়। যজ্ঞ শেষ হয়। এক শকুনের জন্য সতীশের বেশ কিছু আমদানিও হয়।

অবশ্য খবরটা গ্রামের অনেকেই জেনেছে। সতীশ চাটুজ্যে যে তারাপদর মতো একজনের কাছ থেকে এইভাবে টাকা বের করতে পারে এটা জেনেছে অনেকে। তারাপদর পাশের বাড়িতেই থাকে মাধব কবরেজ। মাধব কবরেজ বাইরের ঘরে তার কবরেজখানায় বসেই সব শোনে। তার মেয়ে মালতীও স্কুলে পড়ে। মাধবের এক ছেলে কাছারিতে

কাজ করে। ছেলেও কিছু দেয় বাবাকে আর কিছু আয় হয় জমি থেকেও। কবিরাজি থেকে আগে আয়পত্র হত। এখন গ্রামে ডাক্তার এসেছে আর তা ছাড়া লোকজন আগেকার মতো বোকা নয়। তারাও আর কবিরাজির ওই লতাপাতা মূলচূর্ণ করা বড়িতে ভরসা করে না। ডাক্তারের ওষুধই বেশি খায়। তবু কিছু মানুষ এখনও কবিরাজি করে। কিন্তু ইদানীং সতীশ চাটুজ্যেও ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে রোগী খুঁজে নিজেই তাদের আদার কুচি-লতাপাতার ওষুধ দিয়ে দু-পাঁচটাকা নিয়ে খুশি থাকে। ফলে মাধবের কবিরাজিও প্রায় অচল হয়ে এসেছে ওই সতীশের অত্যাচারে।

মাধব কবরেজ তাই এখন কবিরাজির পাশাপাশি হোমিওপ্যাথিও ধরেছে। একদিকে কবিরাজির চার্ট। অন্যদিকে হোমিওপ্যাথির বাক্সে ছোট শিশি মজিয়ে এখন টিকে থাকার চেষ্টা করে। আর সতীশের মুণ্ডপাত করে। ও ব্যাটা যেন সব পথই আগলে রাখতে চায়। এ হেন সতীশ সামান্য একটা শকুন বসার কেস থেকেই এ হেন দাঁও মারবে এটা ভাবেনি সে।

মালতীও দেখেছে সেটা। মাধব সব শুনে বলে,

—সতীশটা মহা ফেরেব্বাজ, এই ভাবে ঠকাল তারাপদকে ।

মালতী বলে,

—তা সত্যি। জানলে বাবা যেমন সতীশ চাটুজ্যে তেমনি ওর মেয়েটাও ওই পিয়ালী।

—কেন? সে আবার কী করলে? মাধব পিয়ালীকে দেখেছে কিন্তু মালতীর মুখে তার সম্বন্ধে ওই কথা শুনে প্রশ্ন করে।

মালতী ক্লাসে যায় মাত্র। এমনিতে সে একটু বেশি সাজগোজ করতে ভালোবাসে। দেখতেও মন্দ নয়। আর নিজের সম্বন্ধে মালতীর একটা বিশেষ ধারণাও আছে।

পড়াশোনাতে তার মন নেই। তার স্বপ্ন সে গাইয়ে হবে। তাই মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম নিয়ে বিকট সুরে গানও করে। তার আফসোস গ্রামে গানের মাস্টার তেমন কেউ নেই। গোবর্ধন ধাড়া যাত্রার দলে হারমোনিয়াম মাস্টার। সেও ক'মাস বাড়িতে থাকে না। মালতী এবারও ফেল করেছে। আর ফেল করেছে রমলার সাবজেক্ট ইংরেজি আর অঙ্কতেই। ওই দুই বিষয়ে সেরা ছাত্রী ওই পিয়ালী।

মালতী তাই পিয়ালীকে দেখতে পারে না। মালতী ওর বাবার কথায় বলে,

—ওই পিয়ালীটা দিনরাত রমলাদির বাড়িতে পড়ে থাকে। ওদের ঘরের কাজকর্ম করে দেয়। আর রমলাদি তাই ওকে বেশি নম্বরই দেয়। যা চালু ওই পিয়ালী। আমি স্কুলের ফাংশনে সেবার গান গাইলাম। সবাই কত প্রশংসা করল। আর পিয়ালী কী বলে জানো? বলে, আমার নাকি পাতিহাঁসের মতো গলা। তোর গলা যেন কোকিলের মতো। মাধব বলে,

—সতীশটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে রে, ওর মেয়েও তা হলে ওই রকম।

মালতীরও রাগ ছিল পিয়ালীর উপর। ক্লাসে পিয়ালীকেই গুরুত্ব দেয় সকলে, মালতীকে কেউ কোনও গুরুত্বই দেয় না। রমলা দিদিমণি, অন্য দিদিমণিরাও পিয়ালীকেই সব প্রশ্ন করে। মালতীকে প্রশ্ন করলে মালতী উঠে দাঁড়ায় মাত্র। চুপচাপই থাকে। অন্য মেয়েরা বলে,

—বসে পড় মালতী, তোর মেকআপ গলে যাবে রে।

মালতী রেগে ওঠে। আর তার পরই সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় পিয়ালীই। মালতীর রাগটা আর ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

এবার মালতী যেন পিয়ালীর সম্বন্ধে বেশ কিছু বলার মতো খবরই জেনেছে। সেদিন পিয়ালী ক্লাসে এসেছে। নতুন শাড়ি পরে, কে বলে,

—কিরে পিয়ালী শাড়িটা নতুন কিনলি?

পিয়ালী জবাব দেওয়ার আগেই মালতী বলে,

—ওসব কেনা শাড়ি নয়। ও তো দানের শাড়ি৷ ওটা ওর বাবা পেয়েছে।

পিয়ালী কিছু বলার আগেই মালতীই এবার ক্লাসে ওই শকুনের উপাখ্যানটাই বেশ রং চড়িয়ে ক্লাসের বান্ধবীদের শুনিয়ে দেয়। পিয়ালীর বাবা কীভাবে নানা প্যাঁচে ফেলে লোকের কাছ থেকে টাকা আদায় করে সেইসব কাহিনিও শুনিয়ে দেয়।

পিয়ালীও ভাবেনি যে এই শাড়ির জন্য স্কুলে এসে মালতীর কাছে এইসব কথা শুনতে হবে। আর সারা ক্লাসের মেয়েরাও জানবে তার বাবা কীভাবে রোজগার করে।

পিয়ালীর চোখে জল আসে। সে কী বলতে যাবে–তার কথা আর বলা হল না। ক্লাসের দিদিমণি এসে ঢুকেছে। আপাতত ওই প্রসঙ্গ চাপা পড়ল।

অবশ্য এ নিয়ে পিয়ালীকে আর কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু পিয়ালী ভোলেনি মালতীর কথাগুলো।

পিয়ালী বাড়ি এসে শাড়িটা ছেড়ে ফেলে বলে মাকে,

—ওই শাড়ি পরে স্কুলে যাব না।

মা'ও অবাক হয়,

—কেন?

—বাবা একে-তাকে ঠকিয়ে আসে। তাই নিয়ে স্কুলে আজ ওই মালতী যা তা বলল।

সতীশ চাটুজ্যে তামাক খাচ্ছিল। সব শুনে সে বলে,

—ওর বাবা ওই মাধব কী করে? বলে দিস্—ও ব্যাটা রোগীকে ওষুধ দেবার নাম করে শুধু আজেবাজে পাতার বড়ি দিয়ে লোক ঠকায়। ও ব্যাটা জোচ্চোর। ওর মেয়ের আবার বড় গলা।

পিয়ালী এসব তর্কে যেতে চায় না। ও বেশ বুঝেছে তাকে কিছু করতেই হবে। এই অভাবের জীবন থেকে তাকে মুক্তি পেতেই হবে। আর তাই সে রমলাদির আশ্রয়টাকেই বেশি করে পেতে চায়। সামনে পরীক্ষা। মাধ্যমিকে তাকে ভালোভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। তারপর কলেজে কি যেতে পারবে?

রমলাদি যদি দয়া করে, পিয়ালীর জীবনটা বদলে যেতে পারে। পিয়ালীকে সেই চেষ্টাই করতে হবে। পিয়ালীও চায় নিজেকে গড়ে তুলতে। সেও জীবনে হার মানবে না।

বিনয়বাবু বলেন,

—মন দিয়ে পড়াশোনা কর পিয়ালী। দরকার হলে তোর বউদির কাছেই থাকবি। মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। অবশ্য রমলার কাছে পিয়ালী আসার ব্যাপারে পিয়ালীর মা এমনকী সতীশ চাটুজ্যেও আপত্তি করে না। সতীশ হিসাবি বিচক্ষণ ব্যক্তি। সে জানে মেয়েটা ওদের কাছে থিতু হতে পারলে তারই সুবিধা হবে। আর সতীশ জানে

তার নিজের মেয়েকে পড়াবার কোনও সাধ্য নেই। অথচ পিয়ালীর মাথা আছে। সতীশও আশা করে রমলাই যদি ওর জন্য কিছু করতে পারে তারও সুবিধা হবে।

তাই সতীশও পিয়ালীর এইভাবে ওখানে থাকাকে মেনে নিয়েছে।

নটবর এখন এই এলাকার একটি পরিচিত নাম। তার অবস্থাও এখন বদলেছে। বাজারে বড় দোকান। ওদিকে মন্দিরের আয়পয়ও বেড়েছে। কারণ এখন কাছেই বড়জোড়ায় গড়ে উঠেছে ছোটখাটো এক শিল্পনগরী। ইদানীং এদিকে আর একটা নতুন ব্যবসাও খুব চালু হয়েছে।

এদিকে কয়লাখনি অঞ্চলও কাছেই। এখন আইনি-বেআইনিভাবেই প্রচুর কয়লা তোলা হয়। কয়েক বছরের মধ্যে এই দিকের চেহারাও বদলেছে। এই অঞ্চলের সীমান্ত দামোদর নদ। তার ওদিকে কয়লাখনি অঞ্চল। কিন্তু এবার নদীর এপারের শালবন ঢাকা জমির নীচেও বেশ কিছু কয়লার সন্ধান পেতে অনেকেই এবার গোপনে নানাভাবে কয়লা পাচার করতে শুরু করেছে।

বনের মধ্যে কোথাও একটা বড় ইঁদারা মতো। নটবরও এসব কিছুর সন্ধান রাখে। ওই বনের গভীরে ওই ইঁদারার জল ওঠে না। রাতের অন্ধকারে ওই ইঁদারা দিয়ে কিছুটা নেমে ওরা কয়লার স্তরের সন্ধান পেয়েছে। আর সেই স্তরের অফুরান কয়লা তুলে রাতারাতি পাচার করে। তার জন্য এক শ্রেণির কর্মীও তৈরি হয়ে গেছে। নটবর খবর রাখে। সে এখন সহকারী অঞ্চল-প্রধান। নরেশবাবু ভোটে জিতে তাকে এই পদে এনেছেন। নটবর ভেবেছিল দ্বিতীয়বার নরেশদা ওই পদ ছেড়ে দেবেন তাকে, সেরকম কিছুটা আভাসও দিয়েছিলেন নরেশ নটরবকে। নটবর-এর বাড়িতে ওর গিন্নি বাসন্তীও বলে,

—চিরকালই কি ওই নিয়েই থাকবে। প্রধান কি জীবনে আর হবে না? নটবরও ভাবছে কথাটা।

তখন নন্দবাবুর দলে ছিল। নটবর আশা করেছিল নন্দবাবুর পর সেই এই গদি পাবে। কিন্তু দেখেছে নন্দবাবু ওই গদি ছেলের হাতে তুলে দিতে চান। কিশোর থাকতে নটবর কোনওদিন ওখানে সুযোগ পাবে না জেনেই নটবর ওদের গদি পালটে দিয়ে এসেছিল নরেশদার কাছে। ভেবেছিল নরেশদার বয়স হয়েছে। সেই-ই এবার পাবে তার গদি। কিন্তু এতগুলো বছর কেটে গেল, নটবরের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। নরেশবাবুই এখন গদিতে বসে আছে।

নটবরও তত বেশি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। এখন তার অভাব নেই। গ্রামের বাইরে ছোট নদীর ধারে একলপ্ত জমিও দখল করেছে সে। গ্রামের বেশ কিছু লোকের জমি ছিল ওখানে। নটবর ওখানে প্রথম কৃষি সমবায় এর পত্তন করে। সেই জমির মালিকদের বলে যে ওই জমিতে সারাবছর ফসল হয় না। সে একটা সমবায় করে সরকার থেকে ঋণ নিয়ে ওই নদীতে একটা ছোট ড্যাম করে বর্ষার বাড়তি জলটাকে আটকাবে। ওই ড্যামে মাছের চাষও হবে। আর জমাজলে পাম্প করে ওই সব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করে চাষ করবে।

অনেকেই ওর কথামতো জমিও দেয়। নরেশকেও নটবর চাপ দিয়ে ওই সমবায়ের

কাগজে সই করে নিজেই সম্পাদক হয়ে বসে আর সরকার থেকে বেশ কিছু টাকাও স্যাংশন করায়। নটবর অবশ্য নরেশবাবুকেই সেক্রেটারি করেছে। নরেশও ভেবেছিল ওই টাকার কাজ হবার আগেও তাকেও বেশ কিছু টাকা দেবে নুটু।

কিন্তু নটবর তা দেয়নি। সে সত্যিই ড্যামও করাচ্ছে, সেখানে এখন গভীর জল থাকে। মাছের চাষও হচ্ছে আর সেখানে পাম্প বসিয়ে ওই বিস্তীর্ণ জমিতে চাষও করছে।

প্রথম কয়েক বছর সে কিছু লোককে কিছু চারাও দিয়েছিল লভ্যাংশ বাবদ, কিন্তু তার পর কয়েক বছর ধরে আর তেমন কিছু দেয় না। ওই এলাকায় বেশ কিছু জমিতে প্রাচীর ঘিরে একটা সুন্দর বাড়িও করেছে নটবর। এখন ওই ফার্ম হাউসের দখলদার সে একাই।

নরেশ অবশ্য এতে খুশি নন। কিন্তু নটবরকে প্রকাশ্যে চটাতেও চান না নরেশবাবু। কারণ, এখন নন্দবাবু আসরে না থাকলেও কিশোর রয়েছে। তার ব্যবসাপত্রও ভালো চলছে। সে এখনও আশা ছাড়েনি। তাই তার দলবল নিয়ে এখনও ভোটে দাঁড়ায়। কয়েকটা সিটও পায়। স্বপ্ন দেখে সে আবার হৃতরাজ্য ফিরে পাবে। সেদিক থেকে নরেশবাবুর জনপ্রিয়তা নটবরের চেয়ে কমই। নটবর গ্রামে গ্রামে এখনও ঘোরে। লোকের বিপদে আপদে গিয়ে পাশে দাঁড়ায়। অঞ্চলের পথঘাট নিয়ে কাজ করে। পানীয় জলের জন্য সরকার থেকে যে টাকা পায় তা খরচও করে—এম.পি. কোটা থেকেই বলে কয়ে টাকা পাইয়ে দেয় স্কুলগুলোকে। তার চেষ্টাতেই গড়ে উঠেছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আর ডাক্তারও বসেন সেখানে ঠিকমতো।

নটবর তার ঐশ্বর্যের কোনও প্রকাশই করে না। আজও সেই পুরোনো মোটরবাইকেই চড়ে, নরেশবাবু অবশ্য বাইকে চড়তে পারেন না, তাই গাড়ি কিনেছেন। নটবর যা করে খুবই গোপনে। আর অনেক বুদ্ধি রাখে সে। সে এখন ওই কয়লা মাফিয়াদেরই সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছে। রাতের অন্ধকারে দূর সীমান্তের বনের মধ্যে ওদের কারবার চলে। লাখলাখ টাকার কারবার। নটবর গোপনে ওই কয়লা চোরদের সঙ্গে বেশ কিছু বড় মাপের নেতাদেরও যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছে। ফলে উপর মহল, বনবিভাগ-এর কিছু লোকও কিছু পায়। তারাও এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না।

এই ফাঁকে নটবরও রাতারাতি বড়লোক হতে থাকে। বাইরে সে জনসেবক, ভিতরের এই রূপটার খবর বাইরের লোকেরা জানে না। নটবরকে এবার প্রধান হতেই হবে। এখন তার ছেলেও কলেজে পড়ছে। ভবেশ মাঝে মাঝে বাড়ি আসে। বাসন্তীও ছেলেকে চোখের আড়াল করতে চায় না। নটবর বলে,

—ওকে আমি ডাক্তারি পড়াব। না হয় ইঞ্জিনিয়ারই করব।

বাসন্তী বলে,

—ওসব করার জন্য আবার তো সেই দক্ষিণের কোথায় পাঠাতে হবে। তারপর পাস করে চাকরি—তোমার নিজের এত বড় ব্যবসা। এত বিষয়, কারখানা কে দেখবে? পাস করলে ওকে এবার ব্যবসাতেই ঢোকাও। এতেও রোজগারও কম হবে না।

কথাটা ভাবছে নটবরও। তখন ব্যবসার পরিবেশও ছিল না। ওদিকে তেমন কোনও সুবিধাই ছিল না। নটবরের ওই স্বপ্ন পূরণ করতেই হবে। এবারও ভোটের সময় এসে

গেছে। ওদিকে নন্দবাবুর ছেলে কিশোরও বসে নেই। তার ব্যবসা এখন বেড়েছে। কিশোর এখন ওই কয়লার ব্যবসায়ী আগরওয়ালজির কাছের লোক।

মিঃ আগরওয়াল এতদিন ধানবাদ, রানিগঞ্জ কয়লাখনি এলাকায় নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে। আসানসোলে তার বিরাট হোটেল। সরকারি মহলে ওই আগরওয়ালজির অনেক প্রতিপত্তি। এখানের মন্ত্রীরাই নয়, খোদ দিল্লির মসনদেরও দু-তিনজন মন্ত্রী তার হাতের লোক। তাদের নির্বাচনে আগরওয়ালও দরাজ হাতে খরচ করে। তাদের মন্ত্রী বানিয়েছে নিজের ফায়দা লোটার জন্য।

সুরেশ আগরওয়ালের এমনি প্রকাশ্যে বিরাট কনট্রাক্টর ফার্ম সারা ভারতের বহু দুর্গম জায়গায় তারা বড় বড় রাস্তা-ব্রিজ এসব তৈরি করে।

গুজরাটেও কীসের কারখানা আছে।

আর কয়লার ব্যবসাতেও তার খুব নামডাক। প্রকাশ্যে হাজার হাজার টন কয়লা সে সারা ভারতের কোণে কোণে পাচার করে। সেই কয়লার সঙ্গে তার বেআইনি কয়লাও পাচার হয়। রানিগঞ্জ অঞ্চলে বেশ কিছু কয়লাখনিকে সে পরিত্যক্ত করেছে বিপদজনক বলে।

সে সব খনির গভীরে এখনও যা কয়লা রয়েছে তা উৎকৃষ্ট। তবে সে সব পরিত্যক্ত খনির কাজ বন্ধ। শ্রমিকরাও চলে গেছে অন্য কোলিয়ারিতে। এখন ওইসব এলাকা জনমানবশূন্য। মিঃ আগরওয়ালের বাহিনী রাতের অন্ধকারে ওইসব খনি থেকে প্রচুর মাল তোলে। পাহারাদারেরাও কিছু পায়। এমনকী, প্রণামি পায় উপর মহল অবধি। ওদের দিয়ে থুয়ে আগরওয়ালজির যা কয়লা থাকে তাও কম নয়।

কোথাও মাটির আট দশ ফিট নীচে কয়লা আছে। সে সব জায়গাতে এখনও কয়লা তোলার কাজ কোম্পানি শুরু করেনি। কিন্তু আগরওয়ালের লোকজন সেখানেই হাত লাগিয়ে কয়লা সাফ করে। দামোদরের এদিকেও যে প্রচুর কয়লা রয়েছে সেটা জেনেই আগরওয়াল বাহিনী এদিকে জঙ্গলের মধ্যেই গোপনে অধিবেশন শুরু করেছে। কিশোরও তৈরি ছিল। সেই-ই এসব খবর দিয়েছে মিঃ আগরওয়ালকে। কিশোর এখন ওইসব মহলেও যাতায়াত শুরু করেছে।

মিঃ আগরওয়ালও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের লোকেদের সহায়তা চায় তাই কিশোরকে তার দরকার। কিশোরও এর মধ্যে আগরওয়ালের সঙ্গে ভিড়ে এবার ওই কয়লার ব্যবসাতেই নেমেছে। কিশোরও তার কিছু লোকদের সুরেশের দলে ভিড়িয়ে দিয়েছে। তারাও সব খবর রাখে। স্থানীয় পুলিশকে হাতে এনেছে কিশোর। তারাও নগদ নারায়ণ-এর সন্ধান পেয়ে খুশি। ফলে কিশোর এখন পায়ের তলায় মাটি পেয়েছে। টাকাও আসছে, তাই ওর এই পঞ্চায়েত দখল করা দরকার। কারণ, প্রশাসন হাতে থাকলে এসব কাজ অনেকটা নিরাপদেই করা যাবে।

মিঃ আগরওয়ালও বলেন,

—তাই করো কিশোর। তোমাকে পায়ের নীচে জমিন পেতে হবে। এবার কিশোর নব উদ্যমে লেগেছে ওই পঞ্চায়েত দখল করার জন্য। কিন্তু নরেশও এর মধ্যে প্রচার শুরু করেছেন। নটবরকে বলেন,

—এবার আমিই প্রধান থাকব। নটবর এর পর তোমার পালা। এবার জিততেই হবে। তা হলে সামনের বার হবে তুমি।

নটবর প্রকাশ্যে বলে,

—আপনার কথাই শেষ কথা নরেশদা। আমি দলের কথামতোই চলব। আপনাকেই জিতিয়ে আনব।

নরেশও খুশি হন। বলে,

—তুমি সব পারো হে নটু। তোমার ভরসাতেই লড়ছি। তবে এবার কিশোরও বেশ মোটা টাকা দাবি করছে। শুনছি বাইরের লোকজনও মদত দিয়েছে ওকে। এবার জিতলে ওদের ওই দুনম্বরি ধান্দা চোপাট করে দোব। নটবর বলে,

—কিশোরটা শুনি এখন বড় গাছে ভেলা বেঁধেছে। তবে ওকে আমরা এখানে পা রাখতে দোব না।

এবার ভোটের প্রচার শুরু হয়েছে দু-পক্ষের। এর মধ্যে নরেশও গোপনে সুরেশজির সঙ্গে দেখা করেছেন তার আসানসোলের হোটেলে গিয়ে। সুরেশ আগরওয়াল ঝানু ব্যবসায়ী। সেও এর মধ্যে এখানের খোঁজখবর নেয়। সে আপাতত কিশোরকে নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু এর মধ্যে নটবরও ওই কাজ শুরু করেছে আর তাকে মদত দিচ্ছে শহরের অন্য এক ব্যবসায়ী। সুরেশজি ওর প্রতি বিরক্ত। তাকে ঢুকতে দিতে চায় না। তাই নটবরকেই সে হাতে আনতে চায়। সে দেখেছে কাজের ক্ষেত্রে নটবরই কিশোরকে টেক্কা দিতে পারে।

কিছুদিন আগেই সুরেশ দেখেছে নটবরের এলেম। কেশবকে নিয়ে সুরেশ ওই জঙ্গলের মধ্যে সেবাব কয়েক ট্রাক কয়লা তুলেছিল। সে সব মাল ট্রাকে তুলে সময়মতো পাচার করে আনবে। কিন্তু এর মধ্যে নটবরও এসব সন্ধান রেখেছিল। সেও তার দলবল মায় চারখানা ট্রাক নিয়ে গিয়ে রাতের মধ্যে সেই সব তোলা কয়লা ওদের ট্রাকে তুলেই নিজে এনে অন্য সেই ব্যবসায়ীকে দিয়েছিল।

কিশোর বাহিনী বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু নটবরের বাহিনীর কাছে সুবিধা করতে পারেনি। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নটবরের বাহিনী বোমা-গুলির লড়াই করে কিশোরদের হটিয়ে দিয়ে মাল নিয়ে বের হয়ে এসেছিল।

সেই থেকেই আগরওয়ালও ভেবেছিল নটবরকেই তার দরকার। কিন্তু এবার নরেশই আসেন আগরওয়ালের কাছে। তিনি নাকি প্রধান আর নটবরের চেয়ে প্রতিপত্তি তাঁরই বেশি। তাই তাকেও কিছু টাকা দিতে হবে। তিনিই নটবরকে হটিয়ে নিজেই সুরেশজির সব কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেই ব্যবস্থা করে দেবেন।

সুরেশজি বলে,

—কিন্তু নটবর তো কাজের ছেলে। তার দলবলও আছে।

নরেশ বলেন,

—ওকে দল থেকে সরিয়ে দোব এবার ভোটে জিতেই, দলের বাইরে গেলে ওর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না।

নরেশ চান এবার ভোটে জিতেই নটবরকে হটিয়ে দিতে।

সুরেশ বলে,

—আমি ভি কথাটা ভেবে দেখেছি। আমি চাই কাজ — যে কাজ করতে পারবে তাকেই হামি রাখবে। মদত দিবে।

নরেশও এবার আরও অনেক কিছু পেতে চান। নটবরের লোকজনও রয়েছে এখানে। নটবর সুরেশজির অফিসে প্রায় আসে। আর নটবর এর মধ্যে সুরেশজির অফিসের দু-একজন চ্যালাকেও কিছু প্রণামি দিয়ে রেখেছে। নটবর জানে এ রাস্তায় একাই সব খেলে চলে না। ভাগ দিতে হয়, সবাইকে খুশি রাখতে হয়।

সে তাই খবর নেবার জন্য নেটওয়ার্ক করে রেখেছে। তারাই খবর দেয়।

—নরেশবাবুও শেঠজির কাছে এসেছিলেন।

নটবর অবাক হয়। আগরওয়ালজি যে গভীর জলের মাছ তা জানে সে। সে কিশোর-নটবরকে বাজিয়ে নিতে চায়। তারপর কাকে রাখবে সে ঠিক করবে। এর মধ্যে নরেশও এসেছেন। আর নিশ্চয়ই তার মতলবটাও জানিয়েছেন শেঠজিকে।

এবার সব শুনে নটবর চটে ওঠে। নরেশবাবুকে সেইই গদিতে বসিয়েছিল। তার ধারণা ছিল নরেশবাবু একদিন তাকে গদি ছেড়ে দেবেন। নটবরও এবার বুঝেছে যে নরেশবাবুকে সে গদিতে বসিয়েছিল সেই নরেশবাবুই গদির লোভে তাকে শেষ করতে চান। নটবরের সব স্বপ্নকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চান ওই নরেশবাবু।

ওদিকে ভোটের বাজারও জমে উঠেছে। এবার কিশোরও প্রচুর খরচ করছে। ঘটা করে মিটিং করছে, মিছিলেও তার লোকজনের অভাব হয় না। প্রচারও তার চলছে পাল্লা দিয়েই।

নটবর অবশ্য নরেশের প্রচারে ঠিকমতোই আসছে। সেদিন নরেশদার মিটিং-এ দারুণ ভাষণও দিয়েছে। নরেশদাকে জয়ী করে এই অঞ্চলের রূপ বদলে দেবার জন্য আবেদনও জানায়।

নটবর বলে,

—উন্নয়নের জোয়ার আনবেন ওই নরেশদাই। ভগীরথ যেমন গঙ্গাকে এনেছিল এদেশের মাটিতে। নরেশদাই এ যুগের নতুন ভগীরথ। উনিই এখানে সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি-উন্নয়নকে নিয়ে এসেছেন।

চড়চড় শব্দে হাততালি পড়ে। অবশ্য নটবরকে ভাষণ শেষ করে বের হতে হয়। আজ জঙ্গলে তার দলবল কয়লা তোলার কাজে ব্যস্ত। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে—এ সময় ওদিকে কেউ যায় না। যায় এই রাতের অন্ধকারে শিকারির দল। নরেশ সেদিন গেছেন আসানসোল। এখন সুরেশ আগরওয়ালের কাছে প্রায়ই যান। ভোটের খরচ-খরচা বাবদ মোটা টাকা ডোনেশন দেবে বলেছেন সুরেশবাবু।

কিন্তু আগরওয়ালজি হঠাৎ কী জরুরি কাজে কোন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। কখন ফিরবে তার কিছু ঠিকঠিকানা নেই। তবু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরিয়ে আসেন। রাত নটার ট্রেন ধরে এসে নেমেছে স্টেশনে। শেষ বাস তখন ছাড়ার জন্য স্টার্ট নিচ্ছে। নরেশ এসে ওই বাসে ওঠেন। তবু বাস স্টপেজ অবধি পৌঁছাতে পারলে ওখানে নেমে বাকি চার কিলোমিটার পথ কোনোরকমে চলে যাবেন।

নন্দবাবু এখন আর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নেই। গদি হারিয়ে বেশ মুষড়ে পড়েছিলেন তিনি। তবে ওঁর অবস্থা ভালোই আর কিশোর এবার নিজেই মাথা তুলেছে নিজের চেষ্টাতে। এখন ভালো রোজগার করছে। এবার ভোটে তার দলবলও বেশ খানিকটা

জমি পেয়েছে পায়ের নীচে। কারণ ক-বার নরেশবাবুর দল ভোটে জিতেও বিশেষ কোনও কাজ করেনি। নরেশও বদলে গেছেন। অবশ্য বনে গেলে সব বিড়ালই বনবিড়াল হয়ে যায়। ভোটে জিতে গদি পাওয়ার পর মানুষও বদলে যায়। জনগণের জন্য নয়—গদিতে বসে তখন জনসেবার কাজ শিকেয় তুলে রেখে দলসেবা আর আত্মসেবাই করে থাকে।

নরেশও তাই করেছে। ফলে সাধারণ মানুষ একটা পরিবর্তন চায়, আর কিশোরও সেই হাওয়াটাকে তার পালে লাগিয়ে এবার ভোটের যুদ্ধে জয়ী হতে চায়। সন্ধ্যার পর ভোটের প্রচার থেকে ফিরেছে কিশোর। এখন সেও আশা রাখে তার দল এবার ভোটে জিতে ওই গদি পাবে। নন্দবাবু বলেন,

—দ্যাখ, যদি গদি ফিরে পাস। তবে নরেশও সহজে ছাড়বে না। ওদের দলের নটবর তো এসব বিদ্যেয় ওস্তাদের। ওকেই তখন চটালি, দ্যাখ এখন যদি কিছু করতে পারিস।

নরেশ রাস্তা দিয়ে একলাই হেঁটে হেঁটে ফিরছেন। তিনি জানেন বড় কিছু পেতে গেলে এরকম একটু হাঁটাহাঁটি করতেই হবে। উনিও শুধু প্রধান হয়ে কাটাবেন না। বরং সুরেশজির সাথে হাত মিলিয়ে এবার নিজের ভাগ্য বাজিয়ে নেবেন নরেশ।

রাত হয়েছে। জঙ্গলের মুখে তাদের বাসস্ট্যান্ড। এখান থেকে তাদের গ্রাম কিছুটা দূরে। কিছুটা জঙ্গল পার হয়ে একটা ডোবার ওদিকে তার গ্রাম। চার কিলোমিটার পথ। বৃষ্টির রাত, দোকানপাট সব বন্ধ। শীত-শীত করছে। তাই লোকজনও তেমন নেই। অন্য সময় দু-একটা রিকশাওয়ালাও থাকে। কিন্তু আজ তারাও নেই। বাড়িতেও বলা নেই। তাই লোকজনও আসেনি।

তবে এই পথ নরেশের হাতের তালুর মতো চেনা, পথ দিয়ে দু-একটা মালবোঝাই ট্রাক হেডলাইট জ্বালিয়ে ছুটে চলেছে বনের গাছগাছালির বুকে আলোর তুফান তুলে। ওদিকের মোরাম ঢালা পথ দিয়ে চলেছে নরেশ। সঙ্গে একটা টর্চও রয়েছে। তবে চারিদিকে জমাট অন্ধকারে টর্চের আলোর জোরটুকু বেশি বলে মনে হয় না। গাছ-পাতায় বৃষ্টির টুপটাপ ছন্দ ওঠে।

নরেশ ভেবেছিলেন বাসস্টপে কাউকে পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই হিম ঠান্ডার রাতে আজ কেউ নেই। এখন এদিকটাতে বন কম। কিন্তু এককালে ভালুক-বুনো শুয়োরের দেখা মিলত। ক্রমশ মানুষের লোভী কুঠারের আঘাতে আজ সব শেষ হয়ে গেছে। হঠাৎ বনের মধ্যে কীসের নড়াচড়ার শব্দ শুনে থমকে দাঁড়ালেন নরেশবাবু। টর্চের আলোটা ওদিকে ফেলতেই দেখেন বনের এদিক থেকে দু-তিনটে ছায়ামূর্তি এসে তাঁর উপরই লাফিয়ে পড়বে। ওদের একজনের হাতে একটা বড় চপার মতো। অন্যদের হাতে লাঠি-রড। আর কী অস্ত্র আছে কে জানে।

ওই চপারের আঘাতে ছিটকে পড়েন নরেশ। ওর মুখটা যেন খুব চেনাই মনে হয়। নরেশ কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন চিৎকার করে। তিনি ভাবতেও পারেননি যে ওই লোকটাই তাঁর এত চেনাজানা হয়ে এই রাতের অন্ধকারে তাকেই এইভাবে শেষ করে দেবে।

কিন্তু কোনও কথাই আর বলতে পারেন না নরেশ। তাঁর প্রাণহীন দেহটা নিমেষের মধ্যে বৃষ্টিভেজা রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে আর বৃষ্টির জমা জলটাও তাজা রক্তে লাল হয়ে ওঠে। ছায়ামূর্তিরা বনের মধ্যে হারিয়ে যায়।

নরেশের অবশ্য বাড়ি ফেরার কোনও ধরাবাঁধা সময় নেই। ওঁর স্ত্রীও স্বামীর জন্য উৎকণ্ঠিত হন। নরেশের ছেলে এখন বাইরের কোনও স্কুলের শিক্ষক। সে ওখানেই থাকে। মেয়েটারও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে এখন স্বামী-স্ত্রী। আর এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে পানুও রয়েছে। সে মামার সহকারী। পানু অবশ্য মামার সঙ্গে থেকে রাজনীতির অনেক গলিঘুঁজিও চিনে গেছে। সে এখন পঞ্চায়েত অফিসেই থাকে। সেখানে অনেকের অনেক কাজকর্ম থাকে। প্রধানের ভাগ্নে বলে জনগণ তাকে ধরেই কাজকর্ম করিয়ে নেয়। তার বদলে পানুরও কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটে।

পানুও জানে মামাবাবু এখন ভোটের ব্যাপারে অনেক জায়গায় যাতায়াত করছে। তাই হয়তো কোথাও আটকে গেছে। ওরাও এ নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। ওরাও খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার ঘরে শুয়ে পড়েছে। ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। তখন বৃষ্টিও কমে গেছে। মেঘমুক্ত আকাশ এবার সূর্য ওঠার প্রস্তুতি নিয়েছে।

হঠাৎ পানু ওদের দরজায় শব্দ হইচই শুনে জেগে ওঠে। হয়তো মামা ফিরেছে, লোকজনও এসে গেছে তার সঙ্গে। পানুকে দরজা খুলতে দেখে চাষিপাড়ার হারু পঞ্চু পচা তেলি আর কজন হইচই করে ওঠে।

—সব্বোনাশ হয়েছে গো পানু।

পানু বেশ আরাম করে মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। অসময়ে উঠে পড়তে হয়েছে তাই তার মেজাজও খাপ্পা। সে বলে,

—কী সব্বোনাশ হল যে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে চেল্লামিল্লি করছ?

হারু বলে,

—যা দেখলাম। ওরে বাবা রক্তে লাল হয়ে আছে মাটি।

পানু বলে,

—কার কী হয়েছে বলবে তো!

তেলি বলে,

—ভোরের বাসে খেতের আনাজ নিয়ে বাস রাস্তায় ফিরছি। দেখি ওই বনের ধারেই রাস্তার ওপর পড়ে আছে নরেশবাবুর লাশ।

—অ্যাঁ? এবার পানু চমকে ওঠে। হারু বলে,

—হ্যাঁ গো। কারা নরেশবাবুকে ওখানটাতে কুপিয়ে শেষ করে গেছে।

এবার নরেশবাবুর স্ত্রীর আর্তনাদে পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙে। সারা গ্রাম-আশপাশের গ্রামেও খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। এই এলাকায় এমন কাণ্ড এর আগে ঘটেনি। এসব এলাকার মানুষ এমনিতে শান্তিপ্রিয়। এখানের জমিগুলো ক্রমশ নিচু। বৃষ্টির জল উপর থেকে নীচের জমিতে স্বাভাবিক গতিতে নেমে আসে। চাষের সময় উপরের জমির জল অনেকে কেটে নেয় নীচের দিকে, এ নিয়েই বচসা হয়। গালমন্দও হয়। তবে ওই পর্যন্তই। সকলে মিলেমিশে শান্তিতে রয়েছে। এমনিতে চুরি-চামারির ঘটনাও কমই ঘটে। পাপপুণ্য বোধ—মানসিকতা এখনও রয়েছে, এই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে।

তাই তারা নরেশবাবুর এই ভাবে খুন হওয়াতে বিস্মিত হয়েছে। তারা এটাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারছে না। এর মধ্যে নটবরও বের হয়ে পড়েছে। সেই মোটরবাইক নিয়ে থানায় খবর দিয়ে আসে পুলিশকে, পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে। লাশটাকে সদরে

নিয়ে গিয়ে পোস্টমর্টেম করার পর নটবর ভ্যান চালিয়ে প্রথমে আনে। সারা গ্রামের মানুষ, আশপাশের গ্রামের মানুষও খবরটা পায়। নটবরই অক্লান্তভাবে এসব কিছুর আয়োজন করে। তার চোখের জল যেন পাথর হয়ে গেছে। সে বলে,

—হায় রে, আমার গুরুকে হারালাম। যারা আমার গুরুর এ দশা করেছে আমি তাদের ছাড়ব না।

নরেশের স্ত্রীকে নটবর বলে,

—ভয় নেই বউদি—নরেশদার খুনিদের আমি খুঁজে বের করবই, পুলিশের বড় সাহেবকে বলেছি। আর খবরের কাগজওয়ালাদের ডেকে এনেছি।

সন্ধ্যা নামছে। লাল মাটির প্রান্তরে একটা দিঘির ধারে নরেশের চিতা জ্বলে ওঠে। নটবর চিৎকার করে,

—নরেশদা অমর রহে।

জনতাও ওর চিৎকারে গলা মিলিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানায় তাদের প্রয়াত নেতাকে।

পরদিন হাটতলায় নটবর শোকসভার আয়োজন করেছে। সারা এলাকার মানুষকে এনেছে নটবরের দলবল। আজ নন্দীপুরের হাটতলায় সব বন্ধ। বিনয়বাবু, গ্রামের গণ্যমান্যরা অনেকেই এসেছে। কিশোর এখানে নেই। সে বাইরে গেছে। নন্দবাবুর শরীর ভালো যাচ্ছে না। উনি বের হতে পারেননি। ওই বিরাট জনসভায় বিনয়বাবু, ধরণীবাবু, পঞ্চায়েতের সভ্যরা অনেকেই নরেশবাবুর গুণগান করে শ্রদ্ধা জানায়। নটবরের তেজস্বী কণ্ঠে আজ অভিযোগ ফুটে ওঠে।

— যে এই এলাকার মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণই বিসর্জন দিল, তার খুনিদের ধরতেই হবে। পুলিশকে এই খুনের রহস্য ভেদ করতেই হবে।

জনতাও নটবরের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এবার শোভাযাত্রা করে আসে । তাদের স্মারক-পত্রও জমা দেয়।

নটবর পুলিশ মহলেও পরিচিত। ওই কয়লার গোপন ব্যবসার ফলে পুলিশের অনেক ছোট-বড় কর্তারা ওকে চেনে। নটবর তাদের যথাযোগ্য প্রণামিও ঠিকঠাক দেয়। নটবর এবার পুলিশকে বলে,

—তদন্ত শুরু করেছেন? কোনো সূত্র মিলল? আরে মশাই এ তো রাজনৈতিক হত্যা। নরেশদা তো এলাকার সাধারণ মানুষের ভালোর জন্য কাজ করেছেন। টাকাকড়ির জন্য এ খুন নয়। নরেশদাকে সরাতে পারলে যাতে তার অবর্তমানে গদি ফিরে পেতে পারে, বিরোধী পক্ষ তার জন্যই খুন করেছে। ওরা পথের কাঁটা সরাতে চেয়েছে। তাই সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে এই ভাবে। জনসাধারণের কাছে নটবর এবার গ্রামে গ্রামে এ কথাই প্রচার শুরু করে। নটবর ঘোষণা করে,

—তবে নরেশদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমি শেষ অবধি এই ভোটে দাঁড়াব। আর নরেশদার স্ত্রীকেও ভোটে দাঁড় করাব তাঁর শূন্য আসনে। ওই গদিতে বসাব তাঁকেই।

জনতাও নটবরের এ হেন আত্মত্যাগে মুগ্ধ হয়, হাততালি দেয়। কিন্তু নরেশবাবুর স্ত্রী আর ভোট-রাজনীতিতে যেতে চান না। তিনি অনেকদিন থেকেই দেখেছেন নরেশবাবুকে। লোকটা ঠিক পথে চলেনি। নিজের লোভও ছিল। নিজের আখের সে গুছিয়ে গিয়েছে। সংসারে অভাবও নেই। তাই নরেশের স্ত্রী বলেন,

—নটবর। আমি ওই নোংরা রাজনীতির খেলাতে নেই। সারাজীবন তোমার দাদাকে নিষেধই করেছি ওসব করতে। শোনেনি। তার জন্য বেঘোরে প্রাণই দিতে হল।

না করতে দেখে খুশিই নটবর। এবার নটবরকেই বলে,

—তুমিই তোমার দাদার বাকি কাজ করো নুটু। তাই তুমিই এবার প্রধান হবে। এ যেন বেদবাক্য। নটবরও এর মধ্যে দু-একটা মিটিং-এ বউদিকে নিয়ে গেছে।

আর সেখানেও নরেশের স্ত্রী বলেছে,

—আমার স্বামীর যোগ্য ছাত্র নটবর। আমি চাই নটবরই তার ফেলে যাওয়া কাজের ভার নিক। এলাকার মানুষের মঙ্গল করুক।

নটবর তার দলকেও এদিক-ওদিক ফিট করে রাখে। হাততালি এক সংক্রামক ব্যাপার। এদিক-ওদিক থেকে দু চারটে তালি বাজলেই অনেকেই তখন তালি বাজাবার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে বহুজনের হাততালিতে সভা মুখর হয়ে ওঠে।

নটবরও এবার নতুন করে ভোট অভিযানে বের হয়ে পড়ে। নরেশের ওই খুনের কিনারা এখনও হয়নি। তবে এর মধ্যে পুলিশ বেশ কয়েকবার নন্দবাবুর ওখানেও গেছে। আর সেই রাতে কিশোরবাবু কোথায় ছিল সে সব খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে।

কিশোর আশা করেছিল এবার ভোটে যেরকম খরচ করেছে আর তার পালে যে রকম হাওয়া তুলেছে তাতে সে নিজেই জিতবে বহু সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। এতদিন পর আবার গদি জিতবে সে। বেশ নিশ্চিন্তেই ছিল, হঠাৎ নরেশের খুন হয়ে যাবার পরই এলাকার মানুষও যেন বদলে গেছে। তাদের মনে একটা ধারণা নটবর সৃষ্টি করেছে যে এই খুনের জন্য দায়ী ওই কিশোর বাহিনী। গদির দখল পাবার জন্য তারাই কৌশলে সরিয়ে দিয়েছে নরেশকে।

আর পুলিশও এই কথারই গুরুত্ব দিয়ে অনুসন্ধান করছে। অঞ্চলের মানুষের মনে যেন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। নন্দবাবুও এবার বিপদে পড়ে। কিশোরকে সে ঠিকমতো বিশ্বাস করে না। কিশোর এখন এইসব দুনম্বরি কারবারিদের সঙ্গে মেলামেশা করে। কয়লার কাজেও জড়িত। তাই নন্দবাবু একান্তে কিশোরকে শুধোয়,

—হ্যাঁরে, সত্যি তুই নরেশের খুনের ব্যাপারে কিছু জানিস না? আমার কাছে লুকোসনি। ব্যাপারটাকে সামলে দিতে হবে। না হলে সর্বনাশ হতে পারে।

কিশোর বলে,

—না বাবা, বিশ্বাস করো। আমি ওদিন সুরেশজির ওখানেই ছিলাম। টাকাপয়সার হিসাব করতে। এসবের কিছুই জানি না। আমার মনে হয় কী জানো?

নন্দ বলে,

—কী?

—ইদানীং ওই নটবর-নরেশ দুজনে আলাদাভাবে ওই কারবারে নেমেছে। দুজনের মধ্যে ওই কারবারের বখরা নিয়েই কিছু হতে পারে।

নন্দবাবুও শুনেছেন কথাটা। এটা হতেও পারে।

কিন্তু তাঁর হাতে এসবের কোনো প্রমাণ নেই। তবে নটবরকে বাপছেলে দুজনেই চেনে ভালো করে। নটবরই ছিল তাদেরই হাতের পুতুল—ওদের টপকে নিজে কিছু পাবার জন্য নরেশের কাছে গিয়েছিল। আর নরেশও ওকে কোর্ট ছাড়েননি। তাই এটা করতে পারে নটবর।

কিন্তু নটবর তখন যেন শোকে বিহ্বল। নরেশদার প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য, এলাকার মানুষের মঙ্গলের জন্য তখন সে নিজেকে উৎসর্গ করেছে। ভোটের দিন সমাগত। কিশোরও হাল ছাড়েনি। সেও মিটিং-মিছিল করছে। সেও নটবরের কীর্তি-কাহিনি নিয়ে কিছু ঘটনাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু পাবলিকের সহানুভূতির সবটাই প্রায় ওই নটবরের দিকে। নটবর এর মধ্যে জমি তৈরি করে রেখেছিল। তার বহুদিনের আশা-স্বপ্নকে সে সঠিক করে তুলবেই। ওই গদিই তার ধ্যান-জ্ঞান।

নন্দবাবুর আমল থেকে সে ওই গদির স্বপ্ন দেখছে। নরেশবাবুর আমলেও সে চেয়েছিল ওটা। কিন্তু কেউ দেয়নি তাকে। তাই নটবর বহু কৌশলে এবার গদির দখল পাবে।

ভোটের দিন নটবর এদিকে-ওদিকে ঘুরছে। প্রতিটি বুথে তার লোকজন। এবার হঠাৎ কিশোরের পাল যেন ফুটো হয়ে গেছে। তার অবস্থা পালছেঁড়া নৌকার মতো। বেলা হতে না হতে ওর এজেন্টদের সব বার করে দেয় নটবরের লোক। তার দলের প্রধান কর্ণধার পচা লোহার একাই একশো। তার দলবলও কম নয়। পচার লোকজনই কিশোর বাহিনীকে বুখে দিয়ে নিজেরাই ভোট করায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে। নন্দবাবুর বাড়িতে স্তব্ধতা। কিশোরও বুঝেছে যে নরেশের হত্যাটাই তার কাছে সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠেছে। জনসাধারণও যেন এটাকে মেনে নিতে পারে না। ফলে ফল বার হতে দেখা যায় বিপুল ভোটে জিতেছে নটবরের দল। এগারোটা সভ্য পদের মধ্যে তার দলই পেয়েছে দশটা আর একটা পেয়েছেন নির্দল এক মাস্টারমশাই। কিশোরের দল কোনো সিটই পায়নি।

এবার রাতের আকাশ বিদীর্ণ করে বাজি-বোমা ফাটাতে থাকে। সেই সঙ্গে ওঠে নটবরের জয়ধ্বনি। নরেশবাবুর নতুন উত্তরাধিকারীর জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ভরে ওঠে। নটবরের গিন্নি বাসন্তী তখন বাবা রত্নেশ্বরের মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে আর্তনাদ করে,

—দয়া করো বাবা, তোমায় সোনার মুকুট গড়িয়ে দোব।

বাবা ন্যাড়া মাথায় যেন সোনার মুকুট পরার লোভেই এবার নটবরকে বিজয়ী করে দিয়েছে। খবরটা আসতে বাসন্তী এবার বাবার চরণে বার কয়েক মাথা কুটে উঠে পড়ে। এতগুলো বছর সেও অপেক্ষা করছিল, আজ যেন রাজ্যপাটই পেয়েছে বাবার বরে। নটবরের ছেলে দেখেছে তার বাবা-মায়ের এই ব্যাকুলতা। ভবেশের কাছে এটা বিচিত্র ঠেকে।

সে আজকালকার ছেলে—শহরে থেকে কলেজে পড়ে। সে শহরের মানুষের চাওয়াটা দেখেছে কিছু কিছু। তারা একটা বাড়ি-চাকরি, ভালো জামাকাপড় আর একটু নিশ্চিন্ত জীবনের সন্ধান পেলেই খুশি। ভবেশ মাকে ব্যাকুল হয়ে ঘরে ঢুকতে দেখে বলে,

—কী ব্যাপার মা!

বাসন্তী বলে,

—ওরে তুই জানিস না, তোর বাবা একেবারে সরকারি পদই পেয়ে গেছে। এবার প্রধান হবে।

ওদিকে বাজি ফাটছে। আকাশে-বাতাসে ভেসে আসে নটবরের জয়ধ্বনি।

ভবেশ বলে,

—ওঃ তোমরা পারো বটে। একটা সামান্য পদের জন্য খেপে গেলে তোমরা?

বাসন্তী চমকে ওঠে।

—বলিস কী রে? কত বড় পদ জানিস।

—আর জেনে কাজ নেই। কাল ভোরের বাসে আমাকে শহরে যেতে হবে। এগারোটায় ক্লাস—যাই, গোছগাছ করতে হবে।

বাসন্তী অবাক হয়।

—কী ছেলে গো?

নটবর আজ নিশ্চিন্ত হয়েছে। তার দলের লোকেদের এনেছে। একেবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তারা। পচা লোহার তার দলবল পরদিনই বিজয় মিছিলের আয়োজন করেছে। আর সেই আয়োজনও হয়েছে নটবরের পছন্দমতো। নটবর বলে,

—গাড়ি, মোটরবাইক এসব রাখবে না। গরিব মানুষের প্রতিনিধি আমি।

পচার দল একেবারে দিশি স্টাইলে এবার বিজয় মিছিল বের করেছে। গাড়ি, মোটরবাইক এসব কিছুই নেই। একটা গোরুর গাড়ির উপর একটা চেয়ারকে দড়ি দিয়ে বেঁধে বসানো হচ্ছে। সেটাকে ফুল দিয়ে সাজানো হচ্ছে একেবারে বাদশাহী ময়ূর সিংহাসনের মতো। বলদ দুটোকে সাজানো হয়েছে। গলায় ঘণ্টা, শিং-এ তেল মাখানো হয়েছে। আর সামনে ঢাকঢোল তাসাপার্টি এসব রয়েছে। আর রয়েছে অগণিত গুণমুগ্ধ জনতা। সামনেই রয়েছে পচা লোহার। তার দলবলও বোমা ফাটাচ্ছে আর উদ্দাম নাচ নাচছে। গোরুর গাড়ির উপর সিংহাসনে আরূঢ় নটবর। মাথায় আবির, গলায় মালা।

ওর দলবল এসে পড়েছে নন্দবাবুর বাড়ির সামনে। ওদের বাদ্যি-বাজনাও জোরে বেজে ওঠে। মুহুর্মুহু বোমা ফাটছে। আর চলছে তুমুল চিৎকার।

—এবার ভোটে জিতল কে? নটবর ভটচায আবার কে?

নন্দবাবু-কিশোরও ছাদ থেকে দেখে মাত্র। নন্দ বলে,

—ব্যাটা নটু এবার খুব কায়দা করে জিতেছে রে।

কিশোর বলে,

—তাই তো দেখছি। তবে ওকে এর জবাব দেব ঠিক সময়ে। আমাদের পিছনে ও পুলিশ লাগাল নিজে সাধু সেজে। ওর সাধুগিরির মুখোশ একদিন খুলে দেবই বাবা।

নন্দবাবু জবাব দেন না।

ওসব ভবিষ্যতের কথায় তাঁর বিশেষ আশা-ভরসা নেই। তিনি বর্তমানে যা দেখছেন তাতেই হতাশ হয়ে পড়েন।

ভবেশ অবশ্য ভোরের বাসে যাবার কথা বললেও যেতে পারেনি।

বাসন্তীও রাতে ঘুমোতে পারেনি। তার এতদিনের স্বপ্ন আজ সার্থক হয়েছে। নটবরও ব্যস্ত রয়েছে। বাসন্তী বলে ভবেশকে,

—আজকের দিনটা থেকে যা বাবা, ওরা তোর বাবার বিজয় মিছিল বের করবে। তোর বাবাও বলছিল—একদিন না হয় কলেজে কামাই করলি।

ভবেশ ওদের অনুরোধে থেকেই গিয়েছিল। আর যে দৃশ্য সে দেখেছে তার পর ওর মনে এসেছে বিরক্তিই। তুচ্ছ একটা জয়কে নিয়ে ওদের এই বাড়াবাড়ি দেখে ভবেশ বিরক্তই হয়েছিল।

পাড়া কাঁপিয়ে চলেছে ওই বিচিত্র শোভাযাত্রা।

সতীশ চাটুজ্যে অবশ্য সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতোই বিরাজ করতে জানে। এতদিন সে নন্দবাবু—কিশোরদের একেবারে ঘনিষ্ঠ হয়ে বিরাজ করছিল। সতীশ চাটুজ্যে বেশ কিছুদিন থেকেই দেখেছে হাওয়া এবার অন্যদিকে বইছে। আর নটবরই হবে এই এলাকার ভাবী কর্ণধার। সতীশ চাটুজ্যেও তাই ইতিমধ্যেই নটবরের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে।

এর মধ্যে এক অমাবস্যার পরেই ভোরে সতীশ অবারিতভাবে আসে নটবরের বাড়িতে, বাসন্তী ওকে খাতির করে বসায়। নটবর তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। এমনিতে সে রাত অবধি নানা কাজ-অকাজে ব্যস্ত থাকে। তাই তার উঠতেও দেরি হয়।

নটবর উঠতে এবার সতীশ লাল সুতোয় বাঁধা মাদুলিটা বের করে বলে,

—বাবা নুটু, তোমার জন্য কাল অমাবস্যার রাতে শ্মশানে বসে ক্রিয়া করে এই সর্বসিদ্ধ মার কবচ এনেছি বাবা। আজই স্নান করে সূর্যপ্রণাম করে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সূর্য সাক্ষী করে এই কবচ ধারণ করো, দেখবে সুফল পাবেই।

বাসন্তী বলে,

—তাই করো বাপু।

সেই-ই কবচ নেয় ভক্তিভরে। তারপর শুধায়,

—এর জন্য খরচ-খরচা?

সতীশ জিভ বের করে বলে,

—কী বলছ মা। নুটুর কল্যাণে এটুকু করব মা, তার জন্য খরচ।

নটবর গতরাতেই কয়লা পাচার করার কাজটা নিরাপদেই করেছে আর নগদ প্রায় হাজার তিরিশেক টাকা হাতে-হাতে লাভও পেয়েছে। সেই বান্ডিলগুলো ড্রয়ারেই রয়েছে। নটবর তার থেকে একটা নোট তুলে নেয়। সতীশের হাতে দিয়ে বলে,

—রাখুন এটুকু।

সতীশ দেখে একটা কড়কড়ে পাঁচশো টাকার গান্ধী-মার্কা নোট। সে একটু হতচকিত হয়ে যায়।

নটবর ততক্ষণে বাথরুমে চলে গেছে। সতীশও নোটটাকে পকেটে পুরে বলে বাসন্তীকে,

—চলি মা। দেখবে তুমি রাজরানি হবে, আমার কবচ কথা বলে।

সতীশ চাটুজ্যেও ওই শোভাযাত্রায় শামিল হয়েছে। গ্রামের পথে চলেছে শোভাযাত্রা। সতীশের মেয়ে পিয়ালী। পিয়ালীও দেখছে ওই বিচিত্র শোভাযাত্রা। বিনয়বাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে চলে গেল নটবরের বিজয় মিছিল।

পিয়ালী বলে,

—এটা শোভাযাত্রা না সং—, নুটুবাবু যেন কামান দেগেছেন, একটা পঞ্চায়েতের ভোটে জিতে এই কাণ্ড, আর কিছু হলে তখন কী করবে?

বিনয়বাবু শুনেছেন পিয়ালীর কথা।

বিনয়বাবুও দেখেছেন গ্রাম্য জীবনের এই লোভের জগৎকে। আগে এসব ছিল না। মানুষের মধ্যে ছিল একটা প্রীতির সম্পর্ক। জয়-পরাজয় নিয়ে এত মাতামাতি ছিল না। পঞ্চায়েতের উপর সরকার অনেক দায়িত্ব দিয়েছিল। ওরাই স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু যারা প্রশাসনকে চালাবে তাদের নিষ্ঠা-কর্মপরায়ণতার ব্যাপারটা যেন ক্রমশ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

একদল মূর্খ—স্বার্থপর—ক্ষমতালোভী মানুষ কৌশলে প্রশাসনকে দখল করে গণতন্ত্রকেই

বিদ্রূপ করতে শুরু করেছে। নটবর-নরেশ-নন্দবাবু-কিশোর এরা আজকের সমাজ চালাচ্ছে তাই সেই ক্ষমতার অপব্যবহারই ঘটেছে।

আজ পিয়ালীর মুখে বিনয়বাবু শোনেন সেই স্বার্থপরতার প্রতিবাদের কথা। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদেরও দেখেছেন বিনয়বাবু। তিনি আগের নন্দবাবু—নরেশদের দেখেছেন। তারা যেন ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে গেছে। তাই ওই সং সেজে বিজয় মিছিল করতে ওদের বাধে না। কিন্তু দেখেছেন বিনয়বাবু পিয়ালী এমনকী, নটবরের ছেলে ভবেশকেও। ভবেশও এটাকে ঠিক মেনে নিতে পারেনি।

সে বিরক্তিভরে সরে গেছে। বিনয়বাবু সেটা লক্ষ্য করে একটু খুশিই হন মনে-মনে। একটা প্রজন্ম ক্ষমতার লোভে মোহে অন্ধ হয়ে উঠলেও সেইটাই চরম কথা নয়। এবার আগামী প্রজন্মও সেটাকে মেনে নিতে পারছে না। তারা চায় সুস্থ সামাজিক পরিবেশ। তারা চায় এই পঞ্চায়েতের পরিচালনার ভার আসুক একালের কিছু যোগ্য লোকের হাতে। অযোগ্য-লোভী-স্বার্থপর শ্রেণির হাতে নয়। বিনয়বাবু নির্বাচনে বিশ্বাসী। তাঁরও মনে হয় ওই একটা শ্রেণির নোংরা খেলার দিনও ফুরোবে। যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা গ্রামকে সুখী ভবিষ্যৎ এনে দিতে পারে তারই সুষ্ঠু পরিচালনার ভার তুলে নেবে আগামী প্রজন্ম। এই সং সাজা লোভী মানুষদের দিন শেষ হবেই।

বিনয়বাবুরও মনে হয় স্বাধীনতার পরই একটা বিকৃত লোভী প্রজন্মের তৈরি হয়েছে। এটা চিরস্থায়ী হতে পারে না। আগামী প্রজন্ম এই গলা-পচা সমাজকে আবার নতুন করে গড়বে। তাদের পূর্বপুরুষদের ভুলগুলোকে নিশ্চয়ই শুধরে নেবে।

পিয়ালী বাড়ি ফিরছে, তখন এদিকটায় শান্তি নেমেছে। হঠাৎ ভবেশকে দেখে দাঁড়াল। পিয়ালীও চেনে ভবেশকে, ভবেশও। পিয়ালী বলে,

—আরে রাজপুত্তুর! তুমি এখানে? ওদিকে তোমাদের বিজয়রথ চলেছে। ভবেশ ওর কথায় চটে ওঠে না। ভবেশ ওই স্পষ্টবাদী মেয়েকে চেনে। ভবেশ বলে,

—ওসবে আমি নেই। বাবাকেও ওসব করতে নিষেধ করেছিলাম, ওরা শুনল না।

পিয়ালী বলে,

—সং সেজে বের হয়ে পড়ো।

ভবেশও কথাটা ভেবেছে। বাড়িতেও কথাটা বলেছিল। কিন্তু তার কথা শোনার মতো কেউ নেই বাড়িতে। আজ পিয়ালীকে তারই সুরে বলতে দেখে ভবেশ বলে,

—সত্যিই তাই। এরা এইসব নিয়েই মেতে আছে পিয়ালী। কিন্তু এই মানসিকতাকে আমি সমর্থন করি না। কী লাভ এসব করে? এতে সাধারণ মানুষের সমস্যার কোনো সমাধানই হবে না। এরা কোনো সমস্যার সমাধান করতে চায় না। সমাধান হলে এদের কাজও থাকবে না। তাই এরা চায় সমস্যা জিইয়ে রাখতে।

পিয়ালী দেখছে ভবেশকে। ও জানে ভবেশ তার বাবার এইসব কাজকে সমর্থন করে না।

ভবেশ বলে,

—ছাড়ো ওদের কথা। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

পিয়ালী বলে,

—চলছে। নেহাত বিনয়বাবুর দয়াতেই পড়ছি। দেখা যাক কতদূর এগোতে পারি।

ভবেশ বলে,

— দেখবে ঠিক স্কলারশিপ পাবেই। জীবনে যে যা চায়, পরিশ্রম করলে ঠিক তা পাবেই।

সন্ধ্যা নামছে বাগানে। পাখিদের কলরব ওঠে। পিয়ালী বলে,

—আমার বরাতটাই মন্দ ভবেশদা। তোমাদের মতো কপাল করে তো আসিনি যে ধুলো মুঠো ধরব সোনা হয়ে উঠবে। বরং সোনা বলে যা ধরি, দেখা যায় সেটা সোনা তো নয় শুধু ছাই।

ভবেশ বলে,

—আমি বরাতে বিশ্বাস করি না। নিজে যা পেতে চাই তা নিজে অর্জন করতে হবে। বাবার ওই লোভ-স্বার্থপরতাকে সমর্থন করি না। সমর্থন করব না। এমন সম্পদে আমার লোভ নেই।

পিয়ালী ভবেশকে দেখছে। ভবেশ বলে,

—তাই তোমার চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তার মিল খুঁজে পাই পিয়ালী। তোমার এই বাঁচার লড়াইকে আমি শ্রদ্ধা করি।

পিয়ালীও মাঝে মাঝে যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে। সে বলে,

—ভবেশদা মাঝে মাঝে মনে হয় আমি হেরে যাব।

ভবেশ বলে,

—না পিয়ালী। তুমি হার মানবে না। তোমার এই লড়াই-এর পাশে আমিও আছি। আমিও চাই কিছু করতে। আর দুঃখের কথা জানো—আমাদের প্রজন্ম সত্যিই দুর্ভাগা।

পিয়ালী ভবেশকে বলে,

—কেন?

—আগে সমাজে আদর্শবান, মেরুদণ্ড সোজা করে চলার মতো, পথ দেখাবার মতো মানুষ ছিলেন। স্বাধীনতার আগের যুগে দ্যাখো—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, গান্ধীজি, ডক্টর পি.সি. রায়, বিধানচন্দ্র রায় কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন এই বাংলাতেই। আমাদের সময় একটা মানুষের নাম করতে পার যিনি এদের মাপের দেশপ্রেমী-স্রষ্টা-ঋষিতুল্য। কেউ নেই—আমাদের নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। এ বড় কঠিন কাজ। তবু করতে হবে।

পিয়ালী বলে,

—এ যে আমাদের বিনয় স্যারের মতো কথা বলছ!

—বিনয় স্যার ঠিকই বলেন। উনিই তবু সমাজের কথা, মানুষের কথা ভাবেন, তোমার সৌভাগ্য যে ওর আশ্রয় পেয়েছ। তাই মনে হয় তুমি হার মানবে না।

ওরা কথা বলছে। সন্ধ্যার আকাশে একফালি চাঁদের আলো দেখা যায়। বাগানে পাখিদের যাত্রার আসর ভেঙেছে। মাধব কবিরাজের মেয়ে মালতী গিয়েছিল নন্দবাবুর বাড়িতে। কিশোরের মেয়েকে সে পড়ায়। অবশ্য মালতী নিজে মাধ্যমিকে ব্যাক পেয়েছে। নিজের কথা সে ভাবে না। পড়াশোনাতে তার মন তেমন নেই। মাঝে মাঝে হারমোনিয়াম নিয়ে সে বসে। কিন্তু এখানে গানের সমঝদারও কেউ নেই। তাই গানও ভালো লাগে না। তবে ওই কিশোর-এর বাচ্চা মেয়েকে অ-আ-ক-খ পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গানটাও শেখায়।

মালতীও ফিরছে, হঠাৎ বাগানে তন্ময় হয়ে ঘাটের ধারে ভবেশ আর পিয়ালীকে বসে থাকতে দেখে অবাক হয় সে। ভবেশকেও চেনে মালতী। একই গ্রামে সে তাদের ছেলেবেলা থেকেই দেখছে। আর পিয়ালীকে তো মালতী রীতিমতো হিংসে করে। বিনয় স্যার ওকেই বেশি করে নম্বর দেয়। মালতী ভালো উত্তর লেখার পরও খাতায় কেবল শূন্যই দেয়।

আর সেজন্য পিয়ালীর উপর মালতীর একটা রাগই রয়েছে। আর আজ যা দেখেছে তাতে আশ্চর্য হয়েছে মালতী। পিয়ালীকে সত্যিই খুব হিসাবি একথাই মনে হয় তার।

মালতী ওদের দেখছে। আজ মনে হয় সে যেন পিয়ালীর কাছে হেরে গেছে নিদারুণ ভাবে। ওই ভবেশকে সে চেনে। কিন্তু ভবেশকে সে হাতে আনতে পারেনি। সেখানে তার আগেকার ওই পিয়ালীই তার দখল সাব্যস্ত করেছে।

সরে আসে মালতী। এবার সেও চেষ্টা করবে পিয়ালীকে আঘাত হানার। পিয়ালীর কাছে সে হার মানবে না। মাধব কবরেজও দেখছে গ্রামে রাজ্যপাটে এবার নতুন পরিবর্তন এসেছে, জগতের সব কিছুই বদলায়, কোনোকিছুই স্থির হয়ে আটকে থাকে না। একদিন নন্দবাবুদের প্রাধান্য ছিল। মাধব কবরেজের জীবনেও সুদিন ছিল। তখন নন্দবাবুর সাথে মাধব কবরেজের একটা যোগাযোগও ছিল। হাটতলার মাঠে কবরেজের চেম্বারে তখন লোকজন, রোগীদের ভিড় লেগে থাকত।

তারপর নন্দবাবুর আমলেই গ্রামে সরকারি ডাক্তারখানা হল। মাধব কবরেজ অবশ্য এই সিধান্তে খুশি হয়নি। সরকারি ডাক্তারখানায় পাস করা ডাক্তার বসবে। রোগীরা বিনা পয়সায় ডাক্তার পাবে। ওষুধ পাবে। তার কাছে আর কেউ আসবে না। আর তার কবিরাজি ওষুধও অচল হয়ে যাবে।

নন্দবাবু বলেন,

—আরে ঘাবড়াচ্ছ কেন মাধব, হাজার ডাক্তারেও তোমার কবিরাজি বন্ধ হবে না।

গ্রামের বাইরে দত্তরা বিঘে পাঁচেক মাঠও দান করল। সেখানে গড়ে উঠল ডাক্তারখানা। কোয়ার্টার, রোগীদের থাকার জায়গা। সারা এলাকার মানুষও স্বপ্ন দেখে এবার তারা ওষুধ পাবে। ডাক্তারকেও দেখাতে পারবে, এতদিন হাতুড়ে ডাক্তার আর ওই মাধব কবরেজের দাওয়াই ছিল ভরসা। এবার দিন বদলাবে। নন্দবাবু তখন নিজের নাম-ডাক বাড়াবার জন্যই ব্যস্ত। হাসপাতাল হবে তাঁর জন্যই—তিনি মন্ত্রীদেরও নিয়ে এসে ঘটা করে উদ্বোধন করেন গ্রামীণ হাসপাতালের।

খবরের কাগজেও ছবি ছাপা হয় নন্দবাবুর। দেশের মানুষের জন্য উনি নিজেকে উৎসর্গ করেছেন বলেই প্রচার করা হল। হাসপাতাল চালু হয়ে গেল।

তার জন্য নন্দবাবু সারা দেশের মানুষের কাছে গিয়ে টাকাও তোলেন, সরকার থেকেও বেশ কিছু টাকা পাওয়া গেল। এলাকার মানুষ ওই ডাক্তারখানা তৈরি হবার মুখে দু-হাত ভরে ভোট দিল নন্দবাবুকেই। ওই হাসপাতাল কিন্তু কয়েকমাস পরই কেমন বসে পড়ল। ডাক্তারবাবুও আর আসেন না। এতদিন প্রথমে আউটডোর চালু হয়েছিল। তাতেই আবার ভোটে জিতলেন নন্দবাবু।

কিন্তু ভোটের পর আর ইনডোর চালু হল না। কারণ টাকা ঠিকমতো নাকি আসছে না। তবু টাকার জন্য চেষ্টা চলছে। তারপর ডাক্তারবাবুও আর এলেন না। একজন

কম্পাউন্ডার রোগী দেখেন, আর ওষুধপত্র কিছুই নেই। বাইরে থেকেই ওষুধপত্র কিনতে হয় রোগীদের।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন সেটাও বন্ধ হয়ে গেল। রোগীরা তবু আসে, দিনভর বসে থেকে ফিরে যায়। অনেকেই যায় মাধব কবরেজের কাছে—মাধবও বেশ দু-পয়সা রোজগার শুরু করে। ওদিকে হাতুড়ে সুকুমার ডাক্তারও আবার তার ডাক্তারি জোরকদমে চালু করেছে।

মাধবও খুশি, নন্দবাবু বলেন,

—কী গো মাধব। বলিনি তোমাদের কারবার ঠিকই চলবে। দেখলে তো। মাধব অবশ্য এখন রোজই সন্ধ্যায় যায় নন্দবাবুর ওখানে। ওদের দাবার আসর ঠিকমতো বসে। ওদিকে ডাক্তারখানার বাড়িগুলো এখন ভূতের বাড়ির মতোই পরিত্যক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা-জানলাগুলোও কারা এর মধ্যে খুলে নিয়ে গেছে।

এখন প্রাচীরের ইটগুলোও গেছে। এবার বাড়িটাকেই ভেঙে ইটগুলো নেবার চেষ্টা চলছে।

নরেশবাবু অবশ্য প্রায়ই বলতেন,

—স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে নতুন করে গড়া হবে। আমি কলকাতায় কর্তাদেরও বলেছি টাকা স্যাংশন হলেই বাড়ি মেরামত করে ডাক্তারখানা চালু হবে। ওইসব কাজের ফিরিস্তি দেখিয়েই ভোটের সময় নানা আশার কথাও শোনাতেন আবার ভোটের পর চুপচাপই হয়ে যেত।

এখনও সেই ভাবেই চলছে। মাধব সেদিন রাতে বাড়ি ফিরছে। এখনও সে নন্দবাবুর ওখানে যায়। দাবা খেলতে আজও গিয়েছিল। নন্দবাবুর মনমেজাজ ভালো নেই কদিন। কিশোর ভোটে জিতবে ভেবেছিল। কিন্তু তাও হয়নি।

নন্দ বলে,

—মাধব, মনমেজাজ ভালো নেই হে। খেলাটা ঠিক জমছে না।

মাধব বলে,

—ব্যাটা নটবর দেখছি এবার বাজিমাত করল। ব্যাটা কি কম ঘোড়েল। নরেশবাবুকে নাকি ওই-ই সাফ করেছে। এখন তা বোঝা যাচ্ছে।

নন্দ বলে,

—ওসব তোমাদের কথা। পুলিশ তো এসব বিশ্বাসই করে না। পুলিশ বলে ওসব নাকি আমরাই করেছি।

মাধর বলে,

—তাতে লাভ হল কার? নুটুর লাভের জন্য কি তোমরা এসব করছ। ওসব বাজে কথা ছাড়ো তো নাও—বসো।

দাবার ছক সাজাচ্ছে। এমন সময় ওই বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে আসে নুটুর ওই মিছিল। নুটু দু-হাত তুলে জনতাকে নমস্কার করছে। আর পচার দল তখন বোমা ফাটাচ্ছে আর নৃত্য করছে। একটু বেশি সময় ধরেই এখানে নাচন-কোঁদন করে তারা চলে যায়। যেন নন্দের বুকের উপরই তারা নেচে গেল।

নন্দ বলেন,

—আজ থাক মাধব। আজ আর খেলা জমবে না।

মাধবও হতাশ হয়েই বের হয়ে আসে। মাধব বাড়ি ফিরছে। মালতীও এসে গেছে। মালতীর মনমেজাজও ভালো নেই। তার চোখের উপর ভাসছে বাগানে পিয়ালী আর ভবেশের সেই ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের দৃশ্যটা।

মালতী যেন হেরে গেছে। বাবাকে ঢুকতে দেখে চাইল। মাধব বলে,

—নুটু যেন ধরাকে সরা দেখছে ভোটে জিতে।

মালতীও একটা পথের সন্ধান করতে শুরু করে, যে পথটা তাকে ভবেশের কাছে পৌঁছে দেবে। আর মালতী নিজেই সেই পথ বের করে নেয়। নটবরের বাড়িতে তখন অনেকেই আসছে নটবরকে শুভেচ্ছা জানাতে।

মালতীও আসে নটবরের বাড়িতে। নটবর একটা চেয়ারে বসে আছে। ঘরে রয়েছে নটবর গুণমুগ্ধ অনেকেই। মালতী এসে নটবরকে প্রণাম করে।

নটবর দেখছে মালতীকে।

—মানু না?

মাধব কবরেজ অবশ্য আসেনি। সে নন্দবাবুর ভক্ত। মালতী তা জানে। তাই বলে,

—আপনি জিতেছেন, বাবা খুব খুশি হয়েছে। ওর শরীরটা ভালো নেই। আমাকেই পাঠাল,

নটবরও খুশি হয়। সে ভেবেছে তার দলেও এবার মাধব কবরেজও এসেছে।

নটবর বলে,

—যাও ভিতরে যাও। তোমার কাকিমার সঙ্গে দেখা করে যেও।

নটবরের বাড়িতে উৎসব। যে আসছে তার জন্য জলযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। ওদিকে বারান্দায় ছেলেমেয়েরা জলযোগ করছে।

মালতী ওদিকে যায় না। সে জানে ভবেশের ঘরটা বাড়ির এক কোণে। এদিকে অতিথিদের নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে বাসন্তী, বাড়ির কাজের লোকরা। মালতী এই ফাঁকে পিছনে বাগানের পাশে ভবেশের ঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

ভবেশ আজ শহরে চলে যাবে। হঠাৎ মালতীকে দেখে অবাক হয়।

—কী ব্যাপার? বাবার কাছে এসেছিলে? ভবেশ বলে, মালতী ওর ডাগর চোখে সাড়া তুলে নিজেকে আরও মোহময়ী করে বলে,

—না গো। যদি বলি তোমার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। মন কেমন করছিল। তাই একটা ছুতো খুঁজে চলে এলাম এখানে।

ভবেশ বলে,

—বাঃ বেশ কথা বলতে পারো দেখছি।

—আমি আর কী কথা জানি বলো? পিয়ালী তো পড়াশোনায় ভালো। স্কুলে ভাষণ দেয়। কবিতা পড়ে, কথা বলতে জানে ও।

ভবেশ মালতীকে দেখছে। তার মনে হয় মালতী পিয়ালীকে দেখতে পারে না। তাই একটা অভিযোগ করে পিয়ালীর বিরুদ্ধে।

ভবেশ বলে,

—ওকে দেখতে পারো না তুমি? কিন্তু তুমিও তো পিয়ালীর মতো লেখাপড়া শিখতে পারো। মাধ্যমিকে ব্যাক পেয়েছ, আবার পরীক্ষা দাও।

—তাই তো দিচ্ছি। এবার পাস করলে কলেজেই পড়তে যাব।

—এখন মেয়েরা পড়াশোনা করছে। কাজকর্ম করছে।

মালতী বলে,

—তাই এলাম। শহরে যদি যাই পড়াশোনা করতে, তবু তুমি রয়েছ এই ভরসা।

মালতীও স্বপ্ন দেখে, ভবেশ বলে,

—পাস করো। তাবপর কথা হবে। আজ হোস্টেলে ফিরে যাচ্ছি।

মালতী বলে,

—কবে আবার আসবে?

ভবেশ বিরক্তি প্রকাশ করে জানায়,

—মাসখানেক পর।

কিন্তু মালতী জানে সহজে কাজ না হলে একটু অন্যপথ নিতে হয়। তাই মালতী বলে,

—ঠিক আছে তা হলে পরেই আসব। তুমি তো ইংরেজিতে ভালো। আমাকে ইংরেজিটা একটু দেখিয়ে দিতে হবে।

ভবেশ বলে,

—ফিরে আসি, এখন তো ব্যস্ত।

মালতী উঠে পড়ে। মালতী বের হয়ে যায়। ভবেশও নিশ্চিন্ত হয়। মেয়েটা আচমকা ঘরে ঢুকে যেভাবে কথাবার্তা শুরু করেছিল ভবেশ তাতে মোটেই খুশি হয়নি।

মালতী অবশ্য হাল ছাড়েনি। ও জানে ভবেশকে হাতে আনতে পারলে তার ভবিষ্যৎও বদলে যাবে। তাই সে এবার বাসন্তীর কাছে গিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে। বাসন্তী তখন অতিথিদের জলখাবার নিয়ে ব্যস্ত। আজ সেও খুশি।

এসব হয়েছে বাবা রত্নেশ্বরের দয়াতেই। তাই সকালে বাবার মাথায় জল ঢেলে বাসন্তী এবার বাড়ির কাজের তদারক শুরু করেছে।

মালতীকে দেখে বলে,

—আয় মানু। তোর বাবা এল না?

মালতী এখানেও একটা মিথ্যে কথা বলে সহজেই। বলে,

—বাবা ভিনগাঁয়ে রুগী দেখতে গেছে। আমাকেই বলে গেল তোর কাকা-কাকিমাকে প্রণাম করে আয়।

ওদিকে লোকজন খেতে বসেছে।

মালতী এবার বাসন্তীকে অবাক করে নিজেই বারান্দায় বসা অতিথিদের লুচি আলুর দম পরিবেশন করতে শুরু করে। বাসন্তীও খুশি হয়। ভবেশ বের হয়ে এসেছে। ভেবেছিল মালতী চলে গেছে। কিন্তু দেখে মালতী ওই দিকে তখন লুচির ঝুড়ি, আলুর দমের বালতি নিয়ে এবাড়িরই একজন হয়ে অতিথি সৎকারের কাজে লেগেছে।

পুরো ব্যাপারটাই ভবেশের ভালো লাগে না। তার বাবা-মা-মালতী-ওই পচা লোহার আরও অনেকের একটা নিজ নিজ স্বার্থ রয়েছে। সেই স্বার্থের জন্য তারা এক হয়ে

কাজ করছে। আর তাদের স্বার্থ ফুরোলেই এদের সব মুখোশ খুলে পড়বে। আসল রূপটা বের হয়ে পড়বে।

নটবরবাবু এবার শুভদিন দেখে গদিতে বসলেন। এর মধ্যে কমিটিও ঠিক হয়ে গেছে। নটবরবাবু এবার পাকাপাকিভাবেই গয়ারাম হলেন। এবার তাঁর ভাষণে অনেক আশার বাণী ফুটে ওঠে। তার প্রথম কাজ হবে এখানের ওই হাসপাতালকে নতুন করে তৈরি করা।

পুলিশও প্রথম দিকে নরেশবাবুর খুনের তদন্ত নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করেছিল। নটবর প্রধান হয়ে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। সেখানে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানায় সুরেশ আগরওয়ালকেও।

সুরেশজি এখন ওই রানিগঞ্জ-আসানসোলের রাজত্ব ছাড়াও ওদিকে নতুন রাজ্যপাট শুরু করেছে। আর এখন সুরেশজির দরকার নটবরবাবুকেও। এদিকে অরণ্য অঞ্চলে রাতের অন্ধকারে একটা নতুন কাজ চলে। কয়েকশো মানুষ ছায়ামূর্তির মতো মাটির তলা থেকে কয়লা তোলে। পুলিশ-বনবিভাগের লোকেরাও সব জানে। ভোরের মধ্যেই তাদের কাজ শেষ হয়ে যায়। ট্রাক ডাম্পারগুলোও চলে যায় লাখ টাকার মাল নিয়ে।

আর তার থেকেই বেশ কিছুটা এদের পকেটে আসে। দিয়ে থুয়ে যা থাকে সেটাও কম নয়। এবার সুরেশজিও চায় এখানকার কারবারের ভিত আরও শক্ত করতে। তাই সেও এসেছে দামি গাড়ি হাঁকিয়ে।

নটবর জেলার বেশ কয়েকজন নেতাকেও এনেছে। এসেছে অনেক অফিসার। আজ সে ঘোষণা করে,

—আমি স্কুলের উন্নতির জন্য, হাসপাতাল গড়ার জন্য এম-পি সাহেবকেও অনুরোধ করেছি। তিনি টাকা দেবেন আর শিল্পপতি শ্রী সুরেশজিও কথা দিয়েছেন তিনিও টাকা দেবেন। আমরা হাসপাতাল গড়বই। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পানীয় জলের ব্যবস্থাও করবই।

জনতাও এবার অনেক স্বপ্ন দেখছে। সুরেশজিও আশা করে এখানে সেও কিছু রোজগার করতে পারবে।

নটবর এক-এক করে তার বিশ্বস্ত লোককে লাগিয়ে রাখে। সুরেশজির ওই রাতের কাজটার প্রধান কাজগুলো করে সুরেশজির নিজের বিশেষ লোকরাই। তারাই কয়লার সন্ধান করে। আর সেই সঙ্গে নটবরের দোসর পচা লোহার তার লোকজনকে দিয়েও মাল ট্রাকে তোলার কাজ করে দেয়। এতে পচারও ভালোই লাভ থাকে।

পচা লোহার কয়েক বছর মাত্র নটবরের সঙ্গে এসেছে। নটবর তখন নরেশের দলে সবে যোগ দিয়েছে। তখন পচা ভরা যৌবনের মরদ। ওর বাবা কালো লোহার গ্রামের বামুনদের কিছু জমি ভাগচাষ করত, দুটো আধমরা বলদ নিয়ে পচাও বাবার সঙ্গে মাঝে মধ্যে মাঠে কাজ করত। কিন্তু আয়পয় তেমন ছিল না। পচা ছেলেবেলা থেকেই বেশ ডাঁটো চেহারার। দেহে শক্তিও আছে আর সাহস। পচা মাঝে মাঝে রাতের অন্ধকারে দু-চারজন সঙ্গীকে নিয়ে বের হত। বড় রাস্তায় ট্রাক থামিয়ে লুঠপাঠও করত। আর মালপত্র যা পেত, সে সব কেনার লোকও তৈরি থাকত বড়জোড়ায়। একরাতে কাজ ঠিকমতো করতে পারলে ভালোই রোজগার হয়।

কালু বলত পচাকে।

—উসব পাপ কাজে যাস না। চোরের দশদিন গেরস্থের একদিন। ধরা পড়লে ফাটকে যেতে হবে। তার চেয়ে চাষবাস করছিস তাই কর। আমি বরং মুখুজ্যেদের জমি আরও বিঘে দশেক ভাগে নিই। আরও বাগিয়ে চাষ কর।

পচা তখন ওই রাতের কাজে হাত পাকিয়েছে কয়েকটা বাড়িতে ডাকাতি করে। কয়েক হাজার টাকাও রোজগার করে.... ঘরের মেঝেতে হাঁড়িতে পুঁতে রেখেছে। সেবার এক রাতে পচা বড় রাস্তার বাইরে জঙ্গলে ওঁত পেতে আছে। তার কাছে খবর আছে যে সরকারি গুদাম থেকে কয়েক ব্যারেল কেরোসিন তেল যাবে। তখন কেরোসিন তেলের দামও অনেক। মহাজনও তেলের জন্য খোঁজ-খবর করছে। পচাকে সেই ওই খবর দিয়ে বলে,

—ওই মাল নিয়ে আয়, তোর দিন বদলে যাবে।

পচার দলবলের এই হানার খবর সদরেও পৌঁছে গেছে। ট্রাক অ্যাসোসিয়েশনের লোকজনও চেষ্টা করছে দোষীদের ধরার জন্য। পুলিশও কিছুদিন ধরে রাত দুপুরে মাঝে মাঝে বনের পথে পেট্রল দিচ্ছে। সেদিনও তারা ঘুরছে। অবশ্য পচা তেমন কোনো খবর পায়নি। পুলিশ প্লেন ড্রেসেই সাধারণ গাড়ি নিয়েই ঘোরাঘুরি করায় পচার দল টের পায়নি। তারাও তৈরি হয়ে আছে। পথের উপর বড় বড় পাথর সাজিয়ে রেখেছে—যাতে গাড়ি থামাতে হবে।

তারা নেমে পাথর সরাতে যাবে তখনই এরা ঝাঁপিয়ে পড়বে। ওই ট্রাক নিয়েই পালাবে তারা। ব্যারেলগুলো জঙ্গলের অন্যত্র নামিয়ে রেখে সেই গাড়িটাকে দূরে কোথাও ফেলে আসবে। সেই ফাঁকে মহাজনের লোক মাল ঠিকানায় পৌঁছে দেবে। পাঁচুর দলবল ট্রাকটাকে থামতে দেখেই বন থেকে বের হয়ে এসে হানা দিয়েছে আর পুলিশও বনের মধ্যে তাদের উপর নজর রেখেছিল। ওরাও ঘিরে ফেলে এদের। পচা ভাবতে পারেনি যে এইভাবে ধরা পড়ে যাবে তারা। সে তখন ওই রাতের অন্ধকারে রাস্তা থেকে বনের মধ্যে খাদে লাফ দিয়ে পড়ে। পুলিশও দেখেছে তাকে। তারা গুলি চালায়।

কিন্তু পচা তখন অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে কোনো মতে দৌড়ে পালিয়েছে। অবশ্য পচা সরে পড়লেও দলের অন্যরা ধরা পড়ে। আর পুলিশের জেরার মুখে ওরাও স্বীকার করে যে পচাও তাদের দলে ছিল।

পুলিশও পচার বাড়িতে হানা দেয় পচার সন্ধানে। পচা আর বাড়ি ফেরেনি। পচার বাবা কালো লোহার এসব খবর শুনে বলে,

—শালাকে ধরে জেলে দ্যান গো। উ শালা চোরকে আমি ঘরে লিব নাই।

কিন্তু পচা তখন জঙ্গলের মধ্যে ছোট একটা গ্রামে লুকিয়েছে। সেও বুঝেছে তার একটা আশ্রয়ের দরকার। সেও এবার তাই নরেশদার সঙ্গেই যোগাযোগ করে। নটবর তখন নরেশের সহকারী। সেও এবার ওই নন্দবাবুদের উৎখাত করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে। নরেশবাবুকেও নটবর বলে,

—দলে কিছু লড়াকু কর্মী চাই। না হলে দলের কাজ ঠিকমতো করা যাবে না।

নরেশও সেটা জানতেন। অ্যাদ্দিন ইউনিয়নবাজি করে এসেছেন যে পেশিশক্তি ছাড়া কিছুই করা যাবে না। তাই বলেন,

—তা তো বুঝলাম। কিন্তু তেমন ছেলে কোথায়?

নটবর বলে,

—আছে, সেরকম বেশ কিছু ছেলেই আছে।

তারপরই পচার নামটা করে। অবশ্য নরেশবাবু বলেছিল

—ওটা তো ক্রিমিনাল। ডাকাতির আসামী, পুলিশ ওকে খুঁজছে।

—আরে দাদা! ওরা তেমন কিছু পায়নি বলেই এসব করে, ওদের যদি পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায়, ওরাও আমাদের হাতের মধ্যে আসবে। আর এখন ওখানে তো অনেক রকম কাজ। ওদের কিছু ব্যবস্থা করে দিলেই ওরাও হাতে থাকবে। ওদের দিয়ে অনেক কাজ হবে।

নরেশ কী ভেবে নেন, তারপর বলেন,

—জেনেশুনে ওই দুর্বৃত্তদের মদত দেব!

নটবর বলে,

—মদত দিচ্ছি না। ওদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে চাই। বুঝলে না ব্যাপারটা।

নরেশও বুঝেছেন ব্যাপারটা। তিনিও চান এমন লোকেদের হাতে রাখতে। নন্দবাবুর দলও প্রবল। তাদের সংযত করার জন্য এমন পথই নিতে হবে। নরেশবাবু এরপরই গোপনে কিছু কলকাঠি নাড়ার ব্যবস্থা করেন। নটবর এখানে-ওখানে ঘুরে পুলিশের কাছে হাজির করে পচাকে। কেসও ওঠে। পুলিশের তদন্তের রিপোর্টে অবশ্য পাঁচুর বিরুধে তেমন কোনো প্রমাণ না থাকার জন্য পাঁচু কয়দিন হাজতবাস করেই খালাস পায়। ওর দলের কয়েকজনের কয়েক বছরের জেল হয়।

পাঁচু জানে তার রক্ষাকর্তা কে, এর আগে পাঁচু এমন চুরি-ডাকাতি অনেক করেছে। বহু গৃহস্থের ওপর অত্যাচারও করেছে। এবার নটবরও বলে—পচা ওসব ছেড়ে দিয়ে আমাদের কাজে লেগে পড়।

পচা নরেশবাবুদের হয়ে কাজ শুরু করে। মিটিং-মিছিলে সারা গ্রামের লোকেদের জুটিয়ে আনে সে। হাটতলার কয়েকশো ফড়ে আনাজওয়ালা, ভ্যান ও রিকশাওয়ালাদেরও নটবর এর মধ্যে পার্টি মেম্বার করেছে। মাসে একটা অঙ্কের টাকাও দিতে হয় তাদের। আর মিছিলে না এলে পচাই তাদের হাটে বসতে দেয় না। সেই ভয়ে ওরাও আসে।

ওই হাটতলার থেকে কিছু টাকা পচা কমিশন বাবদও রাখে, সেটাও কম নয়। কালো লোহার এখন তার সুপুত্র পচার দৌলতে ভালো একজোড়া বলদ কিনেছে। আর পচা ধরণী মুখুজ্যের কাছ থেকে বিঘে দশেক জমি অলিখিত ভাগে নিয়েছে। এখন তার সেই চাষবাসও ভালোই চলছে। পঞ্চায়েত থেকে ঋণ নিয়ে একটা পাম্পসেট কিনে এখন তার জমিতে জলসেচের সুব্যবস্থা করে জমিতে দুটো করে ফসলও ফলাচ্ছে।

পচা এখন ধরণী মুখুজ্যের জমিগুলো নিয়ে চাষবাস শুরু করেছে, বর্ষা নেমেছে। কালো মেঘের দল আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বৃষ্টি নামে অঝোর ধারায়। মাঠ এখন রসবতী। পচার চাষবাসে তেমন মন নেই। কারণ হাটের তোলা তুলে, গ্রামে গ্রামে চাঁদা তুলে নরেশকে দিয়ে যা থাকে তা অনেক। ওই জলকাদায় কাজ করতে মন চায় না। তবু মাঠে আসে বাবার তাগিদে। আর কামিনীর জন্যই। চাষের সময় বাড়তি মজুর লাগে।

কামিনীকেই চেয়েছে পচা। অবশ্য কামিনীকে কিছু বেশি পয়সাই দেয় সে। কামিনী ওই বৃষ্টিতে ভিজে কাজ করে। শাড়িটা তার নিটোল দেহের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। দেহের রেখাগুলো, উন্নত বুক, সর্পিল কোমর ঢেউ তোলে পচার এতদিনের বেপরোয়া মনে। পচা এখন নতুন করে আরও কিছু পেয়ে বাঁচতে চায়।

বীজতলার জলে বসে ওরা সবুজ ধান চারাগুলো তুলছে। বৃষ্টি নামে। দিগন্তের কাছিমের পিঠের মতো উঠে যাওয়া মাটি—বৃষ্টির জলে এখন সরস। প্রহরীর মতো নির্জন প্রান্তরে দু'একটা তাল-মহুয়া গাছ দাঁড়িয়ে আছে।

পচা দেখছে কামিনীকে।

কামিনীর মনেও যেন কীসের সুর জাগে। যে সব পুরুষকে দেখেছে কামিনী, তাদের চোখে দেখেছে লালসার ছায়া। কিন্তু পচার চোখে লালসা ছাপিয়ে ফুটে উঠে এক মুগ্ধতার শান্ত চাহনি।

কামিনীরও ভালো লাগে। সে যেন বিচিত্র এক অনুভূতি এখানে জ্বালা নেই আছে স্নিগ্ধতা। কী আশার রামধনুর সাত রং, কামিনী বলে,

—কী দেখছ গো?

পচা বীজধানের আঁটিগুলো ফেলে রেখে বলে,

—তোমায়। ভারি সুন্দর তুমি।

হাসে কামিনী।

—লিশাটিশা করেছ নাকি গো?

পচা বলে,

—না গো। তোমায় দেখে ক্যামন লিশা লাগে গো। ই লিশা মদের লিশার থেকেও অনেক জোরদার—বুকে লহর তোলে।

কামিনীর সারা মনে এক সুর ওঠে।

বৃষ্টিভেজা বাতাসে দূরে একটা সুর ভেসে ওঠে। কোনো চাষি বৃষ্টির মাঝে লাঙল দিতে দিতে গাইছে। ওই সুরটা যেন আজ কামিনীর মতো যাযাবর বনহংসীকেও ক্ষণিকের জন্য কোনো সঙ্গীর কথাই, ঘরের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কামিনী আজ অকপটে স্বীকার করে পচার কাছে।

—জীবনে অনেক দুঃখ গো, আমাদের জীবনটাই দুঃখ ভরা। পচাও অন্যজগতের সন্ধান পেয়েছে। সে বলে,

—কামিনী আমি তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দোব।

—সেকী গো!

পচা ওর হাত দুটো নিজের হাতে টেনে নিয়েছে।

—হ্যাঁরে, নতুন করে বাঁচব কামিনী।

কামিনীও অনেক স্বপ্ন দেখে। ঘর বাঁধার স্বপ্ন।

পচার বাবা কালো লোহার প্রথমে বাধাই দেয়। পচার মা ওই মেয়েটাকে দেখতে পারে না। পচার ইচ্ছে ওকেই বিয়ে করবে। পচার মা বলে,

—ওই হতচ্ছাড়ি ছুঁড়ি তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে, তা বুঝেছি। ওরে ওটা একটা ঢলানি মেয়ে। ও ঘর করবেক নাই। ও দুদিন পরই তুর ঘর ছেড়ে আর কাবুর সঙ্গে পালাবেক।

পচার বাবা কালো বলে,

—কথা শুন বাপ। আমি ভালো মেয়ের সঙ্গে তুর বিহা দেব।

কিন্তু পচা এখন নিজে রোজগার করছে। তার ওঠা-বসা ওই পঞ্চায়েতের বাবুদের সাথে। হাতে পয়সাও কিছু এসেছে। সে বলে,

—ওকে আমি কথা দিয়েছি। উখানেই বিয়ে হবেক —

কামিনী এতদিন বানে ভাসা খড়কুটোর মতো এঘাটে-ওঘাটে ভেসে বেড়িয়েছে। এখন সে নিজের ঘরে এসে একেবারে বদলে গেছে, পরিস্থিতিই মানুষকে বদলে দেয়। জীবনের গতিপথ নির্ধারিত করে। এতদিন কামিনীকে লড়াই করে নিজের বাঁচার রসদ সংগ্রহ করতে হয়েছে। তাই তাকেও লাস্যময়ী হয়েই থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এখন পচার ঘরে এসে তার সেই বাঁচার সমস্যাটা মিটেছে। এবার কামিনীও চায় জীবনকে, তার ঘরকে, পরিবেশকে সুন্দরতর করে তুলতে। এখন কামিনী নিজেকেও নতুন করে গড়তে চায়। সেই লাস্যময়ী মেয়েটাও বদলে গেছে।

পিয়ালী নিজের পড়াশোনা ছাড়াও এখন বিনয়বাবুর স্ত্রী রমলার সঙ্গে মহিলা সমিতি গড়ে গ্রামের মেয়েদের মধ্যে অনেক কাজই শুরু করেছে, বিনয়বাবু পঞ্চায়েতের কেউ নন, তবু এলাকার মানুষ তাকে শ্রধ্বা করে। তার স্ত্রী রমলা মেয়েদের নিয়ে নানা দল করে। এখন তাদের দিয়ে একটা ছোটখাটো কাজ শুরু করেছে। এরা শালপাতার থালা বাটি—হাতপাখা এসব তৈরি করে। তাছাড়া হাঁস-মুরগি, ছাগলের খামার করেছে। কেউ কেউ সেলাই মেশিন কিনে তাতে কাজ করছে।

রমলাই নিজে চেষ্টা করে মেয়েদের মধ্যে একটা স্বাবলম্বী ভাবও এনেছে। ফলে সরকারের কাছে অর্থসাহায্য নিয়ে তাদের কাজও শুরু হয়েছে। এসব ছাড়াও পিয়ালী শুরু করেছে মেয়েদের নিয়ে নাইট স্কুল । এবার কামিনীও পিয়ালীর সঙ্গে এসে ভিড়েছে। সে লেখাপড়া শিখছে মন দিয়ে। তাঁতের কাজও শিখছে।

পচা বলে,

—আয় ব্বাস, বইও পড়তে শিখেছিস। অ্যাঁ সেলেটে কী সুন্দর লিখেছিস! কামিনী বলে,

—রামায়ণও পড়তে পারি। একটা রামায়ণ কিনে দেবে?

পচা অবাক হয়।

— সে তো ইয়া বড় বই গো। বামুনপাড়ায় দেখেছি মুখুজ্যেদের বাড়ি। ওই মোটা বই পড়বে।

— সে শিখে যাব। পিয়ালীদি বলেছে এবার ইংরেজিও শেখাবে। ইংরেজি আর অঙ্কও। অঙ্ক শিখলে হিসাব রাখতে পারব। পচা খুশি হয়। বলে,

—তা সত্যি। কে কী দেয়, কোথায় কী পাব। ইসবও মনে থাকে না। আঁক শেখো— ভালোই হবে গ,

পচা বড়জোড়ার বই-এর দোকান থেকে কামিনীর জন্য পিয়ালীর ফর্দমতো ইংরেজি

বই, অঙ্কের বই, ধারাপাত সেই সঙ্গে ঝকমকে ছবি দেওয়া রাম-সীতা-হনুমানের ছবিওয়ালা মোটা রামায়ণও কিনে দিয়েছে।

কামিনীও খুশি হয়।

পচা এখন নরেশ-নটবরদের পিছনেই রয়েছে। পঞ্চায়েত-এর ছোটখাটো কাজও করছে। সেই সঙ্গে হাটের ব্যবসাও বেড়েছে। ধরণী মুখুজ্যের একসঙ্গে দশবিঘে জমির ফসল নিয়েই সেবার গোলমাল লাগে। নটবর-নরেশরাও দেখেছে গ্রাম এলাকার মধ্যবিত্ত বিশেষত শিক্ষিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উচ্চবর্ণের মানুষদের চেয়ে গরিব চাষি ভাগচাষি-খেতমজুর ইত্যাদির সংখ্যা প্রায় তিনগুণ। নরেশ হিসাব করেন ভোটের সময় এই শক্তিটাই সবচেয়ে বড়। তাদের গদি পাওয়া নির্ভর করছে এদের উপরই।

নন্দবাবু-কিশোরের দল ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলোর দিকে বিশেষ চায়নি। তারা সমাজের উপরের তলার মানুষদের নিয়েই বেশি ভেবেছে, তাদের দলে এনেছে। আর সেই উপরের তলার মানুষদের নির্দেশমতো ওই বাকি মানুষগুলো ভোট দিয়েছে। নরেশরা সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে এবার ওই বঞ্চিত মানুষদের জন্যই হঠাৎ বেশি দরদি হয়ে উঠেছে। অবশ্য নিরপেক্ষভাবে স্বার্থহীনভাবে যদি ওদের জন্য কাজ করত সেটাই হত ঠিক কাজ। কিন্তু সেখানেও এরা নিজেদের স্বার্থ মতো চলেছে। সেখানেও নিজেদের লোকেদেরই পাইয়ে দিয়েছে বাকিদের বঞ্চিত করে। ফলে একশ্রেণির ওই সর্বহারার দল অবারিত সুবিধা পেয়ে আরও পাবার দাবিতে সরব হয়।

পচাও বুঝেছে তার অনেক কিছু পাবার অধিকারও জন্মে গেছে। তাই ধরণী মুখুজ্যের জমির ফসল সে এবার আর ধরণী মুখুজ্যের খামারে তোলেনি। তুলেছে নিজের খামারে।

ধরণী মুখুজ্যেও কড়া মেজাজের লোক। সে এই কাজ বরদাস্ত করবে না। তার দাবি তার জমির ফসল তার খামারেই তুলতে হবে। পচাও ধরণী মুখুজ্যেকে হারিয়ে দেয়।

—বেশ করেছি ঠাকুর। আমি চাষ করেছি ফসল আমার, তোমাকে যা দেবার আমিই দোব।

পচা জানে তার পিছনে নরেশবাবু-নটবররা আছে। এই নিয়েই বাধে অশান্তি। ধবণীবাবু সহজে ছাড়ার পাত্র নয়। সেও থানাতে গেছে। পচার নামে রিপোর্ট করে ফসল চুরির।

থানা অফিসার এখানের হালচাল জানেন। নটবর-নরেশবাবুদের চেনেন তিনি। তাই বলেন,

—ওদের নিয়ে একটা মীমাংসা করে নিন ধরণীবাবু। ধরণীবাবু অবশ্য মীমাংসার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পচা কোনো কথাই শোনেনি। নরেশবাবুদের কাছে গেছে। তাদেরও দরকার পচার মতো লোককে, তাই ধরণীবাবুকে তেমন পাত্তাই দেয়নি।

ধরণীবাবু বলেন,

—ওদের কাছে গেছি মশাই। কোনো বিচারই পাইনি, একশ্রেণির মানুষের করা সমাজের মধ্যে এইসব অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেদের গদি বজায় রাখতে চায় ওরা। তাই ধরণীবাবুরা যে বিচার পাবে না তা জানে থানা অফিসারও।

তবু তাকে বলতে হয়—আপনি যান, আমি দেখছি।

ধরণীবাবু বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করেও বিচার পান না। ওদিকে পচার খামারে

ধরণীবাবুর ধানের পালা গাদা করাই আছে। পচার ধান ঝাড়ার সময় নাকি নেই, ফলে বেশ কিছু ধানই বরবাদ হয়ে যায়।

কামিনীও দেখেছে ব্যাপারটা, পচার এই জেদ তারও ভালো লাগে না। কামিনীই বলে,

—কেন ওই ধরণী মুখুজ্যের এমন ক্ষতি করছ? ওর জমির ফসল ও পাবে না, পচার মেজাজ এখন চড়ে আছে। তার মতো একজন কর্মীর নির্দেশ কেন মানবে না ধরণী মুখুজ্যে, এতেই তার রাগ। পচা বলে,

—শালা বামনা মহা খচ্চর। আমার নামে থানায় নালিশ করেছে। ব্যাটাকে এবার ঘোল খাইয়ে ছাড়ব।

ধরণী মুখুজ্যেরও আত্মসম্মানে লাগে। তাঁর জমির ফসল পচাকে চাষ করতে দিয়েছিলেন। সেই ফসল এভাবে বরবাদ করবে তা তাঁরও ভালো লাগে না, ধরণী মুখুজ্যে, তাঁর ছেলে একটা সরকারি অফিসে কাজ করে। ছোট ছেলে বাজারে দোকান করেছে। অবস্থা মোটামুটি ভালোই। তাই ধরণীও আর ফসলের জন্য পচাকে বলেননি, ধানের গাদা পড়ে পড়েই নষ্ট হয়ে যায়। ধরণী বিচার পাননি। এ নিয়ে আর কোনো কথাই বলেননি। হঠাৎ দেখা যায় পচা এবার সেই ফসলের গাদা সাফ করে ধরণীর জন্য নিজের ইচ্ছেমতো মাত্র কয়েক বস্তা ধান রেখে দেয়। অবশ্য ধরণী মুখুজ্যে সেই ধান নিতে আসেন না।

কামিনী বলে,

—তোমার এই জেদ ভালো নয়। আগেও নানা বাজে কাজ করেছ। এবার ওসব মেজাজ ছাড়ো। লোকের সঙ্গে অকারণে অশান্তি করো না।

পচা বলে,

— বেশি বকিস না। ওই শালা ভদ্দর লোকেদের সঙ্গে মিশে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার ওপর কথা বোলো না।

কামিনীও দেখছে পচা এখন আবার তার দলবল নিয়ে সেই কয়লা তোলার অন্ধকার জগতেই নেমেছে। ওদের সঙ্গে অন্যদলের হামলাও হয়। এরাও দরকার হলে অন্য দলকে আক্রমণ করে তাদের মাল লুটে নেয়। তাই এখন বোমা-পিস্তলেরও দরকার। তা ছাড়া লাঠি, বল্লম এসব তো আছেই। কামিনী এসব কাজ পছন্দ করে না। সে এখন মা হতে চলেছে। বিয়ের পর বেশ কিছুদিন কামিনী শান্তিতেই ছিল। পচাও তখন এই ক্ষমতা-টাকার স্বাদ পায়নি। সবে যোগ দিয়েছে নটবরের সঙ্গে।

তার পর ওদের স্বার্থেই নরেশবাবুরা পচাকে এসব কাজে লাগিয়ে আর পচাও এখন ক্ষমতা-অর্থের স্বাদ পেয়ে সেই আগেকার আদিম হিংস্র স্বভাবটাকে ফিরে পেয়েছে নতুন করে। নিজেকে এখন সে প্রকাশ করে আরও শক্তিমান হিসেবে। অন্ধকারের রাজত্বের সিঁড়িতে সে ধাপে ধাপে উঠে চলেছে—তাকে আরও উপরে উঠতে হবে।

পচা এখন একটা মোটরবাইকও কিনেছে। ওই মোটরবাইকের দাপটে পচা এখন অন্ধকারের রাজ্যের সেনাপতি হয়ে উঠেছে।

ধরণী মুখুজ্যে এবার ওই জমিগুলো নিজের ঘরেই চাষ করবে। এতদিন সে কালো লোহারকে কিছু পাইয়ে দেবার জন্যই ওইসব জমি তাকে ভাগে চাষ করাত। ধরণী বীজধান,

সার সবই দিত। এবার ধরণীই তার জমিতে নিজের লাঙল নামিয়ে চাষ দিয়েছে। অর্থাৎ কালো লোহারের কাছ থেকে তার জমি ফিরিয়ে নিয়ে নিজেই চাষ করে তার জমিতে। কালো লোহার অবশ্য কিছু বলে না।

সেও দেখেছে ওই ভাবে বহু ধানও নষ্ট হয়ে গেছে। কালো লোহার চুপ করেই সরে আসে। ধরণী জমিতে তার লাঙল নামিয়েছে, অবশ্য ধরণী মুখুজ্যের ছেলেরাও এসেছে জমির দখল নিতে। সঙ্গে আরও দু-চারজন লোকও এনেছে। খবরটা এর মধ্যেই পচারই এক সাগরেদ ছুটে গিয়ে পচাকে দেয়।

—ধরণী মুখুজ্যে তার জমি তোমাদের ভাগচাষ করতে দিবেক নাই গ। নিজেই চাষ করছে। ও লাঙল দিচ্ছে ওদের ফুলতলার জমিতে। পচা নটবরের বাইরের ঘরে বসেছিল। তাকেও আজ রাতে যেতে হবে জঙ্গলে। কয়লার কাজ এখন জোর চলছে। লোকজনও রয়েছে।

হঠাৎ ওই ভাবে হাত থেকে জমি কেড়ে নেবার কথা শুনে গর্জে ওঠে পচা,

—কী বললি—ওই ধরণী মুখুজ্যের এতবড় হিম্মত? কেনো নটবরবাবু তোমাদের কি বিচের নাই। আমি ভাগচাষি আর ও জমিতে আমার হক নাই?

নটবরও শুনছে কথাটা। কী জবাব দেবে তাই ভাবছে। সেও জানে পচা ধরণীর জমির ফসলের ঠিকঠাক ভাগ দেয়নি। বরং ফসল নষ্টই করেছে।

পচার ওসব কথা শোনার সময় নেই। জমি কেড়ে নেবার ব্যাপারে সে চটে উঠেছে। তার পৌরুষে আঘাত লেগেছে। পচা গর্জে ওঠে,

—অ্যাই চল তো, দেখছি ব্যাটা ব্রাহ্মণকে।

নটবর কিছু বলার আগেই পচাও দৌড়াল। সঙ্গে চলেছে তারই কয়েকজন চ্যালা।

ধরণী মুখুজ্যে ভেবেছিলেন কালোও তৈরি হয়ে আসবে। বাধা দেবে। কিন্তু কালো লোহার লাঙল দিতে বাধা দেয় না, সে সাবেকি আমলের লোক, তার বিচার-বিবেচনার শক্তিটা আগেকার মূল্যবোধের সঙ্গে জড়িত। সে জানে পচা ঠিক কাজ করেনি। তাই সরে যায় সে।

ধরণী মুখুজ্যে তাঁর লোকজন নিয়ে লাঙল দিচ্ছেন জমিতে, ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে ধরণীর বড় ছেলে, ছোট ছেলেরা। হঠাৎ এবার সগর্জনে দৌড়ে আসছে পচা, সঙ্গে তার লোকজন। পচা বলে,

—খবরদার জমিতে লাঙল দেবা না। উ জমি আমার, ও লাঙল দিতে হয় আমিই দোব।

ধরণীর ছোট ছেলে বলে,

—জমি আমাদের, দলিল-কাগজপত্র কী আছে তোমার যে জমি কেড়ে নিতে এসেছ।

ধরণী বলে,

—আমার লোকসান করে দিলি, আর জমি তোকে দোব না।

—খবরদার ঠাকুর। পচা গর্জে ওঠে,

ধরণীর বড় ছেলে দেখছে ব্যাপারটা। পচা এবার বাধা পেয়ে রাগে ফেটে পড়ে। সে লাঠি তুলেছে, বাধা সে দেবেই। ধরণীর উপর লাঠিটা চালাতে বয়স্ক ধরণী মুখুজ্যে মাথায় আঘাত পেয়ে ছিটকে পড়েন জমিতে। রক্ত বের হতে থাকে।

এবার পচাও দেখছে ধরণী পড়ে যেতে ওর লোকজনও সরে পড়ে—ওরা কোনোরকমে ধরণীকে নিয়ে চলে যায়। বড় ছেলে সাইকেল নিয়ে দৌড়য় রিকশার সন্ধানে। যেভাবে হোক আহত রক্তাক্ত ধরণীকে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে। ছোটভাইও এবার ভাবছে কী করা যায়। জমির দখল নিতে গিয়ে এমন একটা বিপদ ঘটে যাবে তা ভাবেনি ওরা।

সারা গ্রামে হইচই পড়ে যায়। গ্রামের ভাগচাষিকে জমি দেবে না, নিজে চাষ করবে। জমির মালিকের এই অধিকার নিয়ে এতদিন কেউ কোনো প্রশ্ন তোলেনি। এবার সেই দাবি নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। মাত্র কয়েকজন জমি-মালিকের স্বার্থরক্ষার প্রশ্ন, অন্যদিকে নরেশবাবুরা চায় বহু লোকের সমর্থন। এখানে ভাগচাষিদের সংখ্যাটাই বেশি। তাই নটবরও জানে এবার কী করতে হবে।

পচা যে ধরণী মুখুজ্যেকে মাথায় চোট করে এসেছে। ওর ছেলেরা ওকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এই খবরও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। নটবর বলে,

—পচা তুই থানায় যা। আমি বলে দিচ্ছি—ওখানে গিয়ে বলবি যে তুই ভাগচাষি; ওখানে লাঙল দিতে গেছলি, ধরণী মুখুজ্যে লোকজন নিয়ে তোকে, তোর লোকেদের মারতে গেছল। আর ওদের লোক তোকে মারতে লাঠি তুলেছিল। সেই লাঠিতেই ধরণী মুখুজ্যের মাথা ফেটেছে। যা পুলিশে ডাইরি করে আয়।

নরেশও এসে পড়েন। তিনিও বলেন,

—তাই বলবি। তোর দোষ নেই। ওরাই নিজেদের লাঠির ঘায়ে ছিটকে ফেলেছে ধরণীকে।

পুলিশের কাছে নরেশও এসেছেন। আর থানার ছোটবাবুও ভালো করেই চেনে নরেশ ও নটবরদের। ওরা জানে কখন কী করতে হয়।

নরেশ বলে,

—নিরীহ চাষিকে অকারণে উৎখাত করবে জমি থেকে। মারবে? এর কি বিচার হবে না। না হলে কিন্তু সারা অঞ্চলে আমরা আন্দোলন শুরু করব।

ছোটবাবু বলেন,

—আপনি যান। আমরা যা করার করছি।

অবশ্য এর পরই বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে ধরণীর ছোট ছেলে আসে থানায়। তার আগেই পচা লোহার অবশ্য ধরণী মুখুজ্যে ও তার দুই ছেলের নামে বেশ জবরদস্ত অভিযোগই করে এসেছে।

নটবর অবশ্য জানে পুলিশকে দিয়ে কীভাবে কাজ করাতে হয়। নটবররাও হাতে একটা ভালো কেসই পেয়েছে।

জমির মালিকদের এবার তারা জানিয়ে দেবে যে অসহায় ছোট ভাগচাষির অধিকার খর্ব করা চলবে না। সারা এলাকার কয়েক হাজার এমনি ছোট চাষি, খেতমজুরদের হাতে আনতে পারবে এই কেসের জন্য। তাই নটবরও চায় ধরণী মুখুজ্যেদের শাস্তি দিতেই হবে। নরেশবাবু তো আজ বিকেলে হাটতলায় প্রতিবাদ সভাই ডেকেছেন।

ধরণীর ছেলেরা দিনভর ডাক্তার, হাসপাতাল এই নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে বাবার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ফিরছে। ধরণীর আঘাতটা মন্দ নয়। মাথা ফেটে গেছে। এখন বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থাকতে হবে। হঠাৎ এরপর পুলিশের গাড়ি আসতে দেখে

অবাক হয় তারা। ওরাই নাকি পচা লোহারকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। তাকে জমি থেকে তুলে দিতে চেয়েছিল। তাই পুলিশ ধরণীকে হাসপাতালে কয়েদি হিসেবে রেখেছে আর বাড়ি থেকে তার দুই ছেলেকে আরও কয়েকজনকে তুলে নিয়ে যায়।

অবশ্য এর মধ্যে পুলিশ ধরণীর ছেলের অভিযোগের জন্য পচাকে ধরেছে। তার দলের কয়েকজনকেও নিয়ে গেছে। একেবারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেই পুলিশ দুই পক্ষকেই তুলে নিয়ে গেছে। এবার বিপদে পড়ে ধরণীর ছেলেরা। বড় ছেলে সরকারি চাকরি করে। বিনা দোষে তাকেও অ্যারেস্ট করেছে পুলিশ। আর পরদিন কোর্টে হাজির করে, নটবরও গেছে সেখানে। উকিলও লাগিয়েছে। পচাকে জামিনে খালাসও করে আনে। বাকিদের সেদিন জামিন হয় না। আবার তারিখ পড়েছে।

সতীশ চাটুজ্যের মতো চালু লোকও এই বিচিত্র কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছে। সে জানত যে সেই লোককে নানাভাবে ধাপ্পা দেয়। দিনকে রাত করে মানুষ ঠকিয়ে কিছু রোজগার করে। সংসার চালানোর জন্য সে নানারকম খেলাই খেলে।

সতীশ চাটুজ্যে সব ঘটনাই দেখেছে। সে তখন ওই মাঠের মধ্যে দত্তদের শিবমন্দিরে পুজো করতে গিয়েছল। সে গ্রামের ছোটখাটো মন্দিরগুলোতে ঘুরে ঘুরে পুজো করে। সেদিনও গেছে ওই মন্দিরে। দেখে মাঠে তখন ধরণী মুখুজ্যের সঙ্গে পচার বচসা চলছে। পচা লাঙল দিতে যায়নি। ওই ধরণীর মাথা লক্ষ্য করে লাঠি চালাতে ধরণী ছিটকে পড়ে। চমকে ওঠে সতীশ চাটুজ্যে। পচা লোহার যে বয়স্ক ধরণীকে এভাবে মারবে এটা এখনও ভাবতে পারছে না সতীশ।

ভীত ত্রস্ত হয়ে কোনো মতে বাড়ি ফেরে সতীশ। পিয়ালী বাড়িতেই ছিল। সে বাবাকে ওই ভাবে ফিরতে দেখে বলে,

—কী হল? এমন করে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলে?

সতীশ এক নিশ্বাসে ঘটির জলটা শেষ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে ওই ব্যাপারটা। পিয়ালীও শুনে চমকে ওঠে।

—সে কী! নিজের জমি নিজে চাষ করবে, তার জন্য এভাবে মার খেতে হবে।

—তাই তো দেখলাম, কী দিন পড়ল রে? সমাজে লঘু-গুরু বলে কোনো কথাই থাকবে না? এর বিচার হবে না?

পিয়ালীও ভাবছে কথাটা, সে বলে,

—ধরণীবাবুর ছেলেরা থানায় যাক। এর বিচার হবেই।

একটু পরেই নটবরের চ্যালা ভূতনাথ এসেছে সতীশের কাছে। ভূতনাথ বলে,

—চাটুজ্যে খুড়ো, নুটুদা তোমাকে একবার ডেকেছে। এখুনি যেতে বললে, কী জরুরি কথা আছে।

পিয়ালী সেই থেকেই কথাটা নিয়ে ভাবছে। পচা লোহারকে সেও আগে থেকেই চেনে। তখন সে ডাকাতি করত। পুলিশও ধরেছে তাকে কয়েকবার। সেই লোকটা আজ আবার এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। তার পর নুটুবাবুর এই তলবের কথা শুনে পিয়ালী বলে,

—কী দরকার বাবাকে?

ভূতনাথ বলে,

—তা জানি না। এখুনি যেতে বল্লে। চলো গো খুড়ো।

সতীশ নটবরের ডাককে অগ্রাহ্য করতে পারে না।

নটবর হিসাব করে পা ফেলে। সে জানে এবার ধরণী মুখুজ্যের ছেলেদের অভিযোগ মতো কেস উঠতে পারে। আর এই ঘটনার সাক্ষী ওই সতীশ চাটুজ্যে। ও যদি সব কথা ঠিকমতো বলে পুলিশকে কেস আদালতে জেরার জন্য উলটে যেতে পারে। তাই সতীশ চাটুজ্যেকে আগে থেকেই থামিয়ে রাখতে হবে। নটবর ওর জন্যই অপেক্ষা করছে। সতীশ ওই দুপুর রোদে গলদঘর্ম হয়ে গিয়ে হাজির হয়।

—কী বাবা নুটু হঠাৎ তলব?

নুটু বলে,

—বসুন। ওরে চাটুজ্যে খুড়োকে সরবত এনে দে। যা রোদ পড়েছে। সতীশ আপ্যায়িত হলেও মনে মনে ঠিক নিশ্চিন্ত হতে পারে না। কী কারণে তাকে ডাকা হয়েছে। সেইটাই ভাবছে। নটবর বলে,

—ওই ধরণী মুখুজ্যের কাজটা ঠিক হয়নি। গরিব চাষিকে এই ভাবে তাড়াবে? আপনিই বলুন।

সতীশ বলে,

—তাই বলে পচা অমন করে মারবে? ও তো মারাই যেত।

নটবর এবার বুঝেছে সতীশও এটাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই এবার নটবর বলে,

—যা হবার তা হয়ে গেছে। রাগের মাথায় পচা একটা কাজ করে ফেলেছে। তবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, পুলিশও জিজ্ঞাসা করলে বলবেন কিছুই দেখিনি। মন্দিরের ভিতরে ছিলাম, বুঝলেন?

সতীশ বুদ্ধিমান লোক, এসব বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। বেশ বুঝেছে সতীশ এটা তার মুখ বন্ধ রাখার প্রয়াস। না হলে তাকেও বিপদে ফেলবে। সতীশ তাই বলে,

—তাই বলব বাবা। বলব আমি কিছুই দেখিনি।

—হ্যাঁ কথাটা যেন মনে থাকে। নটবর বেশ কড়া স্বরেই সাবধানবাণীটা শুনিয়ে দেয়।

সতীশ বলে,

—তাই বলব, এখন যাই বাবা।

পিয়ালীও বাবার মুখে কথাগুলো শুনে বলে,

—এইভাবে অন্যায়কে ওরা প্রশ্রয় দেবে। ওরা কি সমাজের সব নিয়মকে শেষ করে কিছু অসামাজিক লোকেদের প্রশ্রয় দিয়ে সমাজের সর্বনাশ করবে?

সতীশ বলে,

—ওদের গদি বজায় রাখতে হবে, ভোট আদায় করতে হবে। তাই একাজ যারা করবে তাদের তো মাথাতে তুলতেই হবে। তাতে সমাজ, দেশ রসাতলে যায় যাবে মা। এর থেকে বাঁচার কোনো পথই নেই।

পিয়ালী এটাকে মানতেই চায় না, সে বলে,

—এভাবে চলতে পারে না বাবা,

—তাই তো চলছে।

—এই ভুলের মাশুল একদিন দিতেই হবে বাবা,

—কে জানে! সতীশ চাটুজ্যেও আজ হতাশ হয়েছে। সে এত মিথ্যে কথা বলে, ধাপ্পা দেয় মানুষকে। কিন্তু তার চেয়েও যে বড় মিথ্যেবাদী আর ধাপ্পাবাজ একটা শ্রেণি আছে আজ সেটা আবিষ্কার করেছে।

সেই রাতেই পুলিশ এসে ধরণীর ছেলেদেরও তুলে নিয়ে গেছে। আর পচার দলকেও। গ্রামের ইতিহাসে এমন কাণ্ড আগে ঘটেনি। এতদিন ধরে এই গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসবাস করেছে শান্তিতে, নিজেদের মধ্যে গোলমাল যে হয়নি তা নয়। কারণে-অকারণে নিজেদের মধ্যে অশান্তি, মনোমালিন্য হয়েছে কিন্তু সেসব নিজেদের মীমাংসায় মিটেও গেছে। নইলে গ্রামের মোড়লদের মধ্যস্থতায় সকল গ্রামবাসীর সামনে উপযুক্ত বিচার হয়েছে। কখনও অর্থদণ্ড কখনও বা সামাজিক শাস্তি বিধান করা হয়েছে। সকলে সেই বিধান মাথা পেতে নিয়েছে। গ্রামে জমির দখল নিয়ে জোরাজুরি লড়াই, রক্তপাত হয়নি। থানাপুলিশও করতে হয়নি।

আজ সেই এতদিনের শান্ত জীবনযাত্রাকে এরা চরম আঘাত হেনেছে নিজেদের স্বার্থে।

নরেশ-নটবরও বুঝেছে পুলিশ প্রশাসনকে তাদের কাজে লাগাতে পারলে জনসাধারণ তাদের সম্বন্ধেই ভীতই থাকবে। আর সেটাকেই মূলধন করে তারা তাদের গদি বজায় রাখবে।

ব্যাপারটা পিয়ালীও বুঝেছে। সে এখন কলেজে পড়ছে। পিয়ালী ও গ্রামের আরও কিছু ছেলেমেয়ে এখন সাইকেলে করে কলেজে যায়, সেখানে চেনাজানা কোনো সাইকেল দোকানের মাঠে সাইকেল রেখে কলেজে ঢোকে।

আগে শহরেই ছিল কলেজ। সেখানে হোস্টেলে থেকে পড়তে হত। সে ছিল অনেক খরচের ব্যাপার। তাই সকলে এতদূর যেতে পারত না। তাই সেদিন কলেজের স্বপ্ন স্বপ্নই ছিল। এখন সেটা অনেক সহজই হয়ে গেছে।

বিনয়বাবু-রমলাও চান পিয়ালী কলেজে পড়ুক। তবে মাধ্যমিকে সে ভালো ফল করেছিল। তাঁরাই বলেন,

–পিয়ালী, তুই কলেজে ভর্তি হয়ে যা।

পিয়ালী জানে তার বাড়ির অবস্থা। বাবা সতীশ চাটুজ্যে নানা কৌশলে সংসার চালায় মাত্র। তাতে পড়ার খরচা ওঠে না। রমলা বলেন, ওসবের জন্য তোকে ভাবতে হবে না।

রমলাই ওকে নিয়ে এসে কলেজের দু-একজন চেনা অধ্যাপকের সঙ্গে পিয়ালীর পরিচয় করিয়ে দেন। কলেজে ভর্তি করে দেন। বইপত্রও সব কিনে দেন। রমলাই গ্রামে কয়েকটা মেয়েকে পড়াবার কাজও জুটিয়ে দেন পিয়ালীকে। তাতেও কিছু টাকা আসে। বাকি টাকার জন্য পিয়ালীকে ভাবতে হয় না।

এখন বিনয়বাবুদের পরিবারেরই একজন হয়ে গেছে পিয়ালী। বিকেলে এসেছে বিনয়বাবু-রমলাদের বাড়িতে। বিনয়বাবুও গ্রামে ওই মারপিট, পুলিশ কেসের কথাও শুনেছেন। কিন্তু সবটা শোনেননি। পিয়ালীর মুখে সব শুনে বিনয়বাবুও অবাক হন।

–সেকী! ওরা এইভাবে পচাকে দিয়ে এমন মিথ্যা মামলা সাজাচ্ছে।

পিয়ালী বলে,

–শুধু তাই নয়। বাবাও ব্যাপারটা সব দেখেছিল। তাই বাবাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শাসিয়ে কোনো কথা জানাতে নিষেধ করা হয়েছে। বিনয়বাবু ভাবছেন কথাটা। এই ঘটনার জন্য বিনয়বাবু পচার চেয়েও বেশি অপরাধী মনে করেন নরেশ-নটবরকে। বলেন,

–সমাজের এই অশুভ শক্তিকে নিজেদের স্বার্থে আজ মদত দিয়েছে। কিন্তু এটা

আলাদিনের দৈত্যের মতো। একটার প্রদীপের বাঁধন থেকে বের হতে পারলে সেই অশুভ শক্তি সমাজের সব বাধাকে শেষ করে দেবে। সেদিন এই দৈত্যদের সামলাবার শক্তি এদের থাকবে না।

পিয়ালী ভাবছে কথাটা। একদল লোক নেহাত ব্যক্তিগত স্বার্থে গণতন্ত্রের শুচিতা - পবিত্রতাকে নিয়ে ছেলেখেলা করছে। আরও আশ্চর্যের কথা এদের নিষেধ করেন না উপরওয়ালারা, বরং বাহবাই দেন। এভাবেই এই ব্যবস্থাই চলছে।

মুষ্টিমেয় সামান্য জমির মালিকরা আজ দিশেহারা, ওই জমির আয় থেকে তাদের একবেলা আধপেটা খেয়ে দিন চলত। এখন যা খরচ বেড়েছে তাতে জমিতে যারা নিজেরা পরিশ্রম করে তারা তবু দুটো পয়সা চোখে দেখতে পায়। যারা পারে না তাদের অগত্যা জমি ভাগেই দিতে হয়। তবু সামাজিক প্রীতি কিছু ক্ষেত্রে বেশ কিছু চাষি জমির অসহায় বিধবা অথবা বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মালিককে তার প্রাপ্য ঠিক মতোই দিয়ে আসে। এমনকী, তাদের দেখাশোনা করে আপনজনের মতো, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ায়। গ্রামীণ সমাজে এই মানবিক সম্পর্কটুকু কিছু ক্ষেত্রে এখনও টিকে আছে। এবার স্বার্থের গন্ধ, শক্তির স্বাদ পাইয়ে মানুষকে সেই কর্তব্যটুকু ভুলিয়ে দিয়ে অমানুষ করে তুলবে আজকের রাজনীতি। আর এই মূল্যহীনতার শিক্ষা দেয় সব দলই কারণ কিছু পাইয়ে দেবার পথ না দেখালে তার দলে কেন আসবে মানুষ।

বিনয়বাবু বলেন,

—তাই ওই রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে রেখে মানুষের জন্য কাজ করার চেষ্টাই করি।

পিয়ালীও ভাবছে, সেও বিনয়বাবুর পথটাকেই মেনে নেবে। কলেজেও এর মধ্যে পিয়ালী পরিচিত হয়ে গেছে। স্পষ্টবাদী, তেজস্বিনী মেয়েটা কলেজেও এই কথাই প্রচার করে। আগামী প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা আজকের সম্পর্কে কিছু লোভী মানুষের এই পরাক্রম দেখে তারাও নতুন করে ভাবছে।

কে বলে,

—আমাদের দিন এলে নতুন করে ভাবতে হবে।

পিয়ালী বলে,

—মানুষই রাজনীতি এনেছে। রাজনীতি মানুষকে আনেনি। আজ সেই মানুষের কল্যাণের জন্য যে রাজনীতি সেই রাজনীতিকে কলুষিত করেছে আজকে মানুষ, আজকের নেতারা। রাজনীতিকে মানুষেরা কল্যাণে নয়, নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে নিজেদের ক্ষতি করে।

কলেজের ডিবেটে ওর এই ভাষণ সেদিন নবাগত ছেলেমেয়েদের মধ্যে সাড়া তোলে। পড়াশোনাতেও পিয়ালী ভালো আর তার এই বাচনভঙ্গির জন্যই ছাত্রছাত্রীরা তাকে ইউনিয়নেও নিয়ে আসে।

গ্রামেও এসব খবর এসে পৌঁছয়। মাধব কবরেজের মেয়ে মালতী এবার উচ্চমাধ্যমিক পড়ছে। দু-বছর বেশি কেটেছে মাধ্যমিকে। তারপর উচ্চমাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে। অবশ্য এখানে ক-বছর কাটবে তা মালতী জানে না। ওদিকে মাধবও মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছে। দু-এক জায়গা থেকে পাত্রপক্ষ মালতীকে দেখতেও এসেছিল। একজনের পছন্দও হয়েছিল।

কিন্তু পাত্রের বাবা যে দর হাঁকছে তাতে আর এগিয়ে যাওয়ার সাহস হয়নি মাধবের। ফলে মালতীর গতি আর হয়নি। মালতী সেদিনও পাড়ার কোনো বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে পিয়ালীর কলেজের কথা শুনে বলে,

বিনয় স্যার আর রমলাদির কথাগুলোই ও মিটিং-এ আওড়ে দেয় আর তোরা ভাবিস পিয়ালীর কী পড়াশোনা, কী ভাবনাচিন্তা। আরে ওসব ভাষণ আমিও দিতে জানি।

মালতী পিয়ালীকে মোটেই সহ্য করতে পারে না, অবশ্য মালতী পিয়ালীকে হিংসা করে তা পিয়ালী জানে।

সেদিনও দেখেছে মালতী, পিয়ালী আর নটবরের ছেলে ভবেশকে। পিয়ালী গেছে ভবেশের কাছে পড়ার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। বিনয়বাবুর কথামতো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়েছে পিয়ালী। ভবেশও ওই নিয়ে এবার ফাইন্যাল পরীক্ষা দিচ্ছে। পিয়ালীও ভবেশের কাছে গেছে ওই বিষয়ে আলোচনা করতে। ভবেশেরও ভালো লাগে পিয়ালীকে।

ভবেশ বলে,

—আমার পরীক্ষা হয়ে যাক। তারপর আমার নোট-বইপত্রগুলো তোমাকেই দোব।

মালতী খবর পেয়েছে যে ভবেশ বাড়িতে এসেছে। মালতীও সেদিন দুপুরের পরই বেশ সেজেগুজেই এসেছে ভবেশের বাড়িতে। মালতী ভেবেছিল এই নির্জন দুপুরবেলায় ওখানে আর কেউ থাকবে না। সে ভবেশকে একাই পাবে। আজ বিকেলে ওকে নিয়ে বেড়াতে বের হবে। তাদের গ্রামের ওদিকে বনের ধারে ছোট নদীর ধারে এখন শালবনে এসেছে শালের মঞ্জুরী। বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ধীরে ধীরে আঁধার নেমে আসে শালবন সীমায়। মহুয়ার ফুলগুলো এক এক করে ফুটতে থাকে। দিনশেষের আকাশ ভরে ওঠে ঘরে ফেরা পাখিদের কলরবে। মালতী ভবেশকে নিয়ে আজ তেমন এক স্বপ্নের জগতে হারিয়ে যাবে।

মালতী আজ অনেক আশা নিয়েই এসেছে। ভবেশদের বাড়ির এদিকটা নির্জনই। নটবর এখন অফিসে না হয় ওই মাঠের ওদিকে তার ফার্মে না হয় বাজারেই তার দোকানে থাকবে।

মালতী এসেছে, ওদিকে কামিনী ফুলের ঘন ঝাড় মতো। ওখানে এসেই জানলা দিয়ে ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখেই থমকে দাঁড়ায় মালতী। দেখে ঘরের ভিতর পিয়ালী আর ভবেশ দুজনে একটা খাটের উপর ঝুঁকে পড়ে কী কথা বলছে। দুজনের কোনোদিকে খেয়ালই নেই। হঠাৎ ভবেশ পিয়ালীর কথায় হেসে ওঠে। পিয়ালীও হাসছে। মালতীর সারা দেহ-মন যেন কী জ্বালায় জ্বলে ওঠে। পিয়ালী যে তার আগেই ভরদুপুরে এখানে এসে পড়বে তা ভাবেনি মালতী। মালতী বুঝেছে ওদের মধ্যে তার কোনো ঠাঁই নেই। মালতীও এবার কী ভেবে সরে আসে ও বাড়ির দিকে।

বাসন্তী এখন সেজেগুজে প্রধান গিন্নি হয়ে কর্তৃত্ব করছে। মালতীকে দেখে বাসন্তী চাইল। মালতী বাসন্তীকে প্রণাম করে বলে,

—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কাকিমা। ভাবলাম প্রণাম করে যাই। অনেকদিন আসিনি, তাই চলে এলাম। এখন তো তুমিই সব কাজে ব্যস্ত। বাসন্তী বলে,

—আর বলিস না বাছা। খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, বিপদ হল এঁড়ে গোরু কিনে। আমার হয়েছে তাই। বেশ ছিলাম দেশের লোক, তোর কাকাকে প্রধান করে দিল, আমারও ঝামেলা বাড়ল। শহর থেকে কর্তারা লোকজন আসছে, তাদের দেখাশোনা করা।

মালতী বলে,

—এবার একটা বউ আনো কাকিমা। একা আর কতদিক সামলাবে। ভবেশদাকে বলো—অবশ্য ভবেশদার মতো ভালো ছেলের মাথা বিগড়ে দেবার জন্য ওই পিয়ালী তো পিছনে ছিনে জোঁকের মতো লেগে রয়েছে। তাই বলছিলাম—

বাসন্তী এবার নিজমূর্তি ধরে,

—কী বললি? ওই খেলোয়াড় মেয়েটা এসব করছে। শুনি, বলে এখন কলেজে পড়ছে, আর এতবড় হিম্মত ওই মেয়েটার আমার বাড়াভাতে ছাই দেবে।

মালতীও বুঝেছে ঠিক জায়গাতেই ওষুধ পড়েছে। সে বলে,

—তা জানি না। তবে এদিকে আসছি, দেখলাম ওই বাগানের দরজা দিয়ে মেয়েটা ভরদুপুরে একা ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকল। কে জানে এখনও আছে কি না।

বাসন্তী উঠে পড়ে রাগে।

—দেখছি, এবার মুখপুড়িকে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দোব। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

মালতী বলে,

—আমি চলি কাকিমা, পরে আসব, আর হ্যাঁ তুমি বাপু বোলো না যে আমি এসব কথা বলেছি। ওকে তো জানো না, পিয়ালী আমার বাড়িতে গে হাঙ্গামা বাধাবে।

বাসন্তীর ওসব কথা শোনার সময় নেই। সে তখন হনহন করে ওই বাড়িতে ভবেশের ঘরের দিকেই চলেছে। মালতী অবশ্য যায়নি। সে একটা ঘরের পাশেই দাঁড়িয়েছে পরের নাটকের দৃশ্যটা দেখার জন্য।

ভবেশ-পিয়ালী ওরা এসব খবর জানে না। পিয়ালী তখন একনিষ্ঠ মনে ভবেশের নোটগুলি কপি করছে। ভবেশও খাতা থেকে পড়ে যাচ্ছে। লিখছে পিয়ালী। হঠাৎ যেন একটা বোমা ফাটে ঘরের মধ্যে, একটা হুংকার ওঠে,

অ্যাই যে! ওমা একী সব্বনেশে কাণ্ড! কী লীলাখেলা চলছে বিদ্যেধরীর।

ভবেশ চাইল। পিয়ালীও দেখে সামনে একেবারে রণচণ্ডী মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছে বাসন্তী। মুখে পানদোক্তার একটা ঢোকলা। পক্ করে খানিকটা পিক্ ফেলে এগিয়ে আসে। গর্জে ওঠে।

—বলি লাজলজ্জা-শরম কি কিছুই নাই তোর? বাপ তো ভেলকি দেখিয়ে লোকের সব্বনাশ করে খায়। তারই মেয়ে তো। ওসব লাজলজ্জার বালাই কেন থাকবে! ভরদুপুরে আমার বাড়িতে ঢুকে আমারই সব্বনাশ করার মতলব।

ভবেশ তার মায়ের কথায় বলে,

—কী যা-তা বলছ মা? কাকে কী বলছ?

বাসন্তী ফুঁসে ওঠে,

—থাম তো। ওর হয়ে আর ওকালতি করতে হবে না। ওই হতচ্ছাড়িকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। ও এসেছে কী মতলবে তা জানি না? ওর বাপটাই এসব মতলব দিয়ে

পাঠিয়েছে। যা ফেরেব্বাজ লোক, আর তেমন মেয়ে। পিয়ালীও এবার ইঙ্গিতটা বুঝেছে। সে বলে,

—বিশ্বাস করুন। আমরা গরিব হতে পারি। তবে কোনো মতলব নিয়ে এখানে আসিনি। এসেছিলাম পড়ার বিষয়ই জানতে।

—থাক্। থাক্ —আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে হবে না। আমিও ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। বলি মানে মানে যাবি না খেংরে দূর করতে হবে। পিয়ালী উঠে পড়ে। সে ভাবেনি এই ভাবে তাকে জঘন্যভাবে সন্দেহ করবে ওই মহিলা আর ওইসব কথা বলে অপমান করবে। সামান্য অবস্থা থেকে ওরা অনেক কিছু মনুষ্যত্ব বিচার-বোধকেও হারিয়েছে।

ভবেশ বলে,

—মা! এসব তোমার অকারণ সন্দেহ।

—দ্যাখ। আমাকে এত বোকা ভাবিস না। কলেজে পড়া মেয়েদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

পিয়ালী বলে,

—এসব আপনার ভুল ধারণা। তবে বুঝেছি এ বাড়িতে এসে অন্যায় করেছি। আমাকে মাফ করবেন।

পিয়ালী চলে যায়। বাসন্তী ভেবেছিল পিয়ালী গরম গরম জবাব দেবে আর বাসন্তীও তার উপরে গলা তুলে পাড়া মাথায় করে ওকে অপমান করে দূর করে নিজের প্রতিষ্ঠা জাহির করবে। কিন্তু তা না করে মেয়েটা বেরিয়ে গেল। বাসন্তী কেমন হতাশই হয়। রাগটা গিয়ে পড়ে ওই ভবেশের উপর। বাসন্তী বলে,

—ওই পাজি মেয়েটার সঙ্গে যদি ফের কোনো দিন মিশতে দেখি ভালো হবে না। বলে দিলাম ভবেশ।

ওদিকে সতীশ চাটুজ্যেও বিপদে পড়েছে। আজ দুপুরেই থানা থেকে পুলিশ আসে ওর বাড়িতে। পাড়ার লোকজনও দেখেছে সেটা, অবশ্য পুলিশের সঙ্গে নটবরও ছিল। এই যা ভরসা। পিয়ালীও বাড়িতে নেই। সতীশের গিন্নি বলে,

—একী সব্বনেশে ব্যাপার গো। বাড়িতে পুলিশ এসেছে। নটবর বলে, —ও কিছু না।

পুলিশ এবার চাটুজ্যেকে জেরা করে সেদিনের ব্যাপার নিয়ে। সতীশ দেখছে নটবরকে, নটবর বলে,

—ভয় কী কাকা ? বলুন আপনি তখন কোথায় ছিলেন ? কী করছিলেন? ভয় কী? বলুন—

সতীশও বুঝেছে কী বলতে হবে। জীবনে বহু মিথ্যা কথা বলেছে সে।

কিন্তু এবার মিথ্যা কথাটা বলতে বিবেকে বাধে। তবু বলতে হয়,

—আমি তখন মন্দিরের ভিতরে পুজো করছিলাম। ওসব কিছু দেখিনি বাবা। মন্দির থেকে বের হয়ে দেখি মাঠে গোলমাল হচ্ছে। চোখেও ছানি পড়েছে। দূরের জিনিসও ঠিক দেখতে পাই না। আমি গোলমালে না গিয়ে ওই দিকে চলে গেছলাম।

পুলিশ অফিসার বলেন,

—পচা-ধরণী মুখুজ্যেদের মধ্যে মারামারি কি দেখেননি? কে কাকে মেরেছে?

—না বাবা। ওদিকেই যাইনি। গোলমালে খুব ভয় করে বাবা, বুক ধড়ফড় করে। তাই চিৎকার শুনেই চলে এসেছি।

নটবর বলে,

—তা হলে আপনি কিছুই দেখেননি!

—না বাবা।

পুলিশ অফিসার কাগজে কীসব লিখে বলে—,

—পড়ে নিয়ে সই করুন।

নটবর বলে,

—আপনি যা যা বলেছেন তাই লিখেছে, সই করুন।

সতীশ সই করে দেয়। ওরা চলে যায়। পুলিশ অফিসার বলে,

—আপনাকে পরে দরকার হতে পারে।

নটবর বলে,

—ওঁকে পাবেন, চলুন।

সতীশকে বুঝিয়ে রেখে চলে গেল ওরা। কী হবে জানে না সতীশ। পিয়ালীকে দেখে ফিরছে সে। মুখ, চোখ গম্ভীর। পিয়ালীও দেখছে পুলিশের সঙ্গে নটবরকে বের হয়ে যেতে। সতীশ বলে।

— কোথায় থাকিস? পুলিশ এসেছিল। ভাগ্যিস নটবর ছিল। কী ঝামেলায় যে পড়লাম।

পিয়ালী জবাব দেয় না। আজ তার মনও বিষিয়ে গেছে—

নটবর পুলিশের কেসটাকে বেশ সাজিয়েছে। সতীশ চাটুজ্যের সাক্ষীও ধরণীর বিপক্ষেই যাবে। নটবর বাড়ি ঢুকছে। বাসন্তীকে দেখে চাইল। বাসন্তী তখনও ফুঁসছে। বাসন্তী বলে,

—ওই সতীশ চাটুজ্যের মেয়েটাকে আজ বাড়ি থেকে তাড়িয়েছি।

নটবর সতীশ চাটুজ্যের নাম শুনে চাইল। এখন তার ওই লোকটাকে দরকার, তবে আজ লোকটার তার কথামতোই সাক্ষী দিয়েছে, তবু নটবর বলে,

—কেন? কী করল পিয়ালী। ও তো শুনি ভালো মেয়ে।

—ছাই। আর ভবেশকেও বলেছি ওর সঙ্গে যেন একদম মেলামেশা না করে।

নটবর এবার ভাবনায় পড়ে। সতীশ চাটুজ্যেকে সেও ভয় করে। কখন কোনদিক ফুঁড়ে বের হবে তা কেউ জানে না। সতীশকে নটবর চাপ দিয়ে মিথ্যে কথা বলাচ্ছে— তাই সতীশও অন্যদিক দিয়ে ঘা মারতে পারে। ভবেশকে নিয়েও তার সমস্যা। নটবর তাই বলে,

—তাই নাকি। তা ভালোই করেছ। আমিও ভবেশকে বলে দোব আর নজর রাখছি ওই মেয়েটার ওপর। আমার সঙ্গে চালাকি করে পার পেতে দোব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

নটবরও সাবধান হবে এবার। এখন সে সমাজের উপরতলার লোক। তাই ওই হতচ্ছাড়াটা তার যাতে কোনো ক্ষতি না করতে পারে সেই চেষ্টাও করতে হবে। তার আভিজাত্য বজায় রাখতেই হবে। ভবেশকে সে আরও পড়াবে। তার বিয়ে দেবে শহরের বড় কোনো ব্যবসায়ীর মেয়ের সঙ্গে। এখন তার নজর উপরের দিকে।

কিশোরও নজর রেখেছিল এইসব ঘটনার দিকে। কিশোর এবার ধরণী মুখুজ্যের ছেলেদের ডাকিয়ে আনে তার বাড়িতে। ধরণীবাবু হাসপাতালে। পুলিশ নটবরের চাপেই অ্যারেস্ট করেছে তার দুই ছেলেকে। অবশ্য দুজনেই জামিনে খালাস পেয়েছে। নটবর চায় মামলা চলুক। আর ধরণীর দুই ছেলেকে জড়াতে পারলে তারও সুবিধে হবে। ধরণীর বড় ছেলে হরিহর কিশোরকে বলতে কিশোর বলে,

—তোমরা মামলা চালাও, আর আমি দেখছি। শহরের নামী উকিল তোমার মামলা লড়বে। খরচ-খরচা আমিই দোব, ওই ব্যাটা পচা যে দোষী তা প্রমাণ করতে পারলে জেল হবে ব্যাটার,

হরিহর বলে,

—ওই সতীশ কাকাও সব দেখেছে।

কিশোর ওই কথা শোনার পর কী ভাবতে থাকে।

সতীশ চাটুজ্যে এতদিন বেশ শান্তিতেই নিজের পথে তার দিন গুজরান করত। অভাব-অভিযোগও ছিল তার সংসারে। তবু শান্তি ছিল। এখন নটবর তাকে জোর করে মিথ্যা কথাই বলাতে চায় তাতে অন্যের ক্ষতি হবে সেটা মেনে নিতে পারে না সতীশ চাটুজ্যে। পিয়ালীও এখন সব জেনেছে।

অবশ্য নটবরও বসে নেই।

সেও দুপুরের ওই ঘটনার জন্য ভবেশকে বলেছে।

—এসব যেন ভবিষ্যতে আর না শুনি। আমরা গ্রামের মাথা, গ্রামের ওই হতচ্ছাড়া ঘরের মেয়েকে জড়িয়ে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলুক তা আমি চাই না।

ভবেশ ভাবতেই পারেনি পিয়ালীর তার কাছে পড়ার জন্য আসাটাকে কেন্দ্র করে এমন একটা ঘটনা ঘটবে। গ্রামের মানুষ আজ আধুনিক হবার চেষ্টা করছে—ওদের মনের আড়ালেও সেই আদিম ভাবনাগুলো বাসা বেঁধে আছে। তাকে দূর করা যাবে না। বাইরের খোলসটাই বদলাবার চেষ্টা করছে ওরা। ভিতরটাকে তেমনই অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে।

ভবেশ বলে,

—এসব মিথ্যা কথা।

—তোমার মা যা দেখেছে তা মিথ্যা নয়। শেষবারের মতো বলছি ওই মেয়েটার সঙ্গে একদম মিশবে না। ওটা নিশ্চয়ই কোনো বদ মতলব নিয়ে এসেছিল। ওর বাবা বহুত ধান্দাবাজ।

ভবেশ চুপ করে থাকে। পিয়ালী কোনো অন্যায়ই করেনি। তবু এরা তাকে একটা বদনামই দেয়। ভবেশ জানে পিয়ালী গ্রামের লোকেদের জন্য কত কী করেছে। এখন গ্রামের মেয়েরা নিজেরাই সমবায় করে তাঁতের কাজ করছে। আরও অনেক কাজই করছে। পিয়ালী শহরে যাতায়াত করে ব্যাংকের লোকেদের গ্রামে এনে তাদের কাজ দেখিয়ে টাকার ব্যবস্থা করেছে। সারা এলাকায় মেয়েদের মধ্যে পিয়ালী একটি পরিচিত নাম।

নটবরের রাগটা সেখানেই। পিয়ালী পঞ্চায়েতের সাহায্যও চেয়েছিল বারবার। তবে ওদের কোনো সাহায্যই পায়নি। তবু পিয়ালী বিনয়বাবুদের সাহায্য নিয়ে মহিলা সমিতি গড়েছে আর তা সুষ্ঠুভাবে চালাচ্ছে।

নটবর এসব পছন্দ করে না। তাই পিয়ালী-ও এবার যেন নটবরের ওই অবজ্ঞার প্রতিশোধ নিতেই ওর ঘরে সিঁদ করতে চায় ভবেশকে হাতে এনে। নটবর সে জন্যই চটে উঠেছে। সেদিন পিয়ালী অন্য গ্রাম থেকে সাইকেলে ফিরছিল। নটবরও আসছিল। মহুয়া বনের পথে ওকে দেখে নটবর থামল, পিয়ালী ওকে পথ আটকে মোটরবাইক দাঁড় করাতে দেখে বলে,

—কিছু বলবেন?

—এখন তো তুমিই দেখছি মহিলা সমিতির লিডার হয়ে গেছ।

পিয়ালী বলে,

—লিডার তো আপনারা, আমি মেয়েদের জন্য কিছু কাজ করার চেষ্টা করি মাত্র অন্যদের নিয়ে। লিডারের দরকার নেই—আমি কাজ করতে চাই।

নটবর দেখছে মেয়েটাকে। ওর কথায় বেশ একটা সতেজ ভাবও রয়েছে। মেয়েটা বেশ ডাকাবুকো। আর লেখাপড়াও সে নটবরের চেয়ে অনেক বেশিই জানে। বলতেও পারে ভালো। নটবর বলে,

—বোলচাল বেশ ফুটেছে দেখছি। শোনো আমার সঙ্গে টক্কর দিতে এসো না, আর ভবেশের দিকে নজর দিও না, তাতে ফল ভালো হবে না। পিয়ালী ভাবেনি যে ওই ব্যাপার নিয়ে নটবরও এসব কথা বলবে। পিয়ালী বলে,

—আমি কোনো স্বার্থ নিয়ে কাজ করি না। আপনার ছেলের দিকে নজরও দেবার সময় নেই। এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আর মনে রাখবেন গরিব হতে পারি, তবু আত্মসম্মান আমাদেরও আছে। এমন নীচ অপবাদ দেবেন, এটা জানলে আপনার বাড়িতে মাড়াতে যেতাম না। জবাব দিয়ে সাইকেলে উঠে চলে গেল পিয়ালী। নটবরের মুখের উপর এ ভাবে কেউ জবাব দিতে সাহস করে না। কিন্তু ওই মেয়েটা সেই সাহসই দেখিয়ে গেল। নটবর অসহায় রাগে গজরাচ্ছে।

পিয়ালীর মহিলা সমিতিতে এখন পচার বউ কামিনী নিয়মিত আসে। পিয়ালী এখন বিনয়বাবুর বাড়ির পাশেই একটা ফাঁকা জায়গাতে সমবায়ের ঘর—শেডও বানানো পুরোদমে কাজ শুরু করেছে। বহু অসহায় মেয়ে—বহু অনাথা বিধবা ওখানে নানা কাজ করে কিছু রোজগার করে। এদিকে তাঁতও চলছে। শহরের মহাজনরা ওসব মাল কিনে নিয়ে যায়। সেলাই কল চলে খান পাঁচেক। দু-দল কাজ করে মেশিনে। দুর্গাপুর থেকে মহাজনরাও তাদের তৈরি তাঁতের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ নিয়ে যায়। কামিনী তাঁতঘরে কাজ করে, তারও সময়টা কেটে যায়। সন্ধ্যায় মেয়েদের জন্য স্কুলও বসে। কামিনী পড়াশোনা করে এখানে। দুপুরে মহিলা সমিতির মেয়েদের কাছে কিছু পয়সা নিয়ে একসঙ্গে এখানে দুপুরের রান্নাও হয়। ডাল-ভাত-তরকারি—এই তাদের কাছে ঢের। আর খাবারের নিশ্চয়তা পেয়ে ওরা খুশি।

কামিনী শুনেছে পচার এই জমি নিয়ে গোলমালের কথা, সেও দেখেছে তার স্বামী এখন কেমন যেন বদলে গেছে। নটবরের রাতের কারবারেও পচা ভালো রোজগার করে। কামিনী পচার ওপর চটে ওঠে ওই ধরণী মুখুজ্যেকে মারার কথাটা শুনে। কামিনী ওর স্বামীকে বলে,

—তুমি নিজে তো জমি চাষ করো না। তুমি যা করছ তা ডাকাতি।

—চুপ কর। পচা ধমকে ওঠে।

কামিনী বলে,

—ধমকে আমাকে থামাতে পারবে না। তুমি যা করছ তা ঠিক নয়।

পচা দেখছে কামিনীকে। কামিনী বলে,

—ওই দেবতুল্য মানুষটাকে খুন করতে গেলে, তুমি খুনী। আর নুটুবাবুদের কথায় ওকেই পুলিশে ধরল। ওর ছেলেদেরও কয়েদে পাঠালে। ধম্ম আছে গো—আর এও বলছি ধম্মই এর বিচার করবেক।

পচা হাসে। এখন সে বাড়িতে বসেই মদ গেলে সঙ্গীদের নিয়ে। পচা গলায় মদ ঢালতে ঢালতে বলে,

—দেখবে নুটুদার এলেম। দেখবি ওই মুখুজ্যে গুষ্টিকেই। শালা যে মাথা তুলবে তাকেই খতম করে দোব। আমার ক্ষমতাও দেখছিস তো। কামিনী বলে,

—কত এল, কত গেল। ওই নরেশদা গেল, এবার নটবরও যাবে। আর তোমার মদ্দানিও থাকবে নাই। তাই বলি অন্যায় কাজ ঢের করেছ আর কোরো না। সর্বনাশ থেকে যদি বাঁচতে চাও লোকের শাপ আর কুড়িয়ো না।

পচা বলে,

—থামবি। খুব যে কথা তোর।

—ভালো কথাই বলছি। শুনলে ভালোই হবে।

—না শুনলে?

কামিনী বলে,

—বিপদ হবে গো, যা করেছ তা ঠিক নয়। মানুষের দীর্ঘশ্বাস আর শাপ কুড়িয়ো না।

পচা খ্যাক-খ্যাক করে হেসে ওর চ্যালাকে বলে,

—শোন খুদি। কামিনী ওই পিয়ালী বুড়ির পাঠশালে পড়ে কত কী শিখেছে। শালি পণ্ডিত হয়েছে—

কামিনী সরে আসে ওই মাতালের আসর থেকে। তার স্বপ্নের গড়া ঘরকে পচা এখন ওই সব নানা অপকর্ম আর মদের ঠেকেই পরিণত করেছে। নটবরবাবুর পাল্লায় পড়ে সেই ডাকাত পচা আজ আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে।

পিয়ালীকে সেই কথাটা বলে কামিনী।

—সব আমার হারিয়ে গেল দিদি। ভেবেছিলাম মানুষটা সুখে-শান্তিতে ঘর বাঁধবে। কিন্তু ওদের পাল্লায় পড়ে একেবারে বদলে গেছে, এর ফল ওকে পেতেই হবে।

পিয়ালী জানে ওই নটবরদের লালসার উত্তাপে গ্রামজীবনের সবশান্তি সুরও যেন হারিয়ে গেছে।

সতীশ চাটুজ্যে এসেছে কিশোরের কাছে। কিশোর তার অনেক দিনের চেনা। নন্দবাবুর শরীরটাও খুব খারাপ। কিশোর সতীশ চাটুজ্যেকে বলে,

—আপনাকে নটবর কী বলেছে? ধরণীকাকার মতো লোককে মিথ্যা খুনের দায়ে ফেলবে আর আমরা চুপ করে থাকব?

সতীশও এবার কিছুটা ভরসা পায়, সে বলে,

—তাই তো চায় ওরা।

কিশোর বলে,

—আপনি নাকি কিছুই দেখেননি? এইসব কথা বলেছেন পুলিশকে?

নন্দ বলেন,

—সতীশ, আরে আমি তো মরিনি। তোমার ভয় কী? তুমি যা দেখেছ তাই বলবে।

সতীশ বলে,

—তাই তো বলতে চাই, কিন্তু চেনো তো ওই নটবরদের ওরা যদি কিছু করে? তাই পুলিশকে বলেছি কিছু দেখিনি।

নন্দ বলেন,

—আরে উকিল বরদাবাবুকে চেনো তো। দুঁদে উকিল। তুমি বলবে নটু পুলিশ তোমাকে ওসব কথা বলিয়েছে। ওসব সত্যি নয়। যা দেখেছ তাই বলবে। দেখবে পচার জেল হবেই। আর নটবরদের দাপটও কমবে। ওই ডাকাতগুলোর সাজা হওয়াই উচিত।

সতীশও ভাবছে কথাটা, সে বলে,

—আমি একটু ভেবে দেখি, তারপরে জানাবো,

কিশোর ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে একটা নোটের বাণ্ডিল বের করে সতীশকে দিতে আসে। সতীশ নোটগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কিশোর বলে,

—এটা রাখো সতীশ কাকা। আড়াই হাজার টাকা আছে। পরে আরও পাবে ব্যাটাদের জেল হলে। শুধু সত্যি কথাটাই বলবে।

সতীশ বলে,

—ওটা রাখো বাবা। লোভ দেখিয়ো না, গরিব মানুষ—পিয়ালী জানতে পারলে বিপদ হবে। এতদিন টাকার জন্য দেশগাঁয়ে বামুন হয়ে মিছে কথা বলেছি। এবার টাকার জন্য নয়—সত্যের জন্যই সত্যি কথা বলব। ও টাকা চাই না।

বের হয়ে যায় সতীশ। নন্দ, কিশোর দেখছে সতীশকে।

সতীশ পিয়ালীকে এসে কথাটা বলতে পিয়ালীও ভাবছে। সে নটবরের সেই অপমান শাসনটা ভোলেনি। ওরা সারা এলাকার মানুষকে ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখতে চায়।

পিয়ালীর মনে পড়ে বিনয়বাবুর কথাগুলো।

—মাথা নীচু করলে ওদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যাবে না।

পিয়ালী বলে,

—বাবা তুমি সত্যি কথাই বলবে। আমাদের তো হারাবার আর কিছুই নেই তাই ভয় পাবারও কিছু নেই।

সতীশও এবার মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে বলে,

—তাই বলব মা। তাতে যা হয় হোক। আমি কিশোরকে জানিয়ে দিচ্ছি।

নটবর দেখছে পচার ওই জমি দখলের লড়াইয়ে ওদের পাশে থাকার জন্য এলাকার বেশ কিছু জমির মালিক তাদের সমীহ করতে শুরু করেছে। আর সাধারণ চাষিদের একটা শ্রেণিও খুশি হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে গ্রামের বহুলোক এত বড় মিথ্যাচারকে ঠিক মেনে

নিতে পারেনি। তবে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও তাদের অখুশি ভাবটা চোখে পড়ে। অবশ্য তাতে কিছু যায় না ওদের। নটবরের এক সঙ্গী বলে,

—কিন্তু ভোটের সময় যদি গড়বড় করে।

ওর কথায় নটবর বলে,

—ভোটের সময় ওদের বাড়িতে আটকে দোব। ওদের ভোট দেব আমরা, কে ঠেকাবে?

নটবর তা জানে। তাই ওরা বেপরোয়াভাবেই পচার কেস লড়ছে।

সেদিন আদালতে কেস উঠেছে, নটবর গেছে। সে জানে এ মামলার রায় তাদের হাতেই। কাঠগড়ায় সতীশ চাটুজ্যে, এবার প্রতিপক্ষের দুঁদে উকিল বলে,

—ধর্মাবতার ওরা সাক্ষীকে ভয় দেখিয়ে অন্য কথা বলিয়েছে।

সাক্ষীকে প্রকৃত বয়ান মহামান্য আদালতের কাছে পেশ করতে দেওয়া হোক।

এই পক্ষের উকিল অবশ্য বাধা দিতে থাকে। নটবরও অবাক হয়। সতীশ চাটুজ্যেকে কিশোরের সাথে আসতে দেখে, নটবর ভাবেনি যে কিশোর তাদের বিরুদ্ধে এইভাবে রুখে দাঁড়াবে। আর সতীশ চাটুজ্যেকে জজসাহেব নিজেই বলেন,

—আপনি বলুন কী দেখেছিলেন?

সতীশই একমাত্র সাক্ষী দিতে এসেছে। সে এই মামলার অন্যতম প্রধান সাক্ষী। সে এবার জজ সাহেবকে যা যা ঘটেছিল তা সবই বলতে থাকে।

পচাই যে দলবল নিয়ে এসে ধরণী মুখুজ্যের উপর চড়াও হয়ে তাকে আক্রমণ করে। তাকে লাঠি দিয়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। আর ওরা কোনও প্রতিবাদই করেনি। ওই ধরণীর বড় ছেলে হরিহরের কোনও ভূমিকাই ছিল না এ কথাও বলে সতীশ।

নটবর বুঝেছে যে কেস এবার অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। পচাকেই এবার আদালত আসামী করার কথা ভাবছে। নটবরের উকিল অবশ্য সতীশকে জেরা করে,

—আপনি তো চোখে কম দেখেন—

সতীশ বলে,

—কাছ থেকে সবই স্পষ্ট দেখতে পাই স্যার। আপনার গালের আঁচিলটাও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তবে পচা ধরণী মুখুজ্যের মাথায় লাঠি মারল এটা দেখতে পাব না কেন।

আদালতে হাসির রোল ওঠে। সেদিনের মতো কেস মুলতবি হয়ে রইল।

কিন্তু এবার নটবরকে তার উকিল বলে,

—কেস উলটে গেল মশাই, পচা তো বর্গাদারও নয় ওর কোনও রেকর্ডও নেই। ও যে আইনত জোর করেই জমির দখল নিতে গিয়েছিল তার পর ধরণীকে খুনের চেষ্টা করেছিল। তিনশো দু' ধারার কেস পচা লোহারকে আর বাঁচানো যাবে না নটবরবাবু। ওর জেল হবেই আর শুধু ওরই নয় ওই চারজন সাগরেদদেরও জেল হবে।

পচা লোহারও এসেছে সঙ্গে। খুনের দায়ে যাবজ্জীবন জেল হবার সম্ভাবনার কথা শুনে সেও ঘাবড়ে গেছে। পচা বলে।

—বাঁচান নুটুবাবু। এখন কী হবে?

নটবরও ভাবনায় পড়ে। পচা ও তার দলবলের জেল হলে এলাকায় তাদের শক্তি কমে যাবে, ওরা জানে ওদের জোরেই এতবছর জিতে আসছে, ওরাই নটবরের শক্তির উৎস।

নটবর ভাবছে।

সে এবার ধরণী মুখুজ্যের বাড়িতেই যায়। ধরণী এখন বাড়িতে এসেছে নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক সে। এভাবে একটা হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়বে তা ভাবেনি। নটবর বিকেলে সতীশ চাটুজ্যে ফেরার আগেই তার উকিলকে নিয়ে সোজা গাড়ি নিয়ে চলে আসে গ্রামে ধরণীর বাড়িতে।

নটবর জানে কেসের পর ধরণীর ছেলেরা আজ রাতে সদরে থেকে তাদের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করবে। কালই আবার মামলার শুনানি। সতীশকেও ওরা রাখবে শহরের হোটেলে ওদের সঙ্গে। কাল হয়তো সতীশকে দরকার হতে পারে। সেই ফাঁকে নটবর উকিলকে নিয়ে গ্রামে আসে। ধরণীও ভাবছে কথাটা। ও জানে না যে আজই তার মামলার মোড়ই ঘুরে গেছে।

নটবরকে আসতে দেখে চাইল ধরণী মুখুজ্যে। নটবর এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে। সঙ্গে এনেছে একটা ঝুড়িতে বেশ কিছু ফল, দু-তিনটে হরলিকস। শহরের সন্দেশ, ধরণীও অবাক—

নটবর বলে,

—কদিন থেকেই কথাটা নিয়ে আমার অফিসেও আলোচনা হয়েছে। পচা লোহার যে এইভাবে একটা কাণ্ড বাধাবে এটা ভাবিনি, ওকে অফিসে ডেকে আমরা খুব তিরস্কার করেছি।

ধরণী বলে,

—কী কাণ্ড দ্যাখো বাবা। দেশে কী আইন নেই। আমার জমিতে আমি যেতে পারব না। বর্গাদারি তো দিইনি ওকে, ওর বাবাও কিছু বলেনি। ও কিনা আমায় এইভাবে মারল।

নটবর বলে,

—খুবই অন্যায় করেছে। ওদিকে বিনাদোষে হরিহরের সরকারি চাকরিতে সাসপেন্ড হয়ে গেল। কম ক্ষতি বলুন?

—তাই এলাম কাকা, হরিহরের চাকরিতে বাধা না হয় সেটাও ভাবা দরকার।

ধরণী বলে,

—কী যে করি! ছেলেটাও ফেঁসে গেল।

নটবর বলে,

—কোর্ট কাছারির ফয়সালা হতে কতদিন লাগবে তা কে জানে।

আবার দেখলাম ওই কিশোরও বাগড়া দিচ্ছে। এভাবে চললে তো মামলাও আর মিটবে না।

ধরণীর গিন্নীও বলে,

—কী যে হবে বাবা?

নটবর বলে,

—পচাকে একছটাক জমিও ছাড়বেন না। ওটাকে আমিই ধমকে দিয়েছি। আপনি কেসটা তুলে নিন। ওই জমির দখল নিয়ে কালই চাষ দেবেন। মামলা তুলে নিলে হরিহরও চাকরিতে জয়েন করতে পারবে। পচাকে আমরা পঞ্চায়েত থেকেই যা করার করব। এখানে পুলিশও ওর উপর কড়া নজর রাখবে। ব্যাটাকে সামাজিক দণ্ডই দেব।

ধরণী বলে,

—হরিহর আবার চাকরিতে জয়েন করতে পারবে?

উকিলবাবু বলেন,

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এসব কেস মিটিয়ে নিচ্ছি এই মর্মে কোর্টে দরখাস্ত দিয়ে মিটিয়ে নেব। অভিযোগও থাকছে না —তখন কেসও খারিজ হয়ে যাবে। সব কিলিয়ার।

নটবর বলে,

—তারপর পচাকে দেখছি। আমাকে ভরসা করুন—ছিঃ ছিঃ গ্রামের সুনাম নিয়ে টানাটানি।

—সব মিটে যাবে তো বাবা।

উকিলবাবু বলে,

—আমি সেই মতো কাগজ করে এনেছি। কোনও প্রবলেমই আর থাকবে না। দেখুন এই দরখাস্তনামা।

ওরা সেই মতো কাগজ তৈরি করেই এনেছিল। সেটাই বের করে দেয়।

হরিহর সতীশ চাটুজ্যেরা আজ উকিলবাবুর কাছে ভরসা পেয়েছে। কালই পচা লোহার ও অন্যান্যদের সাজার হুকুম দেবে আদালত। এবার খুনের চেষ্টার মামলার রায় বেরোবে।

সতীশ চাটুজ্যেও খুশি। এবার জীবনে অনেক ঝুঁকি নিয়ে সে সত্য কথা বলে ওদের বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে।

পরদিন আদালতে গেছে ওরা। এর মধ্যে নটবরও এসেছে। আর এবার কিশোর নটবরকে বেশ বিপদেই ফেলেছে। পচার দলকে জেলে ঢোকাতে পারলে সামনের ভোটে নটবরকে সে হারিয়ে দিতে পারবে। আবার তাদের হারানো পদ ফিরে পাবে।

আজই যেভাবে হোক পেশকারকে ধরে কেসটা প্রথমেই তুলবে। কিন্তু তার আগেই নটবরের উকিল ধরণী মুখুজ্যের স্ট্যাম্প পেপারে সই করা সিলনামা কাগজটা জমা দিয়েছে। ধরণীবাবু আর মামলা করতে চান না। তাঁর জমি তিনি ফেরত পাচ্ছেন। গ্রামের শান্তি সদ্ভাব বজায় রাখার জন্য তিনি মামলা তুলে নিচ্ছেন। আসামীরাও অনুতপ্ত। গ্রাম সমাজও এটা চায়।

যার ফলে ওই মামলা খারিজই হয়ে গেল। কিশোরও এবার বুঝেছে নটবরই এর মধ্যে এইসব করে মামলার নিষ্পত্তি করে দিয়েছে। হরিহরও নিশ্চিন্ত হয়। সেও কোর্টের ওই মামলা খারিজের কপিটা নিয়ে চলে যায় ওর অফিসে। এবার তার চাকরিতে জয়েন করারও বাধা হয় না।

কিশোর বলে।

—সতীশকাকা, তবু তোমার কথাতেই এই কাজ হয়েছে। তবে জোর বেঁচে গেল ওরা।

সতীশ বলে,

—তবু গ্রামে শান্তি আসুক। ছেলেটার চাকরি নিয়ে টানাটানি হচ্ছিল তবু একটা মীমাংসা হল।

পচা আর তার দলবল জোর বেঁচে গেছে। অবশ্য পচার রাগটা যায় না।

জমি সে পায়নি। নটবরের জন্যেই জমি পায়নি।

নটবর বলে,

—জমি পেতিস কি না কী জানি, তবে ওই সতীশ চাটুজ্যের সাক্ষীতে তোকে খুনের দায়ে ধরত পুলিশ। কোনোমতে বাঁচালাম।

সেটা অবশ্য বুঝেছে পচা।

কামিনী সবই শুনেছে পিয়ালীর কাছে। পচা যে এমনি একটা বিপদে পড়বে তা ভেবেছিল। এই কেস চললে পচার দীর্ঘদিনের জন্য জেলবাসেরই হুকুম হত।

কামিনী বলে পচাকে।

—এখনও সাবধান হও তুমি। না হলে আর ছাড়া পাবে না।

পচা জেনেছে ওই নটবরবাবুই তার ভগবান। সে কলকাঠি নেড়ে ওকে বাঁচিয়েছে। তাই নুটুবাবুর আশপাশে থাকলে তার কোনও দিনই কোনও ক্ষতি হবে না।

পচা বলে।

—নুটুদা থাকতে আমার গায়ে ভগবানও হাত দিতে পারবে না।

কামিনী বলে,

—তোর নুটুদা কি ভগবান রে। তার মার তোর নুটুদাকেও খেতে হবেক। তাই বলছি ওই লোকটার সঙ্গ ছাড়।

কিন্তু পচা এখন টাকা প্রতিষ্ঠার স্বাদ পেয়েছে। কয়লার কাজ করেও এখন ভালো টাকা আসছে আর আশার কথা এই পঞ্চায়েতে দুতিনটে সিটও সিডিউল কাস্টদের জন্য সংরক্ষিত আছে। নুটুদাই এবার তাকে ধরেছে পঞ্চায়েতের সভ্যপদেই ওই সিট থেকে পচাকে দাঁড় করাবে।

পচা এখন গদির স্বপ্ন দেখছে।

কামিনীর কথায় পচা বলে,

—এবার পঞ্চায়েতের সভ্য হব। ভদ্দরলোকেদের পাশের চেয়ারে বসে পঞ্চায়েতের খাতায় টিপছাপই দেব।

কামিনী অবাক হয়। ও এসব পছন্দ করে না, সরকার কিছু সংরক্ষিত আসন রেখেছে পঞ্চায়েতে। সেখানেও ওই নটবরবাবুর মতো বর্ণান্ধ লোকেরা তাদের পেটোয়া কিছু অযোগ্য লোককেই বসায়। তাদের শিখণ্ডী খাড়া করে নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করে। কোনও যোগ্য মানুষকে তারা আনে না।

কামিনী বলে,

—ভূতের ভয়ে উঠলাম গাছে। ভূত বলে পেলাম কাছে। ওই ভূতই তোর ঘাড় মটকাবে একদিন।

বিনয়বাবু ওসব শুনেছেন পিয়ালীর কাছে। রমলার সমবায় এখন ভালোই চলছে। বিনয়বাবু বলেন,

—পাশাপাশি স্কুলটা চালাও। লেখাপড়া শেখাও ওই নিচুতলার মানুষকে। গণতন্ত্রের মূল লক্ষ্য সব মানুষের জন্য স্বাধীনতার স্বাদ। যার কোনও চেতনাই নেই সে এই স্বাধীনতার স্বাদ পাবে কী করে? শিক্ষাই পারে সেই চেতনা আনতে। আমরা কলকারখানা গড়েছি, গ্রামজীবনে সাধারণ মানুষকে সুযোগ-সুবিধা শিক্ষা চিকিৎসা জীবিকার সন্ধান দেবার জন্য অনেক পরিকল্পনাই করেছি। কিন্তু যারা এ মহান যজ্ঞে ব্রতী হবে সেই মানুষদের তৈরির কাজও করিনি।

পিয়ালী বলে,

—কিন্তু সুস্থ সমাজ তাহলে কি গড়ে উঠবে না কোনওদিন?

বিনয়বাবু বলেন,

—নিশ্চয়ই গড়ে উঠবে। মানুষ বিবর্তনের মধ্যে দিয়েই সেই পথে পৌঁছবে। এই প্রজন্মের হতাশার মধ্যে দিয়েই অবক্ষয়ের মধ্যে দিয়েই নতুন প্রজন্ম সেই সমাজকে গড়ে তুলবেই। এ বিশ্বাস আমার আছে পিয়ালী।

কিছু মানুষ সম্পদ, সমাজ, দেশের কথা, মানুষের কথা ভাবে। অন্যদিকে একদল মানুষ তাদের নিজেকে কেন্দ্র করেই বাঁচার স্বপ্ন দেখে। নটবর নরেশ আর পচারা ভাবে নিজেদের কথাই।

এখন পচা নটবরের সঙ্গেই রয়েছে। পচা জানে ওই নুটুদাই তাকে বেশ কয়েকবার জেল থেকে বাঁচিয়েছে। পচার মনে পড়ে কয়েক মাস আগের কথা। সেদিন পচা নটবরকে ওই পঞ্চায়েতের সদস্য করে দেবার জন্য বলেছিল, নটবরও তাই চায়। তাই সেও সেদিন পচাকে বলে।

—আমি তো তোর নাম করেছি কিন্তু নরেশদা তোকে চান না।

—কেনে? কেনে আমাকে লিবে নাই? পচা গর্জে ওঠে।

নটবর ওকে বেশি চটিয়েছে মদের জন্য। পচাও সভ্যপদ পাবার খুশিতে আকণ্ঠ মদ গিলেছে। তার পর এসব কথায় বলে,

—আমি কি কিছু করিনি নরেশদার জন্য? কেন আমাকে সভ্য করবে না। সভ্য হবার জন্য পচার ব্যাকুলতার মাত্রাটা নিদারুণ করে নটবর বলে,

—ও থাকতে তোকে মেম্বার করবে না রে।

—মানে! পচা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। নটবর দেখছে ওকে।

নটবর বলে,

—ও থাকতে কোনও দিন্নই সভ্য হতে দেবে না। আমি তো তোকেই করব ঠিক করলাম। কিন্তু নরেশদা চান না। তবে একটা কাজ করতে পারলে তোর মেম্বার হতে আর কোনও বাধা থাকবে না।

পচা বলে,

—বলো নুটুদা সে কাজই করব, পচাকে কুন শালাই রুখতে পারবে না। বলো কী কাজ?

নটবর বলে,

—খুব কঠিন কাজ রে। খুব বিপদের কাজ, থাক ওসব কথা।

পচার মাথায় তখন নেশার উন্মাদনা। তাকে সভ্য হতেই হবে। পচা বলে,

—থাকবে কেনে? না বলো তুমি—আমি সে কাজ ঠিকই করব। বলো কী করতে হবেক?

এরপরই নটবর ওই কাজের কথাটা বলতে পচা মিনিটখানেক চুপ করে কী ভাবে, তারপর কঠিন কণ্ঠে বলে,

—ওর জন্য ভেবো না। উ কাজ করে দোব। আমাকে মেম্বর হতেই হবেক। শুধু তুমি একটু সামলে নিও।

নটবর বলে,

—ভালো করে ভেবে দ্যাখ পচা। কেউ যদি জানতে পারে মহা বিপদ হবে। তখন আর বাঁচানো যাবে না।

পচা বলে,

—ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আমি লোকের চোখ থেকে কাজল চুরি করে এনেছি আগে। ই কাজও দু-একটা করেছি, আজও পারব। কেউ জানতে পারবে না।

সেদিনের পর থেকে পচা মওকা খুঁজছে। সেও নজর রেখেছিল নরেশবাবুর গতিবিধির উপর। এর কয়েকদিন পরই হাতে হাতে সুযোগও পেয়ে যায়। সেই রাতে পচাও ছিল বাস স্টপেজের আশপাশে। বনের মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দেখে শেষ বাসে নেমেছেন নরেশবাবু। কোন রিকশাও নেই। নরেশ একাই চলেছেন বনের পথে। ঝোপের আড়াল থেকে ওর পিছু নেয় পচা।

তার হাতের টাঙ্গিটা মজবুত করে ধরা। বনের এমাথায় এসেছেন নরেশ। লোকালয়ও কাছে নেই। পচা এসময় লাফ দিয়ে এসে ওর ঘাড়ে পড়ে। সজোরে টাঙ্গির কোপটা মারতে ছিটকে পড়ে নরেশ বৃষ্টিভেজা মাটিতে। পচা আরও দু একটা কোপ মেরে ওর প্রাণহীন দেহটাকে ফেলে রেখে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। বনে গড়ানো জলে টাঙ্গিটা ধুয়ে এবার ঘুরপথে এসে বাড়িতে ঢোকে।

তখনও উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছে সে। কামিনী জেগেই ছিল। এত রাতে ওকে ওইভাবে ফিরতে দেখে চাইল। দেখে জলে-কাদায় ভিজে গেছে।

কামিনী বলে,

—কোথায় ছিলে এত রাতে? এই বাদলার মধ্যে।

পচা জবাব দেয় না। শীতে বৃষ্টিতে ভিজে কাতরাচ্ছ সে। কাপড়টা ছেড়ে ওদিকে রেখে হাতটা ধুয়ে কাপড় বদলে এবার একটা মদের বোতল নিয়ে বসে। তাজা মদই গলায় ঢালতে থাকে।

কামিনী দেখছে ওকে। পচার চোখেমুখে যেন আদিম হিংস্রতার ছাপটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। কামিনীর মনে হয় ও নিশ্চয়ই কিছু করে এসেছে কোথাও। লোকটাকে সে চেনে, কিছুদিনের জন্য বদলেছিল মাত্র। কিন্তু আবার ওকে দিয়ে ওরা সেই সব অমানবিক কাজগুলোই করাচ্ছে আর অমানুষ বানিয়ে তুলছে তাকে।

পরদিন সকালেই নরেশবাবুর খুনের খবরটা সমস্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষজনও ছুটে যায় সেই বনের ধারে। ওদিকে নটবরও বের হয়ে পড়েছে হাটতলায়, ওদিকে বাজারের দোকানপাটও সব বন্ধ হয়ে যায়। সারা এলাকায় হইচই পড়ে যায়। পচাও নুটুদার সঙ্গে বের হয়েছে। নুটুদার চোখে জল। তার বড়ভাই, শিক্ষাগুরু মারা গেছে।

কামিনী খবরটা পেয়ে চমকে ওঠে। কালরাতে পচার হিংস্র মুখখানা মনে পড়ে। সে এবার ওই হামড়ের নীচে রাখা পচার গতরাতের জলকাদামাখা ধুতিটাই বের করে। একটু দেখতেই চমকে ওঠে। পচাও রাতের অন্ধকারে হয়তো খেয়াল করেনি। তার কাপড়ে বেশ অনেকখানি রক্তের দাগ। কামিনী শিউরে ওঠে। এতবড় একটা রহস্যের কিনারা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হয়ে যায় তার কাছে। কিন্তু একথা তো কাউকে বলা যাবে না। কামিনীর নিজের উপরেই আজ ঘৃণা হয়। সে একটা নরপশুর সঙ্গে নিজের জীবনকে জড়িয়েছে।

এই মহাপাপের শাস্তি তাকে পেতেই হবে। আপাতত ধুতিটাকে নিয়ে সে কী করবে তাই ভাবছে, ওদিকে কাঠের উনুনে ধান সেদ্ধ হচ্ছে। দাউদাউ করে উনুন জ্বলছে। কামিনী ধুতিটাকে ওই আগুনেই ঢুকিয়ে দেয়। ওটা যেন তার কাছেও এটা লজ্জার বস্তু — তাই ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় কামিনী।

বাইরে তখন মিছিল বের হচ্ছে। নটবরের নেতৃত্বে গ্রামের মানুষ বেরিয়েছে। পচা রয়েছে তাদের সঙ্গে। সারা গ্রামের মানুষ ওই শোক মিছিলে শামিল হয়েছে। শোক মিছিল চলেছে থানার দিকে, খুনীদের ধরতে হবে। নটবর জনতাকে বোঝাতে থাকে নরেশদাকে ওই প্রতিপক্ষরাই খুন করেছে গদি পাবার লোভে।

নটবর চিৎকার করে,

—নরেশদা অমর রহে!

পচাও গলা মেলায়,

—অমর রহে।

কামিনী দেখছে। তার মনে হয় এখুনি সে চিৎকার করে মিছিলের লোকেদের জানিয়ে দেবে সত্যি ঘটনাটা কী। কিন্তু সে পারে না। নীরব দর্শকের মতো ওদের বিচিত্র নাটক দেখতে থাকে।

একের পর এক ঘটনাপ্রবাহ এসে পড়ে মানুষের জীবনে। জীবনও বয়ে চলে তার নিজস্ব প্রবাহে। এক জায়গাতে সে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই নরেশবাবুর খুনের ব্যাপারটাও চাপা পড়ে যায়—আরও অনেক ঘটনাপ্রবাহের চাপে।

সতীশ চাটুজ্যে দেখেছে নটবর এখন গদিতে বিরাজমান। অনেকে নটবরের কৃপাধন্য হতে চায়। কিন্তু সেই ঘটনার পর থেকে নটবর আর সতীশ ও তার পরিবারকে দেখতে পারে না। আর তা ছাড়া মেয়ে পিয়ালীও নটবরের উপর হাড়চটা। সতীশকে স্থায়ী রোজগারের কিছু ধান্দা করতেই হবে। তার এতদিনের ওইসব ধান্দা সব লোকেদের জানা হয়ে গেছে। ভেবেছিল এবার কিশোরবাবুরা জিতলে তার দিনও বদলাবে। কিন্তু কিশোরবাবুদের জেতার কোনও আশাই ছিল না, কারণ জনতা তখন নটবরের দিকে।

তবু সতীশ দমেনি। সেদিন মাঠের কোনও মন্দির থেকে নিত্যপূজা করে ফিরছে। হঠাৎ খালের ধারে উঁচু মাটির পথটায় আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়ে। দেখে পথের মাঝখানে একখানা বেশ বড়সড়ো পাথর। এতদিন ওই পথ ধরে কতবার যাতায়াত করেছে কিন্তু কোনওদিন সতীশ সেটা খেয়াল করেনি। আজ সেই পাথরটাতে ঠোকর খেয়ে পায়ের একটা আঙুলের নখই আস্ত উঠে গেছে। যন্ত্রণায় মাটিতে বসে কাতরাচ্ছে। আর তাকিয়ে দেখতে থাকে পাথরটাকে। মাটির ভিতরে কিছুটা রয়েছে। নিটোল বাটনা বাটা নোড়ার মতো পাথরটা। এবার কৌতূহলবশে পাথরটার দিকে সতীশের আগ্রহ বেড়ে যায়। পাথরটা ধরে টান দিতে নরম মাটি থেকে সেটা বের হয়ে আসে। কালো কুচকুচে পাথরের একটা লম্বা সাইজের টুকরো।

সতীশ কী ভাবছে। ওর উর্বর মস্তিষ্কে এবার একটা নতুন কৌশল খেলা করে। সে পাথরটাকে তুলে নেয়। পাথরটার ওজনও কয়েক কেজি হবে। তবু ওটাকে এনে তার

খামারের এক কোণে খড়ের গাদায় ওদিকে রেখে খড় চাপা দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফেরে।

সতীশ গিন্নি তখন ওদিকে কোথা থেকে সংগৃহীত একটা লাউ কাটতে ব্যস্ত। স্বামীকে ওইভাবে ফিরতে দেখে শুধোয়,

—কী হল?

সতীশ উঠান থেকে তখন দূর্বা ঘাস সংগ্রহে ব্যস্ত। বলে,

—আঙুলটায় চোট লাগল। যা হোঁচট খেলাম, রক্ত পড়ছে।

—এই দুব্বো ঘাসগুলো বেশ চটকে আঙুলের মাথায় দাও। রাস্তায় চলো, চোখে দ্যাখো না নাকি?

সতীশ বলে,

—খেয়াল করিনি গো।

অবশ্য সতীশ এবার গম্ভীরভাবেই চিন্তা করছে। তাকে এবার নতুন একটা পথ বার করতেই হবে।

চৈত্রমাস এসে গেছে। পলাশের বনে এখনও রয়েছে রঙের ছটা। বাতাসে এসেছে শুষ্কতা। তা ছাড়া প্রান্তরে শুরু হয়েছে রোদের উত্তপ্ত পরিবেশের প্রকাশ। বাবা রত্নেশ্বরের বাৎসরিক উৎসব-এর সূচনা হয়েছে। ঢাকের বাদ্যি বাজে মন্দিরে। এর মধ্যে মহাদেবের ভক্তরাও গেরুয়া পরে উত্তরীয় ধারণ করে বাবার জয়ধ্বনি দেয় পথে পথে। সমস্ত পথই গেছে মন্দিরে।

এর মধ্যে বাবার মন্দিরে ভক্তরা এসে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করেছে। সতীশ চাটুজ্যেও রয়েছে। হঠাৎ সতীশ চাটুজ্যেও বাবার জয়ধ্বনি দেয়। সতীশ চাটুজ্যে হঠাৎ মাথা নাড়তে থাকে। আর বিকট শব্দে জয়ধ্বনি দেয়।

—জয় বাবা রত্নেশ্বর নাথ মুনি মহাদেব। জয় বাবা।

তারপরই ছিটকে পড়ে হাত-পা খিঁচতে থাকে। ভক্তরাও এবার বুঝেছে বাবা ভর করেছেন চাটুজ্যের উপর। কে বলতে থাকে,

—বাবার আবির্ভাব হয়েছে। ভক্তরা সন্ত্রস্ত।

ওর মাথায় জল ঢালছে আর বাবার জয়ধ্বনি করে। সতীশ চাটুজ্যে তখন আরও জোরে জোরে ঢাকের তালে তালে মাথা নাড়ছে। সারা শরীর দোলাচ্ছে। এবার বলে সে,

—একা আমি তোদের এত দায়িত্ব বইতে পারছি না। আমি অন্যরূপে তোদের কল্যাণে আসব এখানে।

ভক্তরা - সমবেত জনতা ও বাবার এহেন বচনে খুশি হয়ে জয়ধ্বনি দেয়, সতীশের দেহে বাবার আবির্ভাব ঘটেছে। সতীশ দৈববাণী করেছে,

—এই সোমবার শুক্লা তিথিতে আমার আবির্ভাব ঘটবে। তোদের কল্যাণ হবে।

ছিটকে পড়ে সতীশ। আর জ্ঞান নেই তার। জনতা ওর মুখেচোখে জল দেয়। বেশ কিছুক্ষণ পর সতীশ উঠে বসে। এখন সে স্বাভাবিক মানুষ। ভীত কণ্ঠে হতচকিত চাহনি মেলে বলে,

—কী হয়েছিল আমার?

ভাবটা এমন যেন কিছুই জানে না সে। লোকজন বলে,

—তুমি ধন্য ঠাকুর। বাবা তোমাকে দয়া করেছেন গো। তোমার পুণ্য শরীরে বাবার আবির্ভাব ঘটেছে গো।

সতীশ বলে,

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি হে। কী বলছ তোমরা।

লোকজন তখন সতীশকে গড় হয়ে প্রণাম করছে। সতীশ কোনওরকমে বাড়ি ফিরে আসে। লোকজনই তাকে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

সতীশ গিন্নি বলে,

—রোদে রোদে তিন মুলুক ঘুরপাক আর দিও না। পথেই ভিরমি খেয়ে পড়ে মরবে।

সতীশ সাবধানি লোক। হাঁড়ির একটা চাল টিপলেই বোঝা যায় ভাত হতে কত দেরি। সেও আজ একটু আভাস দিয়েছে মাত্র। বেশ বুঝেছে ঠিকমতো এগোতে পারলে লোকের ভক্তি আর বিশ্বাসকে ভাঙিয়ে সেও নতুন এক খেলা খেলতে পারবে।

তাই বলে,

—দেব-দেবতাদের নিয়ে বাজে কথা বোলো না। এসব বাবা মহাদেবেরই দয়া। সতীশ চাটুজ্যে এবার যেন বদলে গেছে। এখন ভোরবেলাতেই মন্দিরে মন্দিরে চাল ছিটিয়ে পুজো সেরে বাড়ি ফিরে এখন হবিষ্যান্ন খায়। আর মাঝে মাঝে হুঙ্কার ছাড়ে,

—বাবা। দয়া করো বাবা।

এর মধ্যে প্রতিদিন ভোরে উঠে বের হয়ে যায় ওই বাড়ির পিছনে পুকুরের ওদিকে। একটা বেলগাছের নীচে বসে কী করে।

ওদিকটায় লোকজন বিশেষ যায় না। ঝোপঝাড় রয়েছে। ওখানেই বসে থাকে সতীশ ধ্যানস্থ হয়ে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন এগিয়ে আসছে। গ্রামে গ্রামে শিবের গাজনের উৎসব-এর শুরু হচ্ছে। আকাশে-বাতাসে শোনা যায় শিবের জয়ধ্বনি।

গ্রামে হঠাৎ খবরটা কীভাবে রটে যায় বাবা রত্নেশ্বরই নাকি নবকলেবরে আবির্ভূত হবেন এই চৈত্রসংক্রান্তির তিথিতে।

নন্দীপুর গ্রামে হবে বাবার নতুন জন্ম, বাবার মাহাত্ম্য প্রচার। এ অঞ্চলের লোকজন এর আগেই মন্দিরের দেবতার দেববাণী শুনেছিল সতীশের মুখে। ওরা অনেকেই সেই কথাটা মনে রেখেছিল। তাই এবার আবির্ভাবের দিন তারিখ ঘোষিত হবে তারাও বিশ্বাস করে।

ব্যাপারটা পিয়ালীর মোটেই ভালো লাগে না। সে ভালোরকম চেনে তার বাবাকে। এ যাবৎকাল বহু মানুষকে সতীশ নানাভাবে ঠকিয়ে এসেছে তার দিন চালানোর জন্য। এবার আবার কী করবে কে জানে!

পিয়ালী বলে,

—এসব কী হচ্ছে বাবা, হবিষ্যি করছ, যখন তখন ওই ঝোপের মধ্যে বেলতলায় কী করছ। আবার কী মতলব?

সতীশ চাটুজ্যে গম্ভীরভাবে বলেন,

—দুপাতা ইংরেজি পড়ে হিন্দুধর্মের মূল কথা জানা যায় না রে। এ সমুদ্র। মহাসমুদ্র। বাবা মহাদেবের মাহাত্ম্য বোঝা ভার। এসব তাঁরই ইচ্ছে।

পিয়ালী বলে,

—বাবা মহাদেবের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।

সতীশের স্ত্রী দেখে তার স্বামী সেই দৈববাণী শোনাবার পর থেকে তাদের দিনও বদলেছে। সতীশ চাটুজ্যে এখন জপতপ করছে। হবিষ্যি করছে শুনে বহু গ্রামের লোক এখন ওর জন্য গোবিন্দভোগ, আতপ, ঘি, ফলমূল, দক্ষিণা এসব বাড়িতে বয়ে দিয়ে যাচ্ছে। প্রণামির অঙ্কও মন্দ আসছে না। পিয়ালীর মা বলে—

—ঠাকুর যদি ওকে দয়া করেন, তোর কী লা? তুই তো ওই মেয়েদের নিয়ে অনেক খেলা খেলছিস। তাই খেল গে। ওকে ওর কাজ করতে দে।

পিয়ালী ফুঁসে ওঠে।

—কাজ হলে কথা ছিল। এ তো অকাজ মা।

মাও মেয়ের কথায় ফুঁসে ওঠে।

—ঢের পড়া হয়েছে। শুনি মেয়েরা শহরে গিয়ে চাকরি করে। তাই কর তো তার পর ওসব উপদেশ দিবি।

পিয়ালীও ভাবে এবার সে সত্যিই একটা চাকরির চেষ্টাই করবে। এই পরিবেশ থেকে চলে যাবে সে। পিয়ালীর জীবনে শুধু অভাব আর না পাওয়াটাই সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। তার জীবনে ক্ষণিকের রঙিন স্বপ্ন কিছু এসেছিল ওই ভবেশকে কেন্দ্র করে। নির্জন বাগানে পিয়ালী অপেক্ষা করত ভবেশের জন্য। ভবেশও আসত।

সন্ধ্যার ম্লান আঁধার ঘনায় বাগানে। বাতাসের ভেসে আসে ঝরা বকুলের সুবাস। পাখিদের কলরব ওঠে।

ভবেশের বাড়িতে অপমানিত হবার পর পিয়ালী তারপর থেকে ভেবেছিল তার জীবন থেকে ক্ষণিকের স্বপ্নটুকুও মুছে গেছে। সে ওদিকে আর যায়নি। কদিন পর বাগান হয়ে ফিরছে পিয়ালী। হঠাৎ পুকুরের ধারে ভবেশকে দেখে চাইল। বাগানের মধ্যে ওই পুকুরের ঘাটে এখন লোকজন কেউ আসে না। এখন গ্রামে বেশ কয়েকটা কুয়ো টিউবওয়েল হয়েছে। ভবেশ পিয়ালীকে ডাক দেয়।

পিয়ালী দাঁড়ায়। সে বলে,

—ভবেশ তোমার মা-বাবা কেউ চান না আমরা মেলামেশা করি। আর তোমরা বড়লোক। কত নামডাক তোমাদের। তোমার সঙ্গে আমার মেশারও অধিকার নেই।

ভবেশ জানত পিয়ালীর এরকম অভিমান হবেই। ওকে মা যা নয় তাই বলেছে। ভবেশ বলে,

—ওদের কথা ছাড়ো পিয়ালী। ওটা আমাদের ব্যাপার। আমি জানি তুমি কী। আর আমিও ওদের কথা মানি না।

—ভবেশ। পিয়ালী নতুন করে যেন ভবেশকে চিনেছে। ওর বাবা-মা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এক মানুষ।

ভবেশ বলে,

—ওদের ওই বিষয় প্রতিষ্ঠা কীভাবে এসেছে তা জানি। তাই ওদের আমি মুখ বুজে মেনে নিতে পারি না। আমায় তুমি ভুল বুঝো না পিয়ালী।

পিয়ালী যেন আবার সেই রঙিন স্বপ্নটাকে ফিরে পেয়েছে। বাতাসে কয়েকটা রঙিন প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে। পিয়ালী বলে,

—তা জানি ভবেশ। কিন্তু কী লাভ?

ভবেশ বলে,

—লাভ-লোকসানের হিসেব করে তোমার দিকে এগোইনি। ভালোবাসার কোনও যুক্তি নেই, কারণ নেই, ভালোবাসা নিজেই নিজের পথ করে নেয়।

পিয়ালীও ভাবছে কথাটা। ভবেশ বলে,

—সেদিন মাকে তোমার নামে যা-তা বলেছিল ওই মালতী। ওকেই দেখেছিলাম বাড়িতে। ওই বাজে মেয়েটাকে সহ্য করতে পারি না। পাত্তাই দিই না। তাই সেদিন এইসব করেছিল। মা-কে যা তা বলে,

পিয়ালীও এরকমটাই অনুমান করেছিল। কারণ তার পর মালতীর সঙ্গে দেখাও হয়েছে। কিন্তু মালতীই তাকে এড়িয়ে গেছে। আড়ালে হেসেছে বিজয়িনীর মতো।

ভবেশ বলে,

—তুমি ওর থেকে সবদিকেই এগিয়ে গেছ তাই ওর হিংসে। তোমাকে এসব কথা জানাবার জন্য আমি কদিন এখানে এসেছি। কিন্তু তুমি আসনি। ভুল বুঝে সরে গেছ। কিন্তু বিশ্বাস করো—

পিয়ালী বলে,

—না-না, কদিন কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তা ছাড়া এবার বি. এ পড়ছি। তারপর তো কিছু করতে হবে। কোনও চাকরি-বাকরি।

ভবেশ-এর মনে হয় পিয়ালীর এই বেঁচে থাকার জন্য উপরের ভবেশটাকে যদি সে দূর করতে পারত। ভবেশ বলে,

—আমিও এখন ওই কথাই ভাবছি। যদি কোনো চাকরি পাই।

—চাকরি করবে তুমি? তোমাদের এত ব্যবসা, দোকান, তারপর বাবার গদি যদি পাও।

পিয়ালীর কথায় ভবেশ বলে,

—গদির মোহ আমার নেই পিয়ালী, আমি ওই রাজনীতির অন্ধকার অতলে হারিয়ে যেতে চাই না। আমরাই এতটুকু ভালোবাসার ছোঁয়া নিয়ে বাঁচব। আর তার জন্য আমাকে লড়াই করতে হবে। সেই লড়াইতে যদি তোমায় পাশে পাই—

পিয়ালীও আজ তার সেই রঙিন স্বপ্নের রাজ্যে হারিয়ে গেছে। জানে না সেই স্বপ্ন কোনো দিন সফল হবে কি না।

পিয়ালী বাড়ি ফেরে। আজ তার মনের সেই হারানো সুরটা আবার ফিরে এসেছে। ভবেশ আজও তার পথ চেয়ে আছে। পিয়ালীও স্বপ্ন দেখে সেও একদিন নিজের পায়ে দাঁড়াবে। ভবেশকেও ওই পরিবেশ থেকে সরিয়ে আনবে। দুজনে গড়ে তুলবে তাদের জগৎ।

তবে ওই মালতীকে সে কোনো দিন ক্ষমা করবে না। মালতীর বাবা মাধব কবরেজ এখন বুঝেছে যে নটবরকে খুশি রাখতে পারলে তার দিন ঠিকঠাকই চলবে।

মাধব এখন পঞ্চায়েত অফিসে প্রায়ই যাতায়াত করে। নটবরের নাকি শরীরটা ভালো নেই। ইদানীং সর্দি-কাশি প্রায়ই হচ্ছে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফেরে। মাধবও যায়, হাতে একটা মৃতসঞ্জীবনী সুধার বোতল, ওটা অবশ্য শহর থেকে কিনে আনে মাধব, লেবেলটা ছিঁড়ে এবার নিজের বোতলে ঢেলে ওটা নিয়ে গিয়ে বলে,

—বাবা নুটু, কবিরাজি মতে এই ঔষধ আমি নিজে তৈরি করেছি। রাতে চার চামচ করে খাবে। প্রয়োজন হলে আট চামচ জল মিশিয়ে খাবে। দেখবে সব সর্দিকাশি উবে যাবে।

নটবর ইদানীং ওই দ্রব্যও খেতে শুরু করেছে। এতে অবশ্য মাধবেরই লাভ। এখন ওই দ্রব্যের মাত্রা বেড়ে প্রতি সন্ধ্যায় এক বোতলেই দাঁড়িয়েছে। মাধব কবরেজ ওটার জোগান দেয় আর তা বাবদ গোটা কুড়ি টাকা দৈনিক আমদানি করে। আর গ্রামের বেশ কিছু রোগীও আসে তার কাছে। পঞ্চায়েত অফিসে ওদের দরখাস্ত। নানা ফরমের বয়ান লিখে দিয়ে তদ্বির-তদারক করেও কিছু পায়। তবে এতে মালতীর মন ভরে না।

ভবেশের ওদিকে দু-একবার যাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু দেখেছে বাসন্তী যেন তার উপরও তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কারণ, বাসন্তীও চেনে ওই মালতীকে। ওই মেয়েটা আরও বাজে মেয়ে। পিয়ালীর তবু গ্রামে একটা সুনাম আছে। কিন্তু মালতীর তেমন কোনও সুনাম নেই। পড়াশোনা আর করে না। মাধ্যমিক পাস করেই থেমে গেছে।

হঠাৎ কোনওক্রমে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে যে চৈত্র সংক্রান্তির দিনই বাবার আবির্ভাব হবে। সতীশ ভোর থেকেই ওই বেলতলায় হত্যা দিয়ে পড়ে আছে, এর মধ্যে সঙ্গী দু-একজনও গোটা দুয়েক ঢাক কাঁসা এনে বাজাতে শুরু করেছে। বেলতলায় নরম মাটিতে জল ঢালছে অনেকে। বাবা রত্নেশ্বর নাকি স্বপ্ন দিয়েছেন তিনি নাকি নবকলেবরে এখানেই আবির্ভূত হবেন।

ওদিকে একটা পূর্ণ ঘট, আমপল্লব দিয়ে বসানো হয়েছে।

সতীশ চাটুজ্যে ঘন ঘন ডাক পাড়ে,

—বাবার রত্নেশ্বর মুনি মহাদেবের জয়। জয় বাবা—

ঢাক বাজছে আর এর মধ্যে গ্রামের বহু লোকজন মহিলাও জুটে গেছে। তারাও এসেছে নৈবেদ্য ফলমূল ডাব, বেল, ফুলমালা নিয়ে। মূল মন্দিরে আজ লোকজন যা আছে তার থেকে বেশি লোকজনই এসেছে এখানে। বেলতলায় একশো আট কলসি জল ঢালার লোকের অভাব নেই। হঠাৎ দেখা যায়, সেই ভিজে নরম মাটি ভেদ করে সত্যি সত্যিই একটা পাথরের শিবলিঙ্গের মতো বস্তু ঠেলে উঠেছে খুব ধীরে ধীরে মাটির তলা থেকে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে জনতা বাবার আবির্ভাবে। তারা দেখছে আপনা হতেই মাটির তল থেকে সেই পাথরের মাথাটা মাটি ফুঁড়ে বের হয়। ক্রমশ ইঞ্চি কয়েক উপরে উঠে স্থির হয়ে যায়। তুমুল শব্দে ঢাক বাজছে আর শতশত বিমুগ্ধ হতচকিত ভক্তরা এবার বাবার এই পূর্ণ আবির্ভাব দেখে গগনবিদারী কণ্ঠে বাবার জয়ধ্বনি দেয়।

—জয় বাবা রত্নেশ্বর —

সতীশ চাটুজ্যের সাধনা আজ সফল হয়েছে। বাবা তার ডাকে সাড়া দিয়ে আজ নবকলেবরে আবির্ভূত হয়েছেন, এই ধরাধামে।

এবার ওই জনতা সদ্য আবির্ভূত বাবার উদ্দেশে ফলমূল নৈবেদ্যর স্তূপই হাজির করে। ওদিকে একটা থালাও এর মধ্যে এসে গেছে। তাতে প্রণামি পড়ছে। সতীশ আড়চোখে প্রণামির দিকে নজর দেয় আর আর্তকণ্ঠে তখন শিবস্তোত্র আউড়ে চলেছে। ঢাক বেজে চলেছে সমানে।

সারা এলাকায় খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদেরও কণ্ঠে বিস্ময় ভক্তির সুর। তারা বলে,

—বাবা পাতাল থেকে মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূত হলেন। স্বচক্ষে দেখলাম। চাটুজ্যে মানুষ নয়, দেবতা। ওর উপর বাবার অসীম দয়া।

পুকুরপাড়ে বেলতলায় মানুষজন আসত না। কাঁটাঝোপ, আকন্দ গাছের জঙ্গল ঢাকা ছিল এদিকটা। গ্রামের অনেকেই এবার বাবার জন্য ওই ঝোপঝাড়ও সব সাফ করে দেয়। এবার বাবার নিত্যপূজা শুরু হবে। আর চাটুজ্যেও এবার বাবার আবির্ভাবে বিশাল হোম-যজ্ঞই করে। নন্দ-কিশোর বাবুদের দলও এহেন জাগ্রত বাবাকে গ্রামে আবির্ভূত হতে দেখে এগিয়ে আসে। বাবার পুজো মায় গণভোজের ব্যবস্থাও করে তারা। রাতারাতি সতীশ চাটুজ্যে পুকুরপাড়ে বাবাকে এনে এদিকের হাওয়াই বদলে দিয়েছে।

নন্দবাবুদের দেবতার ভক্তি এখন বেড়ে গেছে। কিশোরও এসেছে বেলতলায়। এর মধ্যে সতীশ চাটুজ্যে বাবার মাথায় উপর একটা খড়ের চালা মতো বানিয়েছে আর চারিদিকে ছিটে বেড়ার দেওয়ালও দিয়েছে। বলে, গোরুছাগল, কুকুর, শুয়োর সব তো এদিকে আসে। বাবাকে অপবিত্র করে। তাই একটা আগল করে দিয়েছে।

অবশ্য পিয়ালী দেখেছে বাবার এই নতুন কাজটাতে সংসারের লাভই হয়েছে। সেও অবাক হয় কীভাবে মাটি ফুঁড়ে একটা শিবলিঙ্গের মতো পাথর ওখানে গজাল। তার বাস্তব চিন্তায় এর ব্যাখ্যা মেলে না, বাবাকে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসাও করতে চায় না। তবে পিয়ালীর মন এটাকে মেনে নিতে পারে না। এর পিছনে নিশ্চয়ই বাবার কোনো ফন্দি-ফিকির আছে।

ব্যাপারটা অবশ্য সতীশ চাটুজ্যে খুবই গোপন রেখেছিল। কাকপক্ষীতেও টের পায়নি। সেদিন যে পাথরটায় তার পায়ের নখ কেটেছিল, তারপর বেশ কয়েকদিন ধরে ভেবে চিন্তে সে এবার বাসে করে বসন্তপুর বাজার থেকে নগদ দাম দিয়ে পনেরো কেজি ছোলা কিনে এনে তার ঘরে তক্তাপোষের নিচে বড় বালতিতে ভিজিয়ে রেখেছিল। বাড়ির কাউকে জানতে দিলে ওই ভিজে ছোলা সাফ করে দেবে। তাই কাউকে সে জানায়নি, সেই রাতেই বেলতলায় শাবল দিয়ে বেশ কিছুটা গর্ত করে সেই আধভেজা ছোলাগুলো গর্তের মধ্যে ঠেসে পুরে দিয়ে তার উপর ওই পাথরটাকে বসিয়ে মাটি চাপা দেয়, তারপর চলে জল ঢালার কাজ, আর জল ঢালার সময় জলটা চলে যায় গর্তের গভীরে সেই আধ ভিজে ঠেসে ভরা ছোলার মধ্যে সেই ছোলাও এবার ফুলতে থাকে। আর সেই ঊর্ধ্বচাপের ফলে দেখা যায় ঠেলা পেয়ে পাথরটাও নরম মাটি ফুঁড়ে এবার মাটির বুকে মাথা তোলে।

এতেই সতীশের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যায়। জনতাও স্বচক্ষে দেখে মাটি ফুঁড়ে বাবা মহাদেবের এই আবির্ভাব।

নন্দবাবুও এসেছেন বাবার চরণে পুজো দিতে। নন্দ বলেন,

—বাবাকে এইভাবে রেখেছ সতীশ।

অনেক ভক্তই এসেছে। সেদিনের পর থেকে দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকেই লোকজন আসছে বাবাকে দর্শন করতে।

সতীশ বলে,

—আমার তো যা সামর্থ্য তাতে যা পারি করেছি। বাবার যদি ইচ্ছা হয় বাবা করবেন। না করালে থাকুন ওই বেলতলাতেই।

নন্দ বাবার কৃপাপ্রার্থী। তাই সে বলে,

—ও নিয়ে ভেবো না সতীশ। আমিই বাবার মন্দির করিয়ে দেব এখানে। জনতাও এবার অনুরোধ করে।

—তাই করুন গো নন্দবাবু। বাবা রোদে-জলে গাছতলায় পড়ে থাকবেন আমরা থাকতে।

নন্দবাবু বলে,

—তাই তো মন্দির করে দোব। জয়বাবা ছোট রত্নেশ্বর।

ক্রমশ এই শিলাখণ্ডই এদের কাছে দেবতায় পরিণত হয়। সতীশ চাটুজ্যের এতদিনের স্বপ্ন এবার সফল হয়েছে। এতদিন সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এর গোরুর চিকিৎসা, ওর গ্রহশান্তি, ওর বিপদভঞ্জন যন্ত্র ইত্যাদি নানা ধান্দা করে দিন চালাত। এখন আর তাকে গ্রামে গ্রামে রোদেজলে ছাতা বগলে ঘুরতে হয় না। এখন ভোরে উঠে গ্রামের বিভিন্ন মন্দিরে সেই নিত্য চাল ফুল ছোড়ার কাজটা সেরে এসে বেলতলায় মন্দিরে বসে। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ভক্তরা আসে দলে দলে। সকলেই মূল মন্দিরে পুজো দিয়ে আসে, এখানেও পুজো প্রণামি দিতে।

সতীশ চাটুজ্যে ওদের বাবার স্নানজল দেয়। প্রসাদও দেয়। দেয় ফুল বেলপাতাও। কেউ কেউ আবার বাবার কবচও নিয়ে যায়।

সতীশ চাটুজ্যে এর মধ্যে দুরকম কাজও চালু করেছে। একটা অর্ডিনারি যার দাম সওয়া পাঁচটাকা, আর একটা কবচ সেটা আবার ডবল পাওয়ার তার প্রণামি এগারো টাকা।

সতীশের দৈনিক রোজগারও বেড়েছে আর এর মধ্যে ওই কবচ ধারণ করে অনেকেই নাকি অনেক সুফলও পেয়েছে। তাই কবচের কাটতিও বেড়েছে। ওই সুপার স্ট্রং কবচের চাহিদাই বেশি।

নন্দবাবুও কথা রেখেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই বেলতলায় বাবার ওই থানকে ঘিরে মন্দির আর সামনে একটা চারিদিক খোলা নাটমন্দিরও তৈরি হয়েছে। নন্দবাবু খরচ তো দিয়েছেই, এ ছাড়া সতীশও মন্দির থেকে বেলগাছের সঙ্গে শিকল দিয়ে একটা মজবুত ক্যাশবাক্স তালা বন্ধ করে সেটাও রেখেছে। তার গায়ে লেখা—

"মন্দির নির্মাণ কল্পে মুক্ত হস্তে প্রণামি দিন"। তাতেও মন্দ পয়সা পড়ে না। সতীশ ভাবে মন্দির এবার তৈরি হয়ে গেলে তারপর নিজের বাড়িটাও নতুন করে সারাবে।

বাবার দয়ায় ওর দিন এবার বদলাবে। সারা অঞ্চলে এখন ওই ছোট রত্নেশ্বরের মহিমা নিয়েও অনেক গালগল্প শুরু হয়েছে। আর সেসব গল্পের মধ্যমণি ওই সতীশ চাটুজ্যে সেও এখন বাবার দয়ায় কোনও সিদ্ধপুরুষে পরিণত হয়েছে।

পিয়ালীর কাছে ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় বলে মনে হয়। সেও বাবাকে শুধায়।

—এসব কী ব্যপার বলো তো!

সতীশ এখন পয়সার মুখ দেখেছে—দেখেছে কত মানুষ তাকে প্রণাম করে দেবতার মতো ভক্তি করে। এখন সে আর উপসাধক নয়। সমাজে সে এখন নামী উপাসক ব্যক্তি। পয়সা তার স্বরূপই বদলে দিয়েছে। সতীশ বলে,

—সবই বাবার দয়া। এসব তুই বুঝবি না। তোর ওই দুপাতা ইংরেজি পড়ার বিদ্যেতে এসব মাথায় আসবে না। যা তো!

সতীশ মেয়েকে এখন আর পাত্তাই দেয় না। এবার সেও ঠিক করেছে মেয়ের বিয়ে দেবে। এখন তার ভক্ত যজমানরাও সংখ্যায় অনেক। নন্দবাবুর দেওয়া টাকাতে মন্দির হয়েছে আর সুখের কথা নন্দবাবুই ওই সুরেশ আগরওয়ালকেও এনেছে এই দেবতার কাছে। সুরেশজি এখন ধানবাদ-আসানসোল অঞ্চলে সাম্রাজ্যে বিস্তারের পর এবার এদিকে তার সাম্রাজ্য নতুন করে বিস্তার করতে চায়।

এদিকে এখনও বেশি ব্যবসায়ী ভিড় করেনি। জঙ্গলের বাইরে বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তরে ঘাস হয় না। ওসব প্রান্তরের মালিক নন্দবাবুরা। ওর পৈতৃক আমল থেকেই এসব জায়গার মালিকানা নন্দবাবুদের।

সুরেশজি এবার এদিকেও কয়লার সন্ধান পেয়ে হানা দিয়েছে। মাটির নীচে থেকে কয়লা তোলার কাজ ছাড়াও এবার এদিকে সে নতুন কিছু কারখানাও করবে। তাই জমি আর মদতের দরকার। জমির জন্য তার নন্দবাবুকে প্রয়োজন আর প্রশাসনিক মদত না হলে কারখানা করা যাবে না। তাই নটবরদেরও প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের ছাড়পত্র ছাড়া জেলাও তাকে মত দেবে না। সবাই ওরা এক সূত্রে বাঁধা। তাই নটবরকে তার দরকার। কারণ সেই পঞ্চায়েতের প্রধান।

অবশ্য সুরেশবাবু জানে নটবর আর নন্দবাবু দুই পক্ষই কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। গদির লড়াই নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে লড়াই চলছেই। সুরেশজি চায় যদি নন্দবাবুকে ওই গদির দখল দিতে পারে তা হলেই তার সুবিধা বেশি। ওদের থেকে জমি আর প্রশাসনিক সুবিধাও পাবে। সুরেশজি অবশ্য ব্যবসায়ী মানুষ। সে দু পক্ষকেই ম্যানেজ করে চলছে। তবে এতে তার খরচও বাড়ছে। দুই পক্ষকেই খুশি রাখতে হয়। সে চায় মনে মনে নন্দবাবুদের ও ছেলে কিশোরকেই। তাতে তার খরচও কম পড়বে।

নন্দবাবুই নিয়ে আসে সুরেশজিকে সতীশের মন্দিরের উদ্বোধনের দিন। সেদিন গ্রামে বিরাট উৎসবের সূচনা করেছে সতীশ।

অবশ্য নন্দবাবু, কিশোরের দলই মন্দির তৈরি করে দিয়েছে। এদিকে এমন আধুনিক ঝাঁ-চকচকে মন্দির আর নেই। মার্বেল পাথরের মেঝে বাবার চারিদিকে মার্বেল পাথরে বেষ্টনী। সামনে নাটমন্দিরে আজ সতীশ চাটুজ্যে যজ্ঞকুণ্ডে হোম যজ্ঞ শুরু করেছে। মন্দিরের আশপাশে সেই ঝোপঝাড় আর নেই। বেলকাঠ-এর আগুনে ঘি দিচ্ছে সতীশ। চারিদিকে মুগ্ধ ভক্তবৃন্দ।

সুরেশজি, নন্দবাবু, কিশোরও এসেছে। অবশ্য সতীশ নটবরকেও আমন্ত্রণ করেছে। কিন্তু নটবর, বাসন্তী সতীশের মন্দির তৈরির ব্যাপারে মোটেই খুশি হয়নি। এতদিন ধরে ওই মূল মন্দিরেই এলাকার মানুষরা যেত। তিনিই ছিলেন এখানের একছত্র দেবতা। পুজো প্রণামি সবই পড়ত ওখানে। মানুষের প্রার্থনার ঠাঁই ছিল ওই মন্দির।

হঠাৎ সতীশ চাটুজ্যের এই নতুন দেবতাই এখন মূল মন্দিরের আমদানিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। মানুষ চিরকালই নতুন কিছু পেতে চায়। পুরোনো বস্তুর উপর মোহ তাদের কমে আসছে তাই তারাও পুরোনো মন্দিরের চেয়ে নতুন মন্দিরেই আসে দলে দলে। বাবা নাকি এখানেই এখন বিরাজ করছেন।

নতুন মার্বেল পাথরের মন্দির চকচকে চূড়ার কার্নিস আর এখন সুরেশজির মতো ব্যবসায়ীও এখানে আসছে। তার প্রচারের বস্তু হিসেবে এখানে এসেছে। নটবরও কিছুটা বিব্রত বোধ করে। তবে সেও এর মধ্যে সকালে এসে প্রণাম করে গেছে বাবাকে। কিন্তু বাসন্তী আসেনি। আইনত সে-ই পুরোনো মন্দিরের সেবাইত। সতীশ সেই পুরোনো মন্দিরটাকে অবজ্ঞা করেছে বলেই ভাবে বাসন্তী। তাই সে আসেনি। আর পিয়ালীকে সে সহ্য করতে পারে না, সতীশ চাটুজ্যেকেও। তাই বাসন্তী আসেনি।

সতীশ এখন অনেকটা নিজের পায়েই দাঁড়িয়েছে। মন্দিরের ওদিকে চলেছে বিরাট ভোজের আয়োজন। কয়েকশো ভক্তও বসে পড়েছে প্রসাদ পেতে। বাবার জয়ধ্বনি ওঠে। নন্দ-কিশোররাও সবকিছুর তদারক করছে। কিশোর এবার বাবার কাছে প্রার্থনা জানায় এবার ভোটে যেন হারানো গদি ফিরে পাই বাবা। তোমাকে সোনার মুকুট দোব। নটবরটাকেও এবার হারিয়ে দাও।

নটবর আগামী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কিছু কাজকর্ম করার কথা ভাবছে। নটবর অবশ্য এবারও চায় এই গদি ধরে রাখতে। কারণ এবার এখানে নটবর একটা কারখানা গড়ার স্বপ্নই দেখছে। সুরেশজির কয়লার ব্যাবসাতেও সে কাজ করছে। আর সুরেশজিও এবার তার সাহায্য চায়। এখানের খোলাপ্রান্তরে সে স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা গড়বে।

নটবরকে সুরেশজি সে কথা জানিয়েছে। ইদানীং আন্তর্জাতিক বাজারে এই লোহার বিরাট চাহিদা। খুব বেশি খরচ পড়বে না এইরকম একটা ছোট কারখানা করতে। আর এর থেকে লাভও প্রচুর। তবে এসব কারখানায় আধুনিক ব্যবস্থা না থাকার ফলে ভীষণভাবে পরিবেশ দূষিত হয়। তাই সরকার এধরনের কারখানার অনুমতি দিতে চায় না। যদি স্থানীয় প্রশাসন রাজি হয় তা হলে হতে পারে এই কারখানা।

কারণ স্থানীয় মানুষরাই এতে আপত্তি তুলতে পারে। ওই কারখানা করতে পারলে সুরেশজি নটবরকে পঁচিশ পার্সেন্ট মালিকানাও দেবে বলেছে। আর সুরেশজির দীর্ঘদিনের ব্যবসা ওই কাঁচামাল মানে আয়রন ওর, ম্যাঙ্গানিজ কয়লা বেআইনিভাবে পাচার করার। অর্থাৎ আয়রন ওর, কয়লা, চুনাপাথর মায় সব কাঁচামাল তারা পাবে নামমাত্র মূল্যে। তাই তাদের তৈরি মালের দামও কম পড়বে। আর বিক্রি করে বাইরের বাজারে বেশ লাভ হবে।

এহেন লাভজনক কারখানার চার আনার মালিক হতে পারলে নটবরের ভাগ্য খুলে যাবে। আর সে জানে একটা কারখানা থেকে সে আরও কারখানা করতে পারবে। নটবর তাই স্বপ্ন দেখে সে এবার কারখানার মালিকই হবে।

পচাও স্বপ্ন দেখে। সেও লাঠি বল্লম ডাকাতি ছেড়ে চেয়ারে বসে বাবুদের মতো পা দোলাবে। ঠিকাদাররা তাকে প্রণামি দেবে। রাতের অন্ধকারে আর তাকে কাজ করতে হবে না। মাঝে মাঝে কয়লা পাচার করতে গিয়ে এখনও বিপদে পড়ে সে।

পুলিশ আগের চেয়ে অনেক বেশি সজাগ। কোল কোম্পানি এই চোরাচালান বন্ধ করতে উদ্যোগী। যদিও তাদেরই কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের পরোক্ষ মদতে এই কারবার এখনও রমরম করে চলছে। তাই এই কয়লা চালানকারী মহাজনরাও নানা কসরত করে প্রণামি দিয়ে কিছু লোকের মুখ বন্ধ রাখে। তাদের কারবার চালায়। মাঝে মাঝে তাদের সব হিসাব অবশ্য গোলমাল হয়ে যায়। চাকরি বজায় রাখার জন্য বা ঠিকমতো প্রণামি পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝেই পুলিশ রেড হয়ে যায়। বনের মধ্যে রাতের অন্ধকারে খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। ওদের মধ্যে দুচারজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাও যায়।

তা ছাড়া লুঠ করা মালের ভাগ নিয়ে অন্যান্য দলের মধ্যেও সঙ্ঘর্ষ হয়। নিজেদের মধ্যে গুলিও চলে। পচা সেবার এরকম এক গুলির লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। রাতের অন্ধকারে গুলি চালাচ্ছে প্রতিপক্ষ। কোনোমতে বেঁচে আসে সেদিন। পরদিন পুলিশ ওখানে তিনটে গুলিবিদ্ধ লাশও পেয়েছে। অবশ্য তারা কেউ এদিকের লোক নয়। আসানসোল ফিল্ডের লোক।

পচার কাছে এসব এখন জলভাত-এর মতো সাধারণ ব্যাপার। ডাকাতির সময় থেকেই সে এসব করে আসছে। তার পরও করেছে। আর তার পরই নটবরের শিষ্যত্ব গ্রহণ। তাই সেই রাতে নরেশবাবুকে মারতেও তার হাত কাঁপেনি। সে এখন নটবরের অন্যতম সঙ্গী। পচা বলে নটবরকে,

—ইবার ভোটের টিকিট দিতে হবেক কিন্তু।

নটবরও লক্ষ্য করে ওর কথার মধ্যে একটা দাবির সুরই ফুটে উঠেছে। নটবর পচাকে দেখছে। অন্ধকার জগৎ থেকে ওকে তুলে এনে এই সিংহাসনে বসিয়েছে সে। তাই সেও এবার ওর কথাটা ভাবতে থাকে।

কামিনী পচার এই পরিবর্তনটাকে লক্ষ্য করেছে। তাই সেই রাতের পর থেকে কামিনী পচাকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। কামিনী জানে পচাই খুন করেছে নরেশবাবুকে। সেই রাতেই কামিনী এমনটা অনুমান করেছিল। আর ওই রক্তমাখা কাপড়টাকেও ওখানে দেখেছিল। পুলিশ ঘোরাঘুরি করছে। পচা বাড়ি ফিরে রক্তমাখা কাপড়টার খোঁজ করে পায় না। পচার মুখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে ওঠে। ধরা পড়লে তার ফাঁসিই হবে। কামিনী ওর উদ্বেগ দেখে বলে,

—ওটা আমি ধানসেদ্ধ করা উনুনে পুড়িয়ে দিয়েছি। যা রক্তের দাগ ছিল ওতে।

পচা দেখছে কামিনীকে। কামিনী বলে,

—অনেক পাপ করেছিস—আর করিস না। এর পর লোভ—পাপ করলে ভগবানও তোকে ছাড়বে না। তোর পাপে আমাদের ঘরে একটা ছেলেপুলেও হল না।

পচা চুপ করে থাকে। তবে বেশ বুঝেছে তার এই পাপের কথা কামিনীর কাছে লুকোতে পারেনি সে। সেই থেকে কামিনীও যেন পচাকে এড়িয়ে চলে। কামিনী আরও বলে,

—ওই সব সঙ্গ ছেড়ে দে। না হলে কোনওদিন বেঘোরে মরবি।

পচা তখন রাতের অন্ধকারে কয়লা পাচার কাজের অন্যতম নায়ক। ওই সব কাজে তার বেশি আনন্দ। আর টাকাও আসছে ভালোই। তাই পচা বলে,

—তোর কথাই শুনব রে। আর ওসবে যাব না। ঢের হয়েছে।

কামিনীও তাই চায়। বলে,

—পারবি ওসব কাজ ছাড়তে?

—হ্যাঁরে। নুটুদাকেও বলেছি। আর বলেছি এবার পঞ্চায়েতে মেম্বর হবার জন্যি। আর উসব কাজে নাই।

কামিনী বলে,

—যদি তোকে মেম্বর না করে? ওই নুটুবাবু তো সদা-নোটনদেরই বেশি পেয়ার করে।

সদা-নোটনরা এখন ইস্কুলে পড়াচ্ছে। ওরা লেখাপড়া জানে, আর এলাকার ওদের সম্প্রদায়ের জন্য কাজও করে। পিয়ালীর ওই সমবায়েও ওরা যাতায়াত করে। ভদ্র সমাজে ওদের মেলামেশা আছে, সভ্য হিসেবেও সুনাম করেছে। পচাও ভাবে কথাটা। নটবর ওদের সভ্যপদ খারিজ করে তাকে বসাবে কি না তাই ভাবে পচা। কামিনীর কথায় সে বলে,

—নুটুদা না করলে, কিশোরবাবুকেই বলব। ওর দলেই যাব। যে আমায় মেম্বর করবে তার দিকেই যাব।

কামিনী বলে,

—ওই সব লোভ ছাড় এবার। জমিজায়গা চাষবাস করে আরও পাঁচজনের মতো দিন কাটা। কী দরকার ওসবে?

পচার মনে ওই কথাটাই পাক দিচ্ছে। তাকে এবার পঞ্চায়েতে যেতেই হবে। সে আরও অনেক কিছুই পেতে চায়।

এমন দিনে এবার সরকারের সিদ্ধান্তটা নটবরের সব হিসেবকেই বদলে দেয়। শুধু নটবরই নয়, নন্দবাবু কিশোরবাবুদের সব হিসাবই ওলট-পালট হয়ে যায়।

খবরটা প্রথমে নটবর বিশ্বাসই করতে পারেনি। তাই সদরে ছুটে গেছে নেতাদের কাছে, তাঁরাই বলেন,

—এইটাই এখন নতুন নির্দেশ। সরকার এখন মেয়েদেরও পুরুষের মতো সমান অধিকার দিতে চায়। নারীমুক্তির যুগ। মেয়েদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। তাই অনেক পঞ্চায়েত, পুরসভা জেলা পরিষদের কমিটিতে মেয়েদেরও আসন দিতে হবে। তাদেরও পঞ্চায়েতের কাজে যুক্ত করতে হবে। তাদেরও অঞ্চল প্রধানের পদে বসাতে হবে।

নটবর বলে,

—তা বসান, তাই বলে আমাদের পঞ্চায়েতের প্রধান করতে হবে মেয়েদের। কর্তারা বলেন,

—এতদিন তোমরা চালিয়েছ। এবার লেখাপড়া জানা মহিলারা আসবে। তাদেরও তো দায়িত্ব দিতে হবে। নন্দীপুর পঞ্চায়েতের জনসংখ্যাও বেড়েছে তাই এবার ওখানে সভ্যসংখ্যা বাড়িয়ে তেরোজন করা হয়েছে। আর প্রধান করতে হবে কোনও নির্বাচিত মহিলা সদস্যকেই।

খবরটা এবার সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষও এই ভাবে যে অন্তত নটবর আর প্রধান হতে পারবে না। এবার কোনও মহিলাই হবে অঞ্চলপ্রধান। নন্দবাবু-কিশোররা খুশি হয় আবার ভাবনাতে পড়ে। কিশোর বলে,

—নটবরের দফা শেষ।

নন্দ বলেন,

—তাতে তোর লাভ কী হবে? তুই তো আর প্রধান হতে পারবি না।

কিশোর লেখাপড়া জানে, ব্যবসাপত্রও ভালোই করছে। তা ছাড়াও এখন সুরেশজির কাছের লোক। তারও আশা সুরেশজির সঙ্গে কারখানা করবে। জায়গাজমির অভাব নেই। কিন্তু পঞ্চায়েতের উপর তার অধিকার কায়েম করতেই হবে। আর তাই একজন মহিলাকে দরকার যাকে তারা প্রধান হিসেবে খাড়া করবে। কিশোর কথাটা বাবাকে বলে।

—এবার নুটুকে চাপে রাখা যেতে পারে। এই অঞ্চলে তেমন লেখাপড়া জানা বলিয়ে কইয়ে মেয়ে একজনই আছে।

নন্দও ভাবছেন কথাটা। তিনি বলেন,

—কিন্তু সে যদি জেতে আমাদের হাতে থাকবে তো? না আবার পালটি খেয়ে নটবরের দলে চলে যাবে?

কিশোর অনেক খবরই রাখে। সে বলে,

—না না, সে ভালো মেয়ে। সত্যিকার কাজই করতে চায় এলাকার মানুষের জন্য। আমি ওই সতীশ চাটুজ্যের মেয়ে পিয়ালীর কথা বলছিলাম।

নন্দও ভাবছেন। মেয়েটাকে তিনিও দেখেছেন। মহিলা সমবায় নিয়ে এখন ভালো কাজ করছে। বেশ কয়েকখানা গ্রামের মেয়েদের রোজগারের ব্যবস্থাও করেছে। আর রোজ সন্ধ্যায় সেখানে মেয়েদের স্কুলও করে। নন্দ বলেন,

—কথাটা মন্দ বলিসনি। দ্যাখ যদি রাজি হয়। শুনেছি নটবরের দলের সঙ্গে ওর মিলমিশ নেই। সতীশ চাটুজ্যেও আমাদের কথা ফেলতে পারবে না।

নন্দর মনে হয় স্বয়ং বাবা মহাদেবেরই ইচ্ছা। কিশোরও তাই তৈরি হয় ভোটের জন্য।

নটবর এবার চিন্তায় পড়েছে। সে ভাবতে পারেনি যে আঘাতটা আসবে এইভাবে। সম্পূর্ণ এক নতুন পথে। এতদিন ধরে রাজ্যপাট দখল করে ছিল। তাকে হঠাতেও পারত না কেউ।

কিন্তু অলক্ষ্য থেকে কে যেন তাকে, গদি থেকে জোর করে তুলে আনছে। তবু নটবর তার গদির দখল ছাড়বে না। তার দলের সভ্যদের সে জিতিয়ে আনবেই। তবে সমস্যা হয়েছে ওই প্রধানের পদের মহিলা প্রার্থীকে নিয়ে। তেমন মেয়ে তার দলে নেই। এতদিন ধরে তারা মহিলাদের আমলই দেয়নি এবার মহিলাদেরই মাথায় বসাতে হবে। নটবর ভাবছে তেমন একজন মেয়ের কথা। তার দলের সভ্যদের ডাকিয়ে এনে জরুরি

মিটিং-এ বসেছে ওরা। দু-একজন মহিলার নামও ওঠে। নটবরের মূল পরামর্শদাতা ন'কড়ি চাটুজ্যে বলে,

—নুটুদা বউদিকেই দাঁড় করিয়ে দাও। বউদিই যোগ্য মহিলা। ওঁকে জিতিয়ে এনে প্রধান করো।

ন'কড়ি স্কুলের শিক্ষক। অবশ্য স্কুলের খাতায় তার নামটা রেখেছে নটবর। সেই এখন স্কুলের প্রেসিডেন্ট। তবে ন'কড়ি স্কুলে যায়, মাঝে মাঝে বাকি সময় পঞ্চায়েত অফিসেই কাজকর্ম করে দেয়। বাকি শুধু সই করার কাজটা নটবর নিজে করে।

নটবর-এর নিজের দৌড় ওই অবধি। আর বাসন্তীর দৌড় পাঠশালার দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। তবে আঁকাবাঁকা অক্ষরে নামসই করতে পারে।

নটবর বলে,

—ও কি এসব কাজ চালাতে পারবে ন'কড়ি। এখন পঞ্চায়েতের কাজে কত ঝামেলা। অফিসের কাজ ছাড়াও মিটিং করতে হবে অফিসারদের সঙ্গে।

ন'কড়ি বলে,

—নুটুদা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কে জানো?

নটবরের দৌলতে এখন নুটুও দেশের অনেক খবর জানে। তাই বলে,

—কেন? রাবড়ী দেবী।

—ওর বিদ্যে কদ্দুর জানো দাদা? ছিল ঘরের বউ, ওকেই লালুজী বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দিল। আর বিহারের রাজ্যপাটও তো ঠিকঠাক চলছে।

নটবরও এবার ভাবছে কথাটা। তারও মনে হয় একটা রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রীর কাজ যদি একজন ঘরের বউ করতে পারে। তবে ঘরের বউ হয়ে বাসন্তীই বা কেন পঞ্চায়েতের কাজ করতে পারবে না। আর বাসন্তী পঞ্চায়েত প্রধান হলে ব'কলমে নটবরই সব কাজ চালাবে এখন যেমন চলছে সেই ভাবেই। কোনও গোলমালও হবে না ওই নবনির্বাচিত প্রধানকে নিয়ে। নটবর বলে,

—কথাটা একটু ভাবতে দাও হে ন'কড়ি। আর তোমার বউদিকেও বলে দেখি রাজি হয় কি না।

ন'কড়িও চায় এমন একটা অপদার্থ প্রতিনিধিকে প্রধানের গদিতে বসাতে। তাতে লাভ হবে ন'কড়িরও। তাই বলে,

—আরে রাজি কেন হবে না বউদি। এমন সম্মানের পদ, আর নারী স্বাধীনতার যুগ তুমিই বউদিকে নারী স্বাধীনতা দিয়েছ সেটাও দেখবে সবাই। নটবর একটা কঠিন সমস্যার সমাধানের পথ পেয়ে খুশিই হয়।

খবরটা অবশ্য বাসন্তীর কাছেও পৌঁছে গেছে এর মধ্যে। বাড়ির কাজের মেয়েটাও ওদের চা দিতে গিয়ে সব শুনে গিয়ে বলে বাসন্তীকে।

—বউদি, বাবু তোমাকেই এবার প্রধান বানাবে। এখন ব্যাটাছেলেরা প্রধান হবে না। মেয়েরা প্রধান হবেক। তাই জন্যি বাবু তোমারে প্রধান বানাবে। কী হবে গো?

কাজের মেয়েটা যেন ভাবনায় পড়ে। কিন্তু বাসন্তী স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার ভাগ্যে এইভাবে শিকে ছিঁড়ে সব কিছু তার হাতেই আসবে। প্রধানের গিন্নি হয়েই অ্যাদ্দিন তাকে খুশি থাকতে হয়েছিল। এবার সেইই নিজে প্রধান হবে। চেয়ারে বসে অফিসে পাখার

নীচে বসে থাকবে আর কত লোকজন এসে নমস্কার করবে তাকে। বাসন্তী দুহাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশে নমস্কার করে,

—বাবা রত্নেশ্বর। এতদিনে মনোবাসনা পূর্ণ করেছ বাবা। জয়বাবা রত্নেশ্বর। ভবেশ এবার এম.এ. করেছে। কদিন বাড়িতে এসেছিল। সেও দেখেছে গ্রামের মধ্যে সতীশ চাটুজ্যের ওই পরিবর্তন। সুন্দর মন্দির করে শীর্ণ সতীশ চাটুজ্যে এখন সাধকে পরিণত। চেহারাতে এসেছে বেশ নধরভাব।

পিয়ালীর সঙ্গেও দেখা হয়েছে, পিয়ালী বলে,

—আজকাল মানুষ যত বেশি অন্যায় করছে অন্যদিকে ততবেশি মাথা ঠুকছে কোনও শূন্য দেবতার পায়ে। চারিদিকে তো শুনি নানা কয়লা মাফিয়াদের রাজত্ব চলছে, সেই অন্ধকারের পথেই এসব চলছে।

পিয়ালী এমনিতে স্পষ্টবাদী মেয়ে।

ভবেশেরও মনে হয় তার বাবাও নানা পথে শুধু টাকাই রোজগার করেছে। ভবেশেরও মনে হয় তার বাবা সুরেশজির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অন্ধকারের ব্যবসাও করে। পিয়ালী তার বাবার এই মিথ্যা ধর্মের নামে বুজরুকিটাকে সহ্য করবে না। ভবেশও তার বাবা নটবরের এই ভণ্ডামিকে সহ্য করতে পারে না।

ভবেশ নীচে চা খেতে বসেছে। দেখে মায়ের ঘরে এর মধ্যে পাড়ার দু-চারজন গিন্নিও এসে পড়েছে। এর মধ্যে গ্রামের মহিলামণ্ডলে অনেক জল্পনা-কল্পনাও শুরু হয়েছে। সরকার নাকি এবার মেয়েদের জন্যও ভাবছে। মেয়েরাও এবার অঞ্চলে ভোটে দাঁড়াবে। প্রধানও হতে পারবে।

আর বাসন্তী যে প্রধানই হতে চলেছে। এ-খবরটা অবশ্য বাসন্তীই চাউর করেছে। ওর অনুগৃহীত অনেক মহিলাই তাই এসেছে। বাসন্তী তাদের দরাজ হাতে চা আর পান দোক্তা বিলোচ্ছে। আর বলে,

—আমি এসব হতে চাইনি। কে যাবে ওই চেয়ারে বসে প্রধানগিরি করতে। তা অন্যরা দাঁড়াল না। তারাই বলছে ভোটে দাঁড়াতেই হবে। ভবেশের বাবাও তাই বলছিল। ন'কড়ি মাস্টার তো বারবার তাই বলছে।

পাড়ার গিন্নিরা বলে,

—এসব কাজ তো নটু ঠাকুরপোর নখদর্পণে গো। তুমি বাছা তাই হও। আমাদের গোপালের একটা হিল্লে করে দাও। দুটো পাস করে বেকার বসে আছে।

মুখুজ্যে গিন্নি দেখে দত্তগিন্নি আগেই ওর গাওনা গেয়ে চলেছে। তাই মুখুজ্যে গিন্নি বলে,

—আমরা তোমার ভোটে কাজ করব। গাঁয়ে গাঁয়ে মেয়েদের কাছে যাব। জিতলে তখন কথা।

ভবেশ এই কালনেমির লঙ্কাভাগের মধ্যে এসে গেছে। দেখছে ওই মহিলারা যেন আজই গাছকোমর করে ভোটযুদ্ধে নেমে পড়তে চায়। ভবেশ বলে,

—কী ব্যাপার কাকিমা—কার ভোটে নামবে তোমরা?

মুখুজ্যে গিন্নি পক্ করে খানিকটা পানের পিচ ফেলে বলে,

—ওমা, তুই জানিস না ভবা! দেশের লোক জেনে গেল আর তুই জানলি না?

দত্তগিন্নি ফোড়ন কাটে,

—পিদিমের নীচেই অন্ধকার। তোর মা যে এবার গ্রামের প্রধান হবে রে।

ভবেশ যেন আঁতকে ওঠে। মায়ের এলেম সে জানে। লিখতে গেলে পটপট করে কলম ভাঙবে। তাই বলে,

—সেকী! তুমি হবে অঞ্চল প্রধান?

বাসন্তী ছেলের কথার এবার চটে ওঠে,

—কেন, আমি কী মানুষ নই। মেয়েরা কি এতই অধম। রাবড়ী দেবী যদি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে তাবে আমিই বা কেন গ্রামপ্রধান হতে পারব না।

ন'কড়ি মাস্টার আগে থেকেই বাসন্তীকে উদাহরণ দিয়ে সাহসী করে তুলেছে। ভবেশ বলে,

—একালে সবই সম্ভব। তবে এর পর এখানের কী হাল হবে কে জানে? লড়ে যাও তাহলে সৈন্যবাহিনী নিয়ে।

বাসন্তী বলে,

—মেয়েদের এত ছোট ভাবিস না রে। দেখবি মেয়েরা সব কিছু করতে পারে। আর তাই করে দেখিয়ে দোব।

নটবর সাবধানি লোক। সে প্রথমে ভেবেছিল ন'কড়ি বললে বাসন্তী রাজি হবে না ভোটে দাঁড়াতে। কিন্তু সেও অবাক গদির মোহ যে মানুষকে এমন করে দিতে পারে সেটা এবার বুঝেছে সে। বাসন্তীই বলে,

—আমিই দাঁড়াব। দেখবে ঠিক জিতে যাব। গদিতে বাইরের কেউ বসবে এ হতে দোব না। ওটা আমাদের ঘরেই থাকবে। যেভাবেই হোক গদি তার হাতে রাখতেই হবে।

নটবরও তাই চায়, তবু তার ভয় হয়। যদি বাসন্তী হেরে যায় তা হলে তার দলে আর মহিলা সদস্য নেই। ওদিকে কিশোরের দলও মহিলা ক্যাডার খুঁজছে। তা হলে ওদের জেতা মহিলা প্রার্থীকেই গদি ছেড়ে দিতে হবে। এটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না নটবর, তাই আর একজন মহিলা প্রার্থী দিতে হবে দলে।

পচা ভেবেছিল এবার নাম উঠবে। নুটুদা তাকে ভোটে দাঁড়াবার সুযোগ দেবে। কিন্তু নটবরের নজর গদি হাতে রাখার দিকে। তার দরকার মহিলা প্রার্থীর, তাই পচার কথায় বলে,

—তোর নাম কমিটিতে তুলেছি, কমিটি মত দিয়ে দেবে। কদিন সবুর কর। পুরোনো সভ্যদের তো চটানো যাবে না। তবু দেখছি।

এই বলেই পচাকে ঠেকিয়ে রেখেছে নটবর। আর মহিলা প্রার্থীর খোঁজও চলছে। মাধব কবরেজও খবরটা পেয়ে গেছে। এখন মাধব এর মধ্যে মালতীকেও পাঠিয়েছে নটবরের অফিসে। অবশ্য মালতী এখন নটবরের নজরে আছে। ন'কড়িও ওকে চোখে চোখে রেখেছে। মালতী জানে ন'কড়িই নটবরের ডান হাত।

নটবরই সেদিন ন'কড়িকে বলে,

—আরে একটি মেয়েকে খোঁজ হে। মানে একজন যদি সিলিপ করে অন্যজন তবু সামলাতে পারবে।

ন'কড়িও চায় মালতীকে আনতে। মেয়েটাও কাজের। আর দলের মধ্যে একটা ভালো মেয়ে থাকলে দলের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

কে বলে,

—সতীশ চাটুজ্যের মেয়ে পিয়ালীকে যদি আনা যায়।

ন'কড়ি, নটবর চেনে মেয়েটাকে। ওকে সে বিশ্বাস করে না। মেয়েটা বিনয়বাবুর ভক্ত। নটবর বলে,

—না, —না। ওটা এঁচোড়ে পেকে গেছে। ও অনেক কিছু জানে, বরং কম জানে অথচ কথা শুনবে তেমন কোনও মেয়েকেই দ্যাখো।

ন'কড়ি বলে,

—তা হলে মাধব কবরেজের মেয়ে মালতীকেই দলে নিই। ওকেই দাঁড় করানো যায় ভোটে।

এখন বাসন্তীও দলের ভোট নিয়ে কথা বলছে। বাসন্তীই বলে,

—তা মন্দ হবে না। মেয়েটা ভালোই। আর আমাদের কথামতোই চলবে।

মাধবও হাজির হয় খবরটা পেয়ে। সে এখন স্বপ্ন দেখছে তার মেয়েটার একটা গতি এবার হবে। বেকার মেয়েটার বিয়ে-থা দেবারও সাধ্য নেই। মাধবের রোজগারও কমেছে। এসময় মালতী পঞ্চায়েতে সভ্য হলে তার দিনও বদলাবে। আর মালতীর দিনও বদলাবে। মাধব বলে,

—নুটুবাবু ভাববেন না। মালতী আপনাদের কথামতোই চলবে। আমি কথা দিচ্ছি।

মালতীও ভাবতে পারেনি যে নটবরবাবু তাকেই ভোটে দাঁড় করাবে। তাদের দলের হয়ে। মালতীও এখন থেকেই ভোটের প্রচারে নেমে পড়েছে।

নন্দবাবুও বসে নেই। এবার নটবরের দলকে চরম শিক্ষা দিতে চান তিনি। তাই তার দলের জন্য যোগ্য একজন প্রার্থী খুঁজছেন।

কিশোর পিয়ালীর কথাটা ভাবছে।

সতীশ চাটুজ্যে এখন মন্দিরের কাজেই ব্যস্ত। অবশ্য মন্দিরে বসেই সে সব খবর পায়। এখন বাবার দয়ায় তার সংসারে অভাব নেই। তবু সতীশ চাটুজ্যে অতীতের সেই অভাবের আর অবহেলার দিনগুলোর কথা ভোলেনি। তাই সে আরও অনেক কিছুই পেতে চায়। যাতে তাকে আর কোনওদিন ওই অভাবের মুখোমুখি না হতে হয়।

নন্দবাবু এসেছেন সতীশের কাছে। সন্ধ্যা আরতির ভিড় চুকে গেছে। ভক্তরা ফিরে গেছে। এ সময় মন্দির একটু ফাঁকা থাকে। মন্দির ফাঁকা হতে এবার নন্দবাবুই বলেন,

—হে চাটুজ্যে, বাবা মহাদেবের ইচ্ছাতেই এবার সরকার নটবরকে হটিয়েছেন। ওর জায়গায় এবার ভোটে নতুন প্রধান আসবে মেয়েদের মধ্যে থেকে।

সতীশ বলে,

—হ্যাঁ, শুনেছি বটে কথাটা।

—তাই ভাবছি নটবর তো ওর গিন্নিকে আর ওই মাধব কবরেজের নচ্ছার মেয়েটাকে দাঁড় করাচ্ছে। আরে গ্রামে কী আর ওদের থেকে ভালো লেখাপড়া জানা বুদ্ধিমতী মেয়ে নেই। তাই আমরা ভাবছি। তোমার মেয়েকে ভোটে দাঁড় করাব। আর জিতিয়ে এনে ওকেই প্রধান করব।

সতীশের বুকে যেন হঠাৎ একটা সাড়া জাগে। তার পিয়ালী অবশ্য বি. এ পাস করেছে। ভালো কথাবার্তাও বলতে পারে। এর মধ্যে এই অঞ্চলে মহিলা সমবায় করে

সদরেও নামডাক করেছে। কিন্তু প্রধান-এর চেয়ারে বসবে এটা ভাবতেই পারে না সতীশ। এ যেন বাবা মহাদেবেরই দয়া। তবে সতীশ জানে তার মেয়েটা একটু বেপরোয়া ধরনের। সব কথাতেই চট করে মত দেয় না। তর্ক করার অভ্যাস।

তবু যদি কোনওমতে মত করাতে পারে সতীশের আরও প্রতিষ্ঠা বাড়বে। আর মেয়েটারও গতি হয়ে যাবে।

নন্দবাবু বলেন।

—এত কী ভাবছ হে?

সতীশ বলে,

—না, ভাবছি না নন্দবাবু। তবে পিয়ালীকেও বলতে হবে। ওকে মত করাতে হবে।

—তাই করো। দরকার হয় পিয়ালীর সঙ্গে আমিও কথা বলব। তুমি বলে দ্যাখো কী হয়।

পিয়ালী শুনেছে কথাটা। এনিয়ে মহিলা সমবায়েও কথা হয়েছে। রমলাদিও দেখেছে তারা পঞ্চায়েতের সাহায্যর জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছে—তবু কোনও সাহায্য পায়নি। নটবরবাবুরা তাদের সমিতিকে টাকা সাহায্য করেনি। রমলাও বলে,

—আমাদেরই এবার পঞ্চায়েতে দাঁড়াতে হবে। মেয়েদের অধিকার অর্জন করতে হবে। না হলে পুরুষরা কোনওদিন আমাদের ন্যায্য দাবিকে স্বীকৃতি দেবে না।

পিয়ালীও সেটা দেখেছে। তাই তার পঞ্চায়েতের উপর, নটবরের দলের উপর খুশি ছিল না। এবার ওদের সামনে সরকারই সেই সুযোগ এনে দিয়েছে। রমলাদিও বলে,

—পিয়ালী এবার আমরাও পঞ্চায়েতে দাঁড়াব। সমবায়ের মেয়েদের মধ্যেও এনিয়ে আলোচনা হয়। আর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পিয়ালীকে তারা দাঁড় করাবে।

পিয়ালী ভাবে। মেয়েদের মধ্যে নতুন করে উৎসাহ জাগে। পিয়ালীও বাড়ি ফিরছে। দেখে বাবা তখনও বাইরের ঘরে বসে আছে।

সন্ধে গড়িয়ে রাত নামে। পিয়ালী বলে,

—বাবা শুতে যাওনি। আবার ভোরে উঠে মঙ্গলারতি করতে হবে।

সতীশ চাটুজ্যে বলে।

—তোর জন্য বসে আছি মা। জরুরি কথা আছে।

পিয়ালী চাইল। সতীশ চাটুজ্যে বলে এবার নন্দবাবুর কথাটা।

—ওরা এসেছিল। তোকে ওরা পঞ্চায়েতের ভোটে দাঁড় করাতে চায়। আর ভোটে জিতলে ওরা তোকেই প্রধান করবে। এবার এখানে নটবরের গদি চলে যাচ্ছে। কোনো মহিলাকে প্রধান করতে হবে এই নির্দেশ আছে।

পিয়ালী এবার বাবার কথাগুলো শুনছে। এর আগেই সমবায়ের অফিসেও এই আলোচনা হয়ে গেছে। পিয়ালী জানে এবার নতুন করে ভোটে একা দাঁড়াবার মতো শক্তি, সামর্থ তাদের নেই। যদি কিশোরবাবুদের সমর্থন পাওয়া যায়, কাজটা আরও সহজ হয়ে উঠবে। তাই পিয়ালী বলে,

—কথাটা একটু ভেবে দেখতে দাও বাবা। রমলাদিকেও জিজ্ঞাসা করি, বিনয়স্যারকেও।

সতীশ খুশি হয় না। সে চায় পিয়ালী মত দিক। প্রধান হতে পারলে শুধু পিয়ালীরই নয়। সতীশেরও অনেক সুবিধা হবে। তাই বলে,

—আবার এসবের মধ্যে ওদের আনা কেন? ওরে নিজের কথাটাও ভাববি না। এমন সুযোগ বারবার আসে না।

—তবু যা করার ভেবেচিন্তেই করতে হবে। ওরা কতটা সত্য কথা বলছে এটাও জানা দরকার। শেষে গাছে তুলে যদি মই কেড়ে নেয় তখন কী হবে?

সতীশও ধান্দাবাজ লোক। মেয়ের কথায় সেদিকটাও ভেবে নেয়। বলে,

—তা-হলে ওদের সঙ্গে কথা বল। তবে নন্দবাবু নিজে যখন বলছে তখন ওকে বিশ্বাস করতে পারিস।

পিয়ালী আর একজনের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলতে চায়। ভবেশ এখন বাড়িতে রয়েছে। ভবেশও শুনেছে তার বাবা এবার মাকে আর ওই মালতীকে শিখণ্ডী করে ভোটে জিতে নিজের গদিই বকলমে কায়েম রাখতে চায়।

মালতী অবশ্য এর মধ্যে এসে ভবেশকে প্রণাম করে। ভবেশ ঘরে কাজ করছিল। মালতী হঠাৎ ঘরে এসে ঢোকে, তারপর বলে,

—এবার ভোটে দাঁড়াচ্ছি। তাই তোমাকে প্রণাম করে প্রচারে বের হচ্ছি। আশীর্বাদ করো যেন জিততে পারি।

ভবেশ মালতীকে দেখতে থাকে। তার বাবা এবার আর এক খেলা খেলতে শুরু করেছে। এ যেন ছেলেখেলাই। ভবেশের মনে হয় যেন ভাগাড়ে একটা মৃত পশুর দেহ পড়ে আছে। আর তাকে ঘিরে কিছু শকুনি কুকুরের দল ছেঁড়াছিড়ি করছে আর নিজেদের মধ্যেও নখ দাঁত বের করে মাঝে মাঝে লড়াই-এর মহড়া দিচ্ছে।

গণতন্ত্রের পীঠস্থান পঞ্চায়েত। সরকার যার ছায়া। সারা গ্রামীণ সমাজের কল্যাণ করতে চায়। সেই পঞ্চায়েতকে কলুষিত করতে চায় একদল লোভী মানুষ। তারা গণতন্ত্রের শত্রু অথচ মুখে তারাই গণতন্ত্রেরই বুলি কপচায়।

মালতী বলে,

—এবার দেখবে কেমন সমাজসেবার—দেশসেবার কাজ করি। ওই পিয়ালী তো সমবায়ের নামে অনেক অপকর্ম করে। ওর মুখোশও খুলে দোব।

ওদিকে ভবেশের মাও সেজেগুজে বের হয়েছে। এর মধ্যে ন'কড়ি মাস্টার এ বাড়িতে এসে মায়ের জন্য সরল যুক্তাক্ষর বর্জিত ভাষায় মায়ের বক্তৃতাও লিখে দিয়েছে। আর ন'কড়িই বার বার রিহার্সাল দিয়ে তার মা জননীকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথাও বলতে শেখাচ্ছে।

ভবেশ বলে,

—এসবের দরকার কী মা, বেশ তো শান্তিতে ছিলে, খাচ্ছিলে-ঘুমোচ্ছিলে আবার এসব কেন।

বাসন্তী এখন নেত্রী হতে চায়। তার চোখেও গদির স্বপ্ন। সেও বলে,

—তুই থামতো। এটা নারী স্বাধীনতার যুগ। মেয়েদেরও এগিয়ে আসতে হবে দেশ গড়ার কাজে।

ভবেশ হাসে।

—না। নকড়ি স্যার বেশ ভালোই ডায়ালগ দিয়েছে দেখছি। তালিমও দিয়েছে। বাসন্তী খুশি হয়।

—তা হলে! পারব তো রে ভাষণ দিতে। ভোটে জিতব তো?

—সিওর। বাবার বাহিনী তো রেডি আছে। পচাও তৈরি। কে হটায় তোমায়?

ভবেশ দেখছে গদির নেশায় সবাই মেতে উঠেছে। তবে গদি একটাই। মালতীও সেই গদির স্বপ্ন দেখে। আর স্বপ্ন দেখে নটবরও ওদের সামনে রেখে গদির মালিক হবে সে।

ভবেশ এসেছে সেই বাগানে, সন্ধ্যার পর এদিকটা নির্জন হয়ে যায়। ঝোপে ঝোপে জোনাকির পুঞ্জ জ্বলে। দু-একটা শিয়ালও বের হয়। সাবধানি দৃষ্টিতে এদিকে-ওদিকে চেয়ে দেখে শিকারের সন্ধানে। পিয়ালীও এসেছে আজ। তখন গ্রামের দিক থেকে ওদের ভোটের মিছিলের জয়ধ্বনি ওঠে। ভবেশ বলে,

—কী যে হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। আমার মাও নেমেছে লড়াইয়ে। মালতীকে-ও দেখলাম। মেয়েদের মধ্যেই যদি কাউকে প্রধান করতে হয় যোগ্য কেউ দাঁড়াক। তা নয় এ কী প্রহসন হচ্ছে।

পিয়ালী চুপ করে থাকে। ভবেশ বলে,

—তুমিই দাঁড়াও। তবু সত্যিকার কিছু কাজ হবে এ গ্রামে।

পিয়ালী কথাটা এতক্ষণ বলতে পারেনি, এবার ভরসা পেয়ে বলে,

—আমাকে সমবায়ের সকলেই দাঁড়াতে বলেছে।

—তাই দাঁড়াও। ওই অযোগ্য মহিলাদের হাতে প্রশাসনের ভার পড়লে অরাজকতা বাড়বে।

পিয়ালী বলে,

—সত্যি বলছ?

—আমিও তাই চাই পিয়ালী। যোগ্যতম লোকই আসুক। সমাজে বাস করতে হবে। স্বাধীনতার পর একটা প্রজন্ম আমাদের গড়ার কাজের চেয়ে ভাঙার কাজই বেশি করছে। যা গড়েছিল সেগুলোকে পরবর্তিকালে রাখতে পারেনি। সেই প্রজন্মের সব ভুলকে শুধরে নতুন প্রজন্মকে আবার অগ্নিশুদ্ধ হয়ে নতুন করে সব কিছু গড়তে হবে।

পিয়ালী শুনছে ভবেশের কথা। এ যেন বিনয়স্যারের কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বিনয়বাবুও বলেছিলেন কথাটা।

প্রতিদিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আধঘণ্টা সময় নাকি রাহু গ্রহের প্রকোপ থাকে। জ্যোতিষ-শাস্ত্র তাই বলে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ওই আধঘণ্টা সময়ই সব থেকে অশুভ কাল। সেই অশুভ কালও আসে আবার চলে যায়। মানুষ সেই কালকে অস্বীকার করতে পারে না। তাকে মেনে নিয়েই আবার শুভকালের প্রতীক্ষা করে।

আমাদের সমাজজীবনে যেন এখন সেই রাহুকালই চলেছে। এখন ভাঙনের পালা। কিন্তু এ অশুভকালও থাকে না। মানুষ এ অশুভ কালকেও উত্তীর্ণ করে শুভদিনের প্রতীক্ষা করে। ভবেশ বলে,

—এই অশুভ কালকে উত্তীর্ণ হতেই হবে। তাই নতুন লোকেদেরই এগিয়ে আসতে হবে। জীর্ণ পুরোনো সব কিছুকে হটিয়ে আবার নতুন করে বরণ করতে হবে, নতুন করে গড়তে হবে সব কিছু।

পিয়ালী সেই প্রজন্মেরই একজন। আর ভবেশও। পিয়ালী জানায়,

—তাহলে দাঁড়াতে বলছ?

—হ্যাঁ। আর আমিও তোমাকে সমর্থন করব।

—কিন্তু তোমার বাবা-মা।

পিয়ালীর কথায় ভবেশ জানায়,

—ওরা জানে আমি ওদের এই কাঙালিপনাকে সহ্য করতে পারি না। ওদের যোগ্যতার চেয়ে অনেক বেশিই পেয়েছে ওরা। আর কেন?

ঝিঁঝি ডাকছে। বাগানের পাতায় পাতায় হাওয়ার দোলা। দু-একটা পাখি মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। আবার নামে স্তব্ধতা। একটা কাল যেন এখানের স্তব্ধতার রাজ্যে এসে হঠাৎ তার গতি হারিয়ে এই নির্জনতার মধ্যে হারিয়ে গেছে। সেখানে এক নতুন সময়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটি নরনারীর আদিম সত্তা, যার এই অন্ধকার আরণ্যক পরিবেশ থেকে যেন মুক্তির স্বপ্ন দেখছে।

নটবরও খবরটা পেয়ে যায়। কিশোরবাবুর দলের নামও বের হয়েছে। তাদের মধ্যে ওরা মহিলা প্রার্থী হিসেবে রেখেছে পিয়ালীর নাম। আর তাদের প্রচারেও বলা হচ্ছে পিয়ালী নির্বাচিত হলে প্রধান হবে। পিয়ালীর প্রচারে নেমেছে ওর সমবায়ের মেয়েরা ও তাদের নেত্রী রমলাদি। পিয়ালী-রমলা দুজনেই লেখাপড়া জানা মেয়ে। আর বক্তা হিসেবেও ভালো। রমলাদিও কিশোরবাবুদের সমর্থন পেয়েছে পিয়ালীর ব্যাপারে। কিশোরবাবু নটবরদের তুলনায় অনেক নির্ভরযোগ্য লোক। লেখাপড়া জানে। বনেদি পরিবার। নটবরের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠা শ্রেণির কেউ নয়।

ওদের মিটিংএ লোকজনও প্রচুর হচ্ছে। কিন্তু নটবরও চেষ্টার ত্রুটি করেনি। ন'কড়িবাবুও এখন মিটিংএ বাসন্তী, মালতীকেও হাজির করেছে। মালতীও সেজেগুজে সভায় ভাষণ দেবার চেষ্টা করে। বাসন্তীও নেত্রীর মতো রাশভারী ভঙ্গিতে চলাফেরা করে। সে যেন এক্ষুনিই প্রধানের গদিতে বসে গেছে। তাই সভায় ঘোষণা করে,

—পাকা রাস্তাঘাট করে দোব। যত টিউবওয়েল চাই হবে। জলের কোনও সমস্যাই থাকবে না।

পচা লোহার এবারও মেম্বার হতে পারেনি। অবশ্য নটবর তাকে বলে,

—আমিই আউট হয়ে গেলাম দেখলি না পচা। ব্যাটা ছেলেদের বরাতে আর কিছুই থাকবে না। সামনেবার কামিনীকেই দাঁড় করিয়ে দোব। তুইও সভ্য হবি। এখন এবারের ভোটটা সামলে দে।

নটবর পচাকে ভালো টাকা পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে। সুরেশজির কয়লা কারবারের একটা দিক এখন নটবর সামলাচ্ছে। পচা তার লোকজন নিয়ে সেই কাজই করে। কারখানা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। নটবর সেখানেও পচাকে কিছু মাটি কাটার কাজের ঠিকাদারি পাইয়ে দিয়েছে। পচা দেখেছে এদের সঙ্গে থাকলে কোনো না কোনো ভাবে কিছু পাওয়া যায়। তাই মনে মনে চটলেও একেবারে ছেড়ে যেতে পারেনি।

তবে পচাও বুঝেছে নটবর তাকে পুরোমাত্রায় সবকিছু পেতে দেবে না। অথচ তার জন্যই নটবর আজ এত পেয়েছে। নটবরের জন্য সে নরেশবাবুকে খুন করেছে। তবুও তার প্রাপ্য দেয়নি নটবর। তাই পচাও খুব একটা খুশি নয়। তবে ভোটে কাজ করছে পচা।

দু-একটা গ্রামের লোক-নাকি ন'কড়িদের মিটিংএ ঝামেলা করেছিল। পচা তাদের

কয়েকজন মাতব্বরকে এর মধ্যে চমকেও এসেছে। আর নটবরও পুলিশ দিয়ে কয়েকজনকে তুলে এনে চুরির কেসে আসামী করে হাজতে দিয়েছে।

অবশ্য এনিয়ে কিশোরবাবু মায় পিয়ালীও মহিলা সমিতিকে নিয়ে প্রকাশ্যে মিটিংএ পুলিশের কাজের সমালোচনা করেছে। শহরের পত্রপত্রিকাতে এসব সংবাদও বের হতে নটবরও অবাক হয়। ন'কড়ি বলে,

—নুটুদা এবার পুলিশ মায় প্রশাসনও যেন গড়বড় করছে। আর শহরের টিভি-খবরের কাগজওয়ালারাও সব খবর ছাপছে নয়তো ছবি তুলে দেখাচ্ছে। গ্রামের লোকজনও ওদের সব কথা বলে দিচ্ছে।

নটবর বলে,

—তাই দেখছি। কাগজওয়ালাদের তবু পারা যায়। কিন্তু ওই টিভির লোকেরা তো ছবি তুলে দেখাতে শুরু করেছে। শালাদের ম্যানেজ করো হে ন'কড়ি।

সুরেশ আগরওয়াল এসেছে এই এলাকার অরণ্য অঞ্চলে। তার লোকজন নিয়ে এখানেও সে তার সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চায়। এতদিন এই অঞ্চল ছিল ঘন বনে ঢাকা। মধ্যে দামোদরের বিশাল বাদা। ওপারে রানিগঞ্জ, আসানসোলের কয়লা ও অন্যান্য খনিগুলো ক্রমশ দামোদরের ব্যারেজ পার হয়ে এই অরণ্য বিস্তৃত এদিকেও মানুষের নজর পড়ে। এদিকে লোকবসতিও কম তবে এখন দুর্গাপুরের সঙ্গে যোগাযোগের পথ হতে ওপারের শিল্পাঞ্চলের হাওয়া এসে লেগেছে এদিকের মাটিতেও। সুরেশজিও অবশ্য খবর পেয়েছে যে এই অঞ্চলে সার্ভে করে প্রচুর কয়লার সন্ধান পেয়েছে। আর ইস্টার্ন কোলফিল্ডসও এসব কয়লা তোলার কাজ শুরু করবে।

সুরেশজি তাই আগে থেকেই এই অঞ্চলের বনের গভীরে তার ধান্দা শুরু করেছে। এরপর সে তৈরি করতে চায় এখানের কয়লা লাইমস্টোন দিয়ে বাইরের থেকে আয়রন ওর আনিয়ে নিজে স্পঞ্জ আয়রনের কারখানা করবে। তাই সুরেশ চায় নতুন পঞ্চায়েত গড়ে উঠলেই তার কাজ শুরু করবে। তাই প্রশাসনকে হাতে রাখার জন্য একদিকে সে যেমন নটবরদের মদত দিচ্ছে। অন্যদিকে কিশোরদেরও হাতে আনার চেষ্টা করছে।

কিশোরবাবুকে সুরেশজি টোপ দিয়েছে।

—তোমাকেও পার্টনার করে নোব।

কিশোরও জানে সুরেশজি নটবরকেও এই একই কথা বলেছে। অবশ্য নটবরের দিকেই সুরেশজির টান বেশি। নটবরের সংগঠন মানে পচা লোহার ও তার দলবলও রয়েছে। ওদের দিয়েই সুরেশ এখন তার কাজ করাচ্ছে। কিন্তু কিশোরকেও কিছু টাকা দেয় সুরেশজি গোপনে। বলে,

—তুমি ইলেকশন লড়ো জোরসে।

নটবর এখন সুরেশজির অফিসে প্রায়ই আসে। সঙ্গে পচাও থাকে। পচা এখন প্যান্ট শার্ট জুতো পরে ঘোরে। একটা মোটরবাইকও কিনেছে। তবু পচার দুঃখ এখনও সে সভ্য হতে পারেনি। সেও চায় নেতা হতে।

ভোটের বাজারও উঠেছে। এখন গ্রামের পথে ভোটের ক্যাডার। হাটতলায় মিটিং—মাইকের চিৎকার। ভোটের দিনও এসে গেছে।

এবার পচার দলও যথারীতি বের হয়ে পড়ে। কিশোরের দলও তৈরি। দু এরিয়ার

বুথে বোমাবাজিও হয়ে যায়। গোলমাল হয়—আবার পুলিশ আসে। ভোটও শুরু হয়। নটবর এতদিন যে একছত্র আধিপত্য করেছিল ভোটের দিন এবার তা করতে পারবে না।

কিশোরও তার দলবল নিয়ে ঘুরছে। পচাও এবার তেমন উৎসাহ নিয়ে কাজ করেনি। এখন তার হাতেও পয়সা এসেছে। কামিনীও বার বার নিষেধ করে,

—অনেক পাপ করেছ। আর নয়, নটবরবাবু তো তোমাকে পাত্তাই দেয়নি। এবার মেয়েদের ভোটে আর লড়াই করো না।

নটবর হন্যে হয়ে ঘুরছে। বাসন্তী-মালতীও বুথে বুথে ঘুরছে। এর আগে বাড়ি বাড়ি গেছে লোকজন এবং বাড়ির মেয়েদের কাছে ভোটপ্রার্থী হয়ে। পিয়ালীও ঘুরেছে। সে অবশ্য এর অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভোটের প্রচার করতে গিয়ে বাসন্তী-মালতীর সঙ্গে দেখা হয়েছে, ওরা গাড়িতে করে প্রচার করছে, পিয়ালীর গাড়ি নেই। সে সাইকেল নিয়েই এ-গ্রামে সে-গ্রামে ঘুরছে। নয়তো পথেঘাটে অন্য মেয়েদের সাথে ঘুরছে।

মালতী দামি শাড়ি পড়ে বাসন্তীর সঙ্গে ঘোরে। সে এখন বাসন্তীর কাছের লোক। অবশ্য নটবর ওদের প্রচারে কোন ত্রুটি করেনি। ন'কড়ি ওদের জন্য রঙিন পোস্টার হ্যান্ডবিল এসবও প্রচুর ছাপিয়ে এনে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিয়েছে, হাটতলায় গাছে গাছে ওদের নামের রঙিন ব্যানার হাওয়ায় উড়ছে। মাইকের ওদের নামের আওয়াজ আকাশ-বাতাসে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে।

সেই জৌলুস পিয়ালীদের প্রচারে তেমন নেই। পিয়ালী বলে মালতীকে,

—ভয় পেয়ে পালিয়ে যাওয়া আমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই রে মালতী। এর শেষ দেখে তবেই ছাড়ব।

মালতী বলে,

—তবে তৈরি থাক। কাকিমাই জিতছে আর আমিও তাই দেখিয়ে দোব।

ওরা পিয়ালীকে আমল না দিয়েই গাড়িতে ওঠে। ওর মুখের ওপর এক ঝলক পেট্রল পোড়া কালো ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বিজয়রথ নিয়ে চলে গেল। পিয়ালীর সঙ্গীরা বলে,

—এর জবাব পরেই দোব। চল পিয়ালী।

ভোট চুকে গেছে। বিভিন্ন বুথ থেকে ভোটের বাক্সও চলে গেছে বিডিও অফিসে। ওখানেই পরে গোনা হবে। সেখান থেকেই ফল ঘোষণা করা হবে, সন্ধ্যার পর স্তব্ধতা নেমেছে—বেশ কিছুদিন ধরে সারা এলাকা ভোটের প্রচারে সরগরম হয়ে উঠেছিল। মাইকের গর্জন, বাদ্য বাজনাসহ দলের মিছিল মিটিং—স্লোগানের পালা শেষ হয়েছে। সে সব স্তব্ধ হয়েছে। সারা এলাকার মানুষেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রতীক্ষা করছে ফলাফলের জন্য পিয়ালীও জানে। তার কী হবে, অবশ্য নটবর আশা করে তার দল বিপুল ভোটে জয়ী হবে।

ওদিকে কিশোরবাহিনীও আশা করে তাদেরও এবার সিট বাড়বেই। পিয়ালী অবশ্য নির্দল প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিশোরবাবু তাকে সমর্থন করেছে। পিয়ালী ওর সমবায়ের মেয়েদের নিয়ে নিজেই লড়ছে। তাই সে ফলাফল সম্পর্কে অনিশ্চিত।

ফল প্রকাশের দিন নটবর, ন'কড়ি-পচার দল জানে তারাই জিতছে। নটবর সকাল

থেকে তৈরি হয়েছে। পচা এর মধ্যে শহর থেকে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে এসেছে। এনেছে বস্তা কয়েক আবির। আজ রাতে ফল ঘোষণার পর গণভোজনও হবে। তার জন্য লুচি আর পাঁঠার মাংসেরও বরাদ্দ হয়েছে। সেই সঙ্গে পচা তার দলকে দিয়ে বেশ কয়েকটা একস্ট্রা স্ট্রং বোমাও বানিয়েছে। ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে যে কজন সভ্য তাদের দলের নির্বাচিত হবে সেই কটা বোমা ফাটানো হবে।

পঞ্চায়েতে সভ্য সংখ্যা তেরো, নটবর বলে,

—পচা নিদেন দশটা বোমা নিয়ে চল। তিনটে রাখ কিশোরদের জন্য।

বাসন্তী বলে,

—পিয়ালীকে কত ভোটে হারাব সেটা জেনে নিস পচা। ওই মেয়েটাকে পরে জবাব দিতে হবে।

মালতী জানায়,

—ওর জন্য আপনি ভাববেন না কাকিমা। পিয়ালীকে জবাব আমিই দোব। বেচারা কত আশা করেছিল প্রধান হবে।

ন'কড়ি বলে,

—বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। আজ বুঝবে মজা।

পিয়ালী অবশ্য যায়নি ওই গণনাকেন্দ্রে। রমলাদি গেছেন কয়েকজন মেয়েকে নিয়ে। ওরাও জানে না ফলাফল কী হবে। কিশোরবাবুর দলও গেছে। নটবর সদলবলে কয়েকটা গাড়ি নিয়ে গেছে। নটবর ভবেশকেও যেতে বলেছিল, কিন্তু ভবেশ বলে,

—আমাকে আজই শহরে যেতে হবে। কালই একটা পরীক্ষা আছে।

বাসন্তী বলে,

—তা কেন যাবি? তবে দেখিস শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আমি জিতবই।

ন'কড়ি এর মধ্যে শহর থেকে ডজন কয়েক মালাও আনিয়েছে। এখানে ভালো মালা পাওয়া যায় না। তাই মালা এনে কলাপাতায় মুড়ে জল দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছে। ফল ঘোষণার পরই এসব লাগবে বিজয় মিছিল করতে।

ওদিকে গণনার কাজ চলছে। বাইরে লোকজনের ভিড়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। বিডিও অফিসে আরও কয়েকটা পঞ্চায়েতের ভোট গণনা চলছে। তাদের ফল একে একে বের হচ্ছে। নন্দীপুর পঞ্চায়েতের গণনা এবার শুরু হচ্ছে বলে খবর আসে।

মালতী ঘামছে। তার মেকআপ গলে গলে পড়ছে। বাসন্তীও সেজেগুজে এসেছে। ঘন ঘন পানদোক্তা মুখে পুরছে। নটবর এদিক-ওদিক পায়চারি করছে। তার নিজের গদি তবু বাসন্তী আর মালতী নির্বাচিত হলে প্রধানের পদ আগলে রাখতে পারবে।

মাইকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। নটবর গেছে ভিতরে। বাইরে উৎসুক জনতা। বাসন্তী মালতীও কান পেতে শুনছে। দেখা যায় এক অদ্ভুত পরিস্থিতি, নটবরের দলের ছ'জন প্রতিনিধি জিতেছে। আর কিশোরের দলেরও ছ'জন নির্বাচিত হয়েছে। দুদলের প্রার্থী সংখ্যাই সমান সমান। মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বাসন্তী মালতী কেউ জেতেনি। জিতেছে নির্দল প্রার্থী পিয়ালী চাটুজ্যে। বাসন্তী আর্তনাদ করে ওঠে,

—একী হল রে? ওরে মালতী।

মালতী বলে,

—তাই তো দেখছি কাকিমা। এত ঘুরলাম দোরে দোরে—

বাসন্তী বলে,

—সবগুলো ঘাটের মড়া। বেইমান। হে বাবা রত্নেশ্বর আমার সঙ্গে যে বেইমানি করেছে তাকে সবংশে নিধন করো বাবা।

নটবর মুখ কালো করে ফিরে আসে ভিতর থেকে। এমন ফল সে আশা করেনি। তার দলের সভ্য সংখ্যা ছিল নজন এবার তিনটে সিটে তারা হেরেছে। আর তার ওপর দুপক্ষই সমান সমান। এখন পিয়ালী যার দলে যাবে তারাই পঞ্চায়েতে আসন পাবে আর প্রধান হবে পিয়ালী।

ন'কড়ি বলে,—রিকাউন্টিং করো।

নটবর ফুঁসে ওঠে।

—থাক্। আর মরদগিরি দেখাতে হবে না। তোমার মুরোদ বোঝা গেছে, শুধু বড় বড় কথা।

পচা চুপ করে থাকে, ওদের বাদ্যিবাজনা আর বাজে না, কে বলে,

—নুটুদা তাহলে বিজয় মিছিলের কী হবে?

নটবর গর্জন করে ওঠে,

—আর বাদ্যি বাজাতে হবে না, কারও পৌষ মাস আর কারো সর্বনাশ। পচা তোকে আর বোমা ফাটাতেও হবে না। বাড়ি চল, তার পর দেখা যাবে।

এর মধ্যেই গ্রামে খবরটা পৌঁছে গেছে। নন্দবাবু এখন সতীশ চাটুজ্যের বাবা মহাদেবের পরম ভক্ত। নন্দবাবু এখানে এসে হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন, কিশোরের দল যেন জেতে। সতীশ চাটুজ্যে রক্তাম্বর পরে বসে আছে মন্দিরের চাতালে নন্দবাবুর পাশে।

সতীশ চাটুজ্যে এখন সব দিক থেকেই গুছিয়ে নিয়েছে। সেও ভাবতে পারেনি যে খালের ধার থেকে তুলে আনা সেই পাথরটা এমনি করে তার ভাগ্যই বদলে দেবে। অবশ্য তাকে ধরাধামে আবির্ভূত করার জন্য সতীশকে বেশ কায়দা করতে হয়েছিল। মাথা ঘামিয়ে সেই নিজে ওই মাটির গর্তে পাথরটাকে ওভাবে পুঁতে রেখেছিল। তারপর রোজ নিয়ম করে তেল সিঁদুর মাখিয়ে স্নান করিয়ে ওকে দেবতায় উত্তরিত করেছে। সতীশ বলে।

—নন্দবাবু, বাবা ঠিক মুখ তুলে চাইবেন। দেখবেন, আপনার দল জিতবে। এবার বাবা শূলপানি ওই নটবরের অসুরটাকে সংহার করবেনই।

নন্দ বলেন,

—ওর গিন্নিটা যদি জিতে যায়? কী মন্দ কপাল হে আমার। যখন গিন্নিদের প্রধান হবার পালা এল, তখনই আমার গিন্নি এই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। থাকলে ওকেই প্রধান করতাম।

সতীশ চাটুজ্যে অবশ্য মনে মনে ভাবছে যে নন্দের গিন্নি গিয়ে ভালোই হয়েছে। তার মেয়েটা যদি এবার গদি পায়। সতীশ চাটুজ্যের বাড়ির চেহারাটাও এখন বদলে গেছে। ওর বাড়ির কিছুটা ফাঁকা জায়গাতে এখন একতলা পাকা বাড়িও করেছে। সতীশ ভাবছে যদি পিয়ালী প্রধান হতে পারে তাহলে তার দোমহলা দালান কোঠাই হবে। আর একটা গাড়ি কেনে যদি পিয়ালী—

এমন সময় সাইকেলে করে নেপাল হাঁপাতে হাঁপাতে আসে,

—জিত গিয়া—জিত গিয়া পিয়ালীদি, জিত গিয়া কিশোরদার দল।

সতীশ চাইল,

—কী হলরে ন্যাপা।

এর মধ্যে লোকজনও জুটে গেছে। ন্যাপা সাইকেল থেকে নেমে চিৎকার করছে।

—জিতে গেছে পিয়ালীদি, নুটুগিন্নি, মালতী গন ফট্।

নন্দও ধড়ফড়িয়ে ওঠেন।

—কিশোরদের কী হল রে?

ন্যাপা বলে,

—কিশোরদার দলে ছজন জিতেছে, নুটুর দলেও ছজন। একেবারে সেম সেম, আর মেয়েদের মধ্যে ওনলি পিয়ালীদি।

সতীশ খুশিভরে জয়ধ্বনি দেয়,

—জয়বাবা মহাদেব। জয়—

মন্দিরেব ঘন্টাটা ফায়ার ব্রিগেডের অ্যালার্মের মতো জোরে ঢং-ঢং করে বাজাতে থাকে। গ্রামের স্তব্ধ আকাশ-বাতাস ওই ঘণ্টার শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। সারা গ্রামে যেন নটবরের পরাজয়ের খবরটা ওই ঘন্টাধ্বনির মধ্যে জানান দিতে চায়। ভক্তদের কণ্ঠে জয়ধ্বনি ওঠে। নন্দও চিৎকার করেন।

—জয় বাবা মহাদেব।

এতদিন পর বাবা মহাদেবই যেন নুটু অসুরকে শাস্তি দিয়েছে।

ঘন্টা বাজছে। আর তালে তালে জনতা চিৎকার করে,

—হারল কে? নুটুবাবু আবার কে?

ওদের চিৎকারে মিশেছে ঘণ্টাধ্বনির শব্দ।

নটবর বাসন্তীরা ফিরছে গাড়িতে। ওরা গ্রামে ঢোকার মুখে সতীশের ওই পাগলা ঘন্টার শব্দ আর ওই স্লোগান শুনে গর্জে ওঠে নটবর।

—না জিততেই এত কাণ্ড। মন্দিরে বসে আমার নামে শাপশাপান্ত করা হচ্ছে। সতীশ চাটুজ্যের এত বড় হিম্মত।

বাসন্তী এতক্ষণ ধরে কেঁদেছে। কেঁদে-কেঁদে চোখ-মুখ ফুলে গেছে। ফেরার সময় বাসন্তী আর মালতীকে গাড়িতে তোলেনি। বলে,

—অপয়া মেয়েটাকে দাঁড় করাতে গেলে, অলক্ষুণে মেয়েটা, নিজেও হারল আমাকেও ডুবিয়ে গেল। বাবা রত্নেশ্বর ওর পিতিকার করো বাবা—

এতক্ষণ ধরে বাসন্তী চুপ করেছিল সারাটা পথ, শুধু ফুঁপিয়ে কেঁদেছে,

এবার বলে,

—দ্যাখো, কেমন শত্তুর সব জুটেছে। মেয়ে জিতেছে তাই ঘন্টা বাজানো হচ্ছে। হে বাবা রত্নেশ্বর।

নটবর তখন কী ভাবছে। এতদিন পর এবার গদি ছাড়তে হবে। কথাটা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। কিছু একটা ভেলকি তাকে দেখাতে হবে।

নটবর গিন্নিকে বলে,

—একটা পথ বের করবই। এত সহজে গদি ছাড়ব না। একটা হেস্তনেস্ত করবই।

গাড়িটা চলে আসে। ওদের দেখে জনতার চিৎকার আর ঘন্টাধ্বনি আরও বেড়ে ওঠে।

কিশোরবাবুর দল গতবারের তুলনায় এবার অনেক ভালো ফল করে তাদের আসনও বাড়িয়েছে। কিশোরও খুশি। এবার পিয়ালীর সমর্থন তারা পাবে। আর তারাই পঞ্চায়েত বোর্ড গড়বে নটবরের দলকে হারিয়ে। পিয়ালী শেষের দিকে বিডিও অফিসে গিয়েছিল। ওদিকে তখন নটবরের দলে হাহাকার পড়ে গেছে। নুটুগিন্নি গাছতলায় বসে হাউমাউ করে কাঁদছে। ধুলোয় লুটোচ্ছে দামি বেনারসী শাড়ি। মালতী কী বলতে যাবে—বাসন্তী খিঁচিয়ে ওঠে,

—থামতো তুই, অপয়া—অলক্ষুণে ছুঁড়ি। তোর জন্যই এই অবস্থা।

ওদিকে কিশোরের দল পিয়ালীকে ঘিরে জয়ধ্বনি দিচ্ছে। বাসন্তীও দেখে। ও তো সেরকম জয়ধ্বনি নয়। বাসন্তী জিতলে ওর থেকেও বেশি জয়ধ্বনি পেত। ব্যান্ড বাজত। তা আর হল না। জিতে গেল ওই কালকের মেয়েটা। বাসন্তী বলে নটবরকে,

—ঢের হয়েছে। এবার ঘরে চলো। ওঠো।

মালতী এগিয়ে আসে। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে যে ওকে ওরা আর কেউই পাত্তা দেয় না। মালতীকে একাই ফিরতে হবে বাড়িতে। ওদিকে কিশোরবাহিনী তখন কলরব করে ফিরছে। কিশোরবাবুরা পিয়ালীকে গাড়িতে তুলে নেয়। ন্যাপা ওর সাইকেল নিয়ে মাঠের মধ্যে দিয়ে সোজাপথে গ্রামে ফেরে সুখবরটা দেবার জন্য।

ভবেশ এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে রিসার্চ শুরু করেছে। আজকের গ্রামীণ অর্থনীতি তার গবেষণার প্রধান বস্তু। শহরে নটবরের একটা বাড়ি আছে। ওই বাড়ির পরিবেশ ভবেশের ভালো লাগে না। বাবা-মা যেন একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। ভবেশ দেখে গ্রামীণ অর্থনীতিকে এদের মতো লোভী-স্বার্থপর লোকেরাই বিপন্ন করে তুলেছে। সরকারি বহু টাকা যা গ্রামের কল্যাণে সরকারি তহবিল থেকে আসে তার বেশির ভাগটাই সেই কাজে ব্যয়িত হয় না। ওটা চলে যায় মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে,

আর এই লুঠ করার মানসিকতা সর্বত্রই সব দলের মধ্যে রয়েছে। অন্য মতান্তর থাকলেও এই আত্মসাৎ করার ব্যাপারে কারও কোনও মতান্তর নেই। সে গবেষণার কাজে বহু গ্রাম ঘুরেছে অবশ্য কোথাও কোথাও দেখছে সত্যিকারের কাজ হচ্ছে আর সেগুলো সহজেই চোখে পড়ে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয়নি আর এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে একটা অসাধু ব্যবসায়ী শ্রেণিও।

কিন্তু অন্ধকারের মধ্যেও ভবেশ দেখেছে মানুষ এবার ভয় জয় করে ও প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসছে। নতুন যুগের মানুষ এবার মাথা তুলছে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

ভবেশ এদিকের কোনও কলেজে লেকচারার-এর চাকরি পেয়েছে। সে বাবার কাছ থেকে আর টাকা-পয়সাও নিতে চায় না। ওর টাকা নিতে তার নিজেরই কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে। তাই সে এই কাজ করে নিয়েছে। এর সঙ্গে গবেষণার কাজ শেষ করে ফেলতে পারলে সে অধ্যাপকের পদই পাবে।

ভবেশ কদিন পরই বাড়ি ফিরেছে। দেখে ভোট যুদ্ধের ফলাফল বের হয়েছে আর বাসন্তী বলে,

—তুই ছিলি না। ওরা আমাকে জোর করে হারিয়ে দিল।

—আচ্ছা মা।

ভবেশ যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সারা এলাকার মানুষ যেন একটা চরম বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছে। বাসন্তী বলে,

—ওই জোচ্চোর বামুন সতীশ চাটুজ্যের মেয়েটা জিতল শেষ অবধি।

ভবেশ মনে মনে এখন খুশিই হয়। তবে সেই ভাবটা প্রকাশ করা নিরাপদ হবে না ভেবেই বলে,

—ভোটে অনেক রকম কারচুপি হয় মা।

বাসন্তী জানে সে সব কাজে তার পতিদেবতা খুবই নিপুণ। কিন্তু এত কিছু করেও কোনও লাভ হয়নি। বলে বাসন্তী,

—তোর বাবাকেও তাই সব করতেও বলেছিলাম, তা তোর বাপটা কোনো কম্মের নয়। হেরে গেলাম রে—

পিয়ালী এখন ব্যস্ত। দু-একদিনের মধ্যে পঞ্চায়েতের নবনির্বাচিত সভ্যদের মিটিং বসবে। আর সেখানেই প্রধান নিয়োগের কথা হবে। এবার কিশোর চায় সত্যিকাবের কিছু কাজ করতে, তাই নিজেদের মধ্যেই তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে জরুরি আলোচনাও চলছে। পিয়ালী খবর পেয়েছে ভবেশ ফিরেছে। পিয়ালী জানে ভবেশ ওর বাবা নটবরের কর্মপন্থাকে কোনওদিনই সমর্থন করেনি। আর বাপ-ছেলের মধ্যে নীরব একটা ব্যবধানই গড়ে উঠেছে। ভবেশ মার্জিত রুচির তরুণ, সে প্রকাশ্যে বাবার বিরোধিতা না করলেও সে বাবার কাজগুলোকে মেনে নিতে পারেনি, পিয়ালীরও দরকার ভবেশকে।

এর মধ্যে পিয়ালী বিনয়বাবুদের ওখানেও গিয়েছিল। রমলাদি সমবায়ের মেয়েরাও খুশি, পিয়ালীর জয়ে। বিনয়বাবু বলেন,

—দ্যাখো এবার যদি সত্যিকারের উন্নয়নের কাজ করতে পারো। তবে নানা বাধা আসবে। একটা স্বার্থপর শ্রেণি নানা ভাবে বাধা দেবে কিন্তু তোমায় সেসব বাধা উত্তীর্ণ হতেই হবে।

পিয়ালী বলে,

—আমি চেষ্টা করব স্যার।

বিনয়বাবু বলেন,

—নিজের সঙ্গেও অনেক সময় যুদ্ধ করতে হবে। পিয়ালী নিজের কথা এতদিন ভাবেনি, ভাবতেও চায় না। তবু কেন জানে না তার মনেও একটা সুর বাজে। মনে পড়ে ভবেশের কথাটা।

ভবেশ গ্রামের মধ্যে একজনকে ভয় করে, তাকে এড়িয়ে চলে। ভোটের আগে দেখেছে মালতীকে তার মা দিনরাত সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে। মালতীও যেন এ বাড়ির একজন হয়ে উঠেছে। মালতীও ভবেশকে বুঝিয়ে দিতে চায়, ভবেশ তাকে পাত্তা না দিলেও ভবেশের বাবা-মা তাকে আপনজন বলেই ভাবে, ভবেশের মনে ভয় হয় তার বাবা-মা কি মালতীকে নিয়ে নতুন কিছু ভাবছে। ভবেশ ওকে মেনে নিতে পারবে না, তার জন্য বাবা-মায়ের সঙ্গে সংঘাতে যেতে হয় তাও যাবে। তাই ভবেশ চাকরিটা নিয়েছিল কলেজে। তেমন দেখলে সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে।

তাই ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরেছিল। কিন্তু বাড়িতে এসে দেখে মা হেরে গেছে। আর মালতীরও দেখা মেলে না। ভবেশ সেদিন বিকেলে বেরিয়েছে, বাগানের দিকে যাচ্ছে।

গ্রামের পথে- ঘাটে এখন ভোটের কথাই চলছে। নটবরের বাড়িতে এখন নটবরের লোকেদের নিয়ে মিটিং চলছে। একটা শুনশান ভাব।

ওদিকে মাধব কবরেজের চেম্বারেও এক অবস্থা, বাড়ির বাইরে একটা তক্তাপোশ পাতা, মাধবের রুগিপত্তর এখন নেই, একাই বসে তামাক টানছে। মাধব আশা করেছিল মালতী ভোটে জিতে প্রধান হবে, আর নটবরদের সঙ্গে বেশি মাখামাখি দেখে মাধব ধরেই নিয়েছিল মেয়েটা যদি ও বাড়ির বউ হতে পারে তারও ভাবনা দূর হবে। পাত্র হিসাবে ভবেশ সত্যিই ভালো। কিন্তু ভোটের ফল বের হবার পর থেকেই নটবরের স্ত্রীও আর মালতীকে পাত্তা দেয় না। যাবার সময় গাড়িতে করে নিয়ে গেছে ভালবেসে। কিন্তু হেরে যাবার পর ওইখানেই ফেলে রেখে চলে এসেছে।

মালতীও ব্যাপারটা বুঝেছে। তারও হেরে যেতে মন ভেঙে গেছে। সে সময়ই তাকে বাসন্তী ফেলে চলে গেল ইচ্ছে করেই, তারপরও ওকে যা-তা বলেছে, যেন ওর জন্যই নটবরের দলবল হেরেছে ভোটযুদ্ধে। মাধবও চটে ওঠে। কিন্তু নটবর হেরে গিয়ে এখন বুনো মোষের মতো ফোঁস ফোঁস করছে। তাই মাধব তাকে কিছু বলতে সাহস করেনি। তবে তার মনেও একটা অভিযোগ জমে রয়েছে।

ভবেশকে দেখে মাধব বলে,

—ও-ভবেশ! ভবেশ বাবাজি—

ভবেশ ওর ডাক শুনে কী ভেবে এগিয়ে যায়।

—ডাকছেন?

—এসো বাবাজি। বোসো এই তক্তাপোশের উপরে।

ভবেশ বের হয়েছে অন্য কাজে। পিয়ালীও এ সময় বাগানে আসবে, তাই বলে,

—একটু কাজে যাচ্ছিলাম।

—যাবে, যাবে। তোমাকে দেখে ডাকলাম। তো ভোটের কথা শুনেছ তো?

ভবেশ বলে,

—এখন সারা গ্রামে তো ওই চলছে, এছাড়া কি আর কোনো কাজই নেই কবরেজকাকা।

মাধব বলে,

—আমিও তাই বলি। তবে কি জানো বাবাজি যুদ্ধে হার-জিত আছেই। আর ভোটেও। তাই বলি মেয়েটার কী দোষ বল। আমি মালতীর কথা বলছি। ভোটে তোমার মা হেরে গেলেন। আর বদনাম দিলেন মালতীকে। ও নাকি অপয়া—অলক্ষুণে। ওকে আর পাত্তাই দিলেন না।

ভবেশ এবার নিশ্চিন্ত হয়। তাহলে মালতীকে মা-বাবা দুজনেই বাতিল করেছে। ভবেশ বলে,

—এসব তো জানি না কবরেজকাকা।

মাধব বলে,

—তোমার জানা উচিত বাবা। তুমি বিবেচক—

মালতীও ভিতর থেকে বাবার কথাগুলো শুনছিল। সেও এবার বের হয়ে আসে, ভবেশ উঠে পড়ে। সে বলে,

—আমি চলি কবরেজকাকা।

ভবেশও যেন পালাতে পারলে বাঁচে। সে চলে যায়। মালতী দেখছে পলায়মান ভবেশকে। মালতীকে আজ ওরা সবাই যেন অগ্রাহ্য করে, এড়িয়ে চলে। মালতী নীরব রাগে ফুঁসতে থাকে। মাধবকে বলে,

—যাকে তাকে ডেকে ওসব কথা কেন বলো বাবা। ও তো ওই নটবর ভট্চাযেরই ছেলে। ও আর কত ভালো হবে।

মালতী কথাটা যেন ভবেশকে শুনিয়েই বলে। ভবেশ নীরবে চলে যায়।

পিয়ালী বাগানে এসেছে। হঠাৎ ভবেশকে হাসতে হাসতে ঢুকতে দেখে চাইল, বাগানে তখন পাখিদের কলরব চলছে। পিয়ালী বলে,

—হাসছ যে!

—তোমার জয়ে খুশি হয়েছি। হাসব না?

পিয়ালী ওর দিকে তাকিয়ে দেখছে। ভবেশ বলে,

—পথে মাধব কবরেজ মশাই ডাকলেন। ওর মেয়েকে আমার বাবা-মা নাকি মাথায় তুলে গোবর কাদায় ফেলে দিয়েছেন। অবশ্য ওরা তো ভালোমতোই চেনে আমার বাবা-মাকে। তবে একটা ফাঁড়া কেটে গেছে।

—ফাঁড়া? পিয়ালী চমকে ওঠে।

ভবেশ বলে,

—ভাগ্যিস ওরা জেতেনি। জিতলে আমার যে কী হাল হত! তাই ভাবছি ফাঁড়া কেটে গেছে।

পিয়ালী হাসছে। সে বলে,

—কিন্তু এবার আমি যে সত্যিই বিপদে পড়লাম। যদি ওরা আমাকে প্রধান বানায় কী যে হবে?

—তুমি তোমার মতো করেই কাজ করবে। আর কিশোরবাবুরা যদি পঞ্চায়েতে আসে কিছু কাজ হবে,

পিয়ালী বলে,

—কী করব বুঝতে পারছি না—

—এ পথে তোমাকে একাই চলতে হবে পিয়ালী। নিজেকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাধাও আসবে কিন্তু থেমে গেলে চলবে না।

—-বড় ভয় করছে।

পিয়ালী বুঝতে পারে আজ তার সামনে একটা শক্ত চ্যালেঞ্জই উপস্থিত হয়েছে।

নটবর এবার ভাবনায় পড়েছে। এতদিন ধরে সে পঞ্চায়েতের টাকা নানাভাবে খরচ করেছে। এসব টাকাও গেছে অন্য খাতে। আর বেশির ভাগ টাকাই নানাভাবে নয়ছয় করেছে। সে সব খরচেরও কোনও সঠিক হিসাব নেই। খাতাপত্রও ঠিকমতো রাখা যায়নি। এ ছাড়া তাদের নিজের লোকেদের বিনা টেন্ডারে অনেক টাকার কাজ পাইয়ে দিয়েছে। সেসব কাজও শেষ হয়নি, টাকা খরচ হয়ে গেছে। সব ক্ষেত্রেই প্রচুর বেআইনি কাজ করেছিল। ভেবেছিল গদিতে সেই থাকবে, আর কোনওমতে ওই ব্যাপারগুলোকে ধামাচাপা

দিয়ে দেবে। কিন্তু হঠাৎ এইভাবে পায়ের নীচের মাটি সরে যাবে ভাবেনি নটবর। এবার নটবরও বিপদে পড়ে। ন'কড়িও জানে কীভাবে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে আছে এখানে। পরের কমিটি এসব ধরে টান দিলে তারপর তদন্ত পুলিশ কেসও হবে। ন'কড়ি বলে,

—এসব ধরা পড়লে কোমরে দড়ি পড়বে নুটুদা। ওই কিশোরবাবু এসব কিছুর তদন্ত করাবে। এত টাকার ব্যাপার।

নটবরও তো বুঝেছে, সে বলে,

—একটা কিছু করো ন'কড়ি। এখন পিঠ বাঁচাতে হবে তো।

ন'কড়ি বলে,

—একটা পথ আছে, কিন্তু—

—আবার কিন্তু কিন্তু করে ঢোক গিলছ কেন? হেঁচে-কেশে বলো তো কী করলে কী হয়।

ন'কড়ি ভেবেছে কথাটা, সে বলে,

—ওই পিয়ালীকে যদি আমাদের দলে কোনওমতে আনা যায়। তা হলে আমরা হব মেজরিটি। বোর্ড গড়ব আমরা। পিয়ালী তখন আমাদের লোক হবে। ও নিশ্চয়ই খুঁচিয়ে ঘা করবে না। আমাদের গায়েও হাত পড়বে না।

—তাই করো। বলো মেয়েটাকে।

অবশ্য ন'কড়ি সেই চেষ্টাই করছে। আজও সে গিয়েছিল সতীশ চাটুজ্যের বাড়িতে। পিয়ালীকে কথাটা বলেছিল। কিন্তু পিয়ালী চেনে নটবরকে। ওর বহু কুকীর্তির খবরও জানে পিয়ালী। নটবর পিয়ালীকে সেদিন অকারণে অপমান করেছিল। পিয়ালী দেখেছে নটবর মালতীকে কত তোল্লা দিয়েছিল। তার পর ওই স্বার্থসিদ্ধি না হতে তাকে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছে। নটবরকে তাই বিশ্বাস করে না পিয়ালী। তাই সে সাফ জানিয়ে দেয়,

—ওতে আমি রাজি নই ন'কড়ি কাকা, নটবরবাবুর দলে আমি যেতে পারব না, কিশোরবাবুরা ওর তুলনায় অনেক ভালো। আমি কথা দিয়েছি ওদের দলেই যাব।

ন'কড়ি কথাটা নটবরকে জানায়,

—ওর কাছে আমি কবারই গেছি নুটুদা। ওকে আমি কত বোঝালাম। কিন্তু ও আমাদের দলে আসতে রাজি নয়। ও সাফ বলে দিয়েছে কালই মিটিং। কালই ও কিশোরবাবুদের দলে যাবে। আর নতুন বোর্ড গড়া হবে।

নটবর ফুঁসে ওঠে।

—এত তেজ ওই মেয়ের। আমার দলে আসবে না?

—তাই তো বললে। এখন কী হবে নুটুদা?

নটবর ভাবছে, কালই ওর গদি ওরা দখল করে নিয়ে তাকে কাঠগড়ায় তুলবে। নটবর ভাবছে। একটা পথ যেন সে পেয়ে যায়।

সে বলে,

—ন'কড়ি এবার মরণ-বাঁচন লড়াই হে। একটা কিছু করতেই হবে।

পচা লোহার জানে নটবরের তাকে দরকার হবেই। তাই এবার নটবরের ডাক পেয়ে সে এসেছে নটবরের ঘরে। নটবর বলে,

—একটা কাজ করতে হবে পচা।

—তোমার কাজই তো করছি নুটুদা। তোমার জন্য এত করি তবু তুমি আমাকে দেখলে না।

পচার দুঃখ সে মেম্বার হতে পারেনি। নটবর বলে,

—এবার পিঠ বাঁচাই। তোকে দেখছি, দেখবও। এখন তো ভালোই কাজ চলছে।

পচা অবশ্য কথাটা অস্বীকার করতে পারে না। এখন কয়লার কাজ ঠিকঠাকই চলছে। আর নতুন কাজও আসবে। তাই রাগ থাকলেও নুটুদাকে চটাতে পারে না। এ দলে থাকতেই হবে।

নটবর তারপর ওকে কাজের কথাটা বলতে পচা একটু ঘাবড়ে যায়। খুনখারাপি — বোমাবাজি—গুলি এসব কাজ এর আগে করেছে। কিন্তু এ রকম কাজ এর আগে করেনি। কাজটা অবশ্য তেমন কঠিন নয়। কিন্তু ঝামেলা হতে পারে।

অবশ্য নটবর সে সব সামলাবে। নটবর বলে,

—কীরে পচা কাজের কথা শুনে চুপসে গেলি যে, ভয় করছে?

নটবরও যেন পচার পৌরুষে ঘা দিয়ে কথা বলতে চায়।

পচা বলে।

—তা নয় গো। তবে কাজটা কি ঠিক হবে?

আগে কখনও পচার মনে এ ধরনের প্রশ্ন আসেনি। এখন নটবরের কথার উপর কথাটা বলতে নটবর বলে,

—তুই কাজটা করবি কি না বল? ভীতু কোথাকার।

—ভীতু আমি নই। করব তবে গোলমাল হলে সামলাতে হবে কিন্তু।

নটবর এ কাজটা খুবই গোপনে করতে চায়। তাই বলে,

—সে হবে'খন। এর আগেও সামলেছি। নইলে তো জেলে পচতিস।

পচা তা জানে। সে বলে,

—ঠিক আছে হয়ে যাবে। আজই—

নটবর তার প্ল্যান প্রোগ্রাম সব বাতলে দেয় পচাকে। পচা সব প্ল্যান শুনে কী ভেবে বলে,

—তাই হবে। তুমি সব ব্যবস্থা করে রাখো।

সন্ধ্যা থেকেই বৃষ্টি নেমেছে। কিশোরের বাড়িতে ওদের দলের মিটিং বসেছে। জরুরি মিটিং। পিয়ালীও এসেছে। কালই শুভদিন। কালই ওরা বোর্ড গড়বে। কিশোর ভীষণ খুশি। নন্দবাবুও। এতদিন পর নটবরকে হারিয়ে তারা আবার শাসনক্ষমতা হাতে পাবে। সাধারণ মানুষও তাই চায়। তাই তারা ভোটও দিয়েছে কিশোরদের। বৃষ্টি পড়ছে। গ্রামের বুকে অন্ধকার নেমেছে।

এবার কিশোর ভাবছে তাদের গ্রামেও আলো আসবে, পথঘাট হবে। গ্রামে পাকা রাস্তা। আলো আর পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হবে। তারপর স্কুলের উন্নতি আর স্বাস্থ্য-কেন্দ্রকে নতুন করে চালু করতে হবে।

পিয়ালীও তাই চায়।

আলোচনা সেরে ফিরছে পিয়ালী। দুটো পাড়ার মধ্যে খানিকটা বাগান মতো রয়েছে।

এদিকটায় ঘরবাড়ি কম। পুকুরের ওপরে বাগানের বাইরে শুরু হয়েছে আবার অন্য পাড়ার জনবসতি। শীত শীত ভাবটা তখনও রয়েছে। তার সঙ্গে বৃষ্টি আর কনকনে হাওয়ার জন্য লোকজনও বের হয়নি। বাগানের মধ্যে দিয়েই পথটা। পচা তার দলবল নিয়ে ও পথেই ঘাপটি মেরেছিল। বাগানের ওপাশে মাঠে ধানও উঠে গেছে। এখন একেবারে শুকনো। পচা তার দলবল নিয়ে তৈরি ছিল।

পিয়ালী অন্ধকারে সাইকেল নিয়ে ফিরছে। অন্ধকারে পথের রেখাটা দেখা যায় — সাইকেলের গতিবেগও কম। বাগানের মধ্যে অন্ধকারে হঠাৎ দুদিকে থেকে কাদের বের হয়ে এসে তার সাইকেলের হ্যান্ডেলটা চেপে ধরতে দেখে চাইল। ঠিক ঠাওর করতে পারে না। পিয়ালীকে ওরা ধরেছে শক্ত হাতে। একজন ওর মুখটা চেপে ধরে একটা গামছা খানিকটা পুরে দিয়ে সটান কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠের পথে বেরিয়ে যায়। এমন নিপুণভাবে মুহূর্তের মধ্যে যে ভাবে আক্রমণ করেছিল যে পিয়ালীর বাধা দেবার কোনো সুযোগই ছিল না। মাঠের মধ্যে দিয়ে কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে ঠিক ঠাহর করতে পারে না। প্রথমে সে বাধা দেবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু ওদের শক্তি একা পিয়ালীর থেকে অনেক বেশি। তাই পিয়ালী আর বাধা দেয়নি।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। শীতের রাত। গ্রাম থেকে বেশ খানিকটা দূরে এসে পড়েছে পিয়ালী। এরা কেন তাকে এভাবে তুলে নিয়ে চলেছে কিছুই বুঝতে পারে না সে। এবার পিয়ালীর খেয়াল হয়। ওরা ছোট নদীর ধারে নটবরের ফার্মের বাইরে এনেছে। চারিদিকে উঁচু প্রাচীর। পিয়ালী জায়গাটাকে চিনেছে। সেও অবাক হয়। এবার বুঝেছে তাকে নটবরের কোনও বাড়িতেই আটকে রাখা হচ্ছে। এ ভাবে জোর করে তুলে এনেছে। এ সবের মূলে রয়েছে ওই নটবরই।

বাড়ির গেটে লোকও তৈরি ছিল। বড় গেটের তালাগুলো খুলে যায়। ওরা পিয়ালীকে ভিতরে নিয়ে আসে। ওদিকে নতুন সুন্দর বাড়িটা। পিছনে গাছগাছালি। আর চারিদিকে তখন আঁধার নেমেছে। ,

নটবরের অনেক কিছু গোপন কাজকর্ম সংঘটিত হয় এই দূর মাঠের মধ্যে সুরক্ষিত জায়গা থেকে।

বাড়িটার মধ্যে পিয়ালীকে নিয়ে আসে। বাড়িটার চারিদিকের বারান্দা গ্রিল দিয়ে সুরক্ষিত। সুন্দর বাড়িটার মেঝেও মোজাইক করা। ইলেকট্রিক আছে। ওদিকে সাজানো বসার ঘর। ঘরে টিভি ও অন্যান্য আসবাবও রয়েছে।

ওই ঘরের মধ্যে ওকে নিয়ে আসে ওরা। এবার পিয়ালী দেখে পচাকে। পচা অবশ্য ভিতরে যায়নি। ও কাজ শেষ করেই সটকে গেছে। নটবরও এর জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেও এই চরম পথ নিয়েছে তার নিজের জীবন বাঁচাতে। নটবর খবরটা গোপনই রেখেছিল। বাড়িতেও কাউকে বলেনি। ওর মতলব খুবই সাফ। ও ভেবে রেখেছিল পিয়ালীকে তুলে এনে এই নির্জন বাড়িতে আটকে রাখলে কাল ওদের বোর্ড গড়া হবে না।

আর তার মধ্যে নটবরও যেভাবে হোক পিয়ালীকে বাধ্য করাবে তাদের দলে যোগ দিতে। ওকেই প্রধানও করবে। তবে পিয়ালীকে তার দলেই সই করাতে হবে। সেই প্ল্যান করেই নটবর এতটা ঝুঁকি নিয়েছে। ভবেশ এসবের কিছুই জানে না। সে মাঝে মাঝে

ওই নির্জন বাড়িটাতে এসে একা তার পড়াশোনা, গবেষণার কাগজপত্র তৈরি করে। বাড়ির পরিবেশ কদিন ওই ভোটের জন্য কেমন বদলে গেছে।

তাই ভবেশও ওই বাড়িটাতে গেছে সকালেই। এখানে রান্নাবান্না করার ব্যবস্থাও আছে। আর ওই বাড়ির প্রধান বিল্ডিং-এর দিকটা ভবেশ বড় একটা যায় না। ওটা বাবার বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। ওখানের ফ্রিজে অতিথিদের জন্য সুখাদ্য, পানীয়, ঠাণ্ডা পানীয় সবই মজুত থাকে। ওখানে রান্নার জন্য আলাদা লোকও আছে। ভবেশ থাকে পুকুরের ওদিকে গাছ-গাছালি ঘেরা ছোট একটা কটেজে। ওটাই তার কাজের জায়গা।

ভবেশ অবশ্য দূর থেকে দেখেছে ওদিকে কারা এসেছে। ঘরে আলো জ্বলে ওঠে। পুকুরের ওপর থেকে গাছগাছালির মধ্যে তেমন নজর যায় না। আর এসব নিয়ে ভবেশও তেমন উৎসুক নয়। এদিকে নটবরও এবার পিয়ালীকে হাতে পেয়েছে। ন'কড়িও সঙ্গে রয়েছে নটবরের। ন'কড়িকে সন্ধ্যার পর নটবর এনেছে এখানে। প্রথমে নকড়িকে সে এ-ব্যাপারে কিছুই জানায়নি। পিয়ালীকে ওইভাবে তুলে এনে ওদিকের ঘরে আটকে রাখতে দেখে এবার ন'কড়িও চমকে ওঠে।

—এ কী করেছ নুটুদা। মেয়েটাকে এই ভাবে কিডন্যাপ করে আনলে? নটবর যেন একটা মহাপুণ্যের কাজই করেছে। সে বলে,

—কী বললি কিটন্যাপ। মানে?

ন'কড়ি বলে,

—কিটন্যাপ নয় কিডন্যাপ। মানে অপহরণ। এ তো বেআইনি কাজ। যদি গোলমাল হয়। জানাজানি হয়। জেল হয়ে যাবে।

নটবর বলে,

—ও যদি আমাদের দলে মত দেয় — তা হলে এ সব কথাই উঠবে না। দেখি ওকে বলে।

ন'কড়ি তবু বলে,

—খুব বিপদের কাজ করেছ।

নটবরও বুঝেছে ন'কড়ির সাথে পরামর্শ না করে একাই এ কাজ করতে গিয়ে এবার সে একটা সাংঘাতিক বিপদই ডেকে এনেছে।

নটবর তাই আসে পিয়ালীর কাছে। পিয়ালীকে বসার ঘরে দেখে ভিতরে আসে নটবর। পিয়ালীও জানত নটবর আসবে। ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল সে। নটবরকে দেখে তাই পিয়ালী রাগে ফেটে পড়ে।

—কেন আমাকে এইভাবে জোর করে তুলে এনেছেন? আমি পুলিশে যাব।

নটবর পুলিশের কথা শুনে বলে,

—ওতে লাভ হবে না। যা বলি শোনো—তুমি আমার দলে আসবে। ওই কিশোরের দলে নয়। তুমিই প্রধান হবে। পঞ্চায়েত চালাবে, তবে আমার দলের হয়ে। লিখে দাও — ব্যস, এখুনিই বাড়ি ফিরে যাবে। কালই তোমায় প্রধান করে বিজয় মিছিল বের করব।

এমন একটা কিছুই বলবে নটবর এটা পিয়ালী আন্দাজ করেছিল। সেও নটবরের কথায় বলে,

—আপনার দলের প্রধান হবার জন্য আমি ভোটে দাঁড়াইনি। আমায় শত চেষ্টা করেও আপনার দলে আনতে পারবেন না। আমি আপনার দলে যাব না। আমায় যেতে দিন।

নটবর বেশ বুঝেছে পিয়ালী তার কথায় রাজি হবে না। নটবরও এই সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি হয় না। সে বলে,

—তোমায় শেষবারের মতো বলছি, বাঁচতে যদি চাও আমার কথা শোনো।

—না হলে কী করবেন? পিয়ালীও রুখে ওঠে।

নটবরও এবার চরম পথই নেবে। এর আগেও এমন পথ নিয়েছে। একজন প্রার্থীর কিছু হলে আবার নির্বাচন হতে পারে। আর তখন তার ভাগ্যের চাকাটা ঘুরেও যেতে পারে। নটবর শেষ অবধি দেখবে। সে বলে,

—না হলে তোমায় আর এ জীবনে প্রধান হতে হবে না। কেউই দেখেনি তোমায় এখানে আসতে। আমার কথা না শুনলে তোমায় শেষ করে এখানের জঙ্গলে মাটির তলে পুঁতে দেব। কেউ টেরও পাবে না।

পিয়ালী চমকে ওঠে। নটবর যে গদির জন্য এর আগেও এসব কাজ করেছে সেটা মনে পড়ে পিয়ালীর। সেই নরেশের খুনিরা আজও ধরা পড়েনি। আজও হয় তো সেরকম কিছু ঘটতে পারে। তবু পিয়ালী গর্জে ওঠে।

—এত বড় সাহস আপনার!

নটবর বলে,

—সেটার প্রমাণ দেখতে চেও না। আজ রাতটা ভেবে দেখো। এই টেবিলে খাবার দাবার সব আছে। খাবার খাও বিশ্রাম নাও। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখো—কাল সকালে তার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাত অনেক হয়েছে। ভালো চাও তো যা বললাম তাই করো। আমার কথামতো চললে কোনও অসুবিধা হবে না।

নটবর নিজেই গ্রিলের গেটটা বন্ধ করে এখানের কেয়ার টেকার মতিলালকে চাবিটা দিয়ে বলে,

—দিদিমণি রাতে থাকছে এখানে। ওর যেন কোনো অসুবিধা না হয়। চলো হে ন'কড়ি, ও ভেবেচিন্তে দেখুক—কাল সকালে কথা হবে। সাবধানে থাকবে।

নটবর ন'কড়িকে নিয়ে বের হয়ে গেল পিয়ালীকে ওখানে আটকে রেখে।

নিস্তব্ধ রাতের অন্ধকারে ভবেশ এদিককার কটেজ থেকে শুনেছে ওর বাবার কণ্ঠস্বর। আর পিয়ালীর নামটাও শুনেছে ওর বাবার—মুখে। ভবেশ কাদের আসতে দেখেছে, প্রথমে সে ঠিকমতো খেয়াল করেনি। তার পর তার বাবার তর্জন-গর্জন শুনে বের হয়ে আসে। বাইরে বিশেষ আলো জ্বালেনি ওরা। ইচ্ছে করেই বাইরের বাগানের আলোগুলো নেভানো। ভবেশ চুপিচুপি এগিয়ে আসে আর তার কানে আসে পিয়ালীর কণ্ঠস্বর। শুনে সে অবাক হয়। চমকে ওঠে ভবেশ। তার বাবা যে এমনি একটা সাংঘাতিক পদক্ষেপ নেবে ওই গদির মোহে এটা ভাবতে পারেনি।

ভবেশ বুঝেছে ওর বাবা জোর করে পিয়ালীকে তুলে এনেছে। ওর কথামতো পিয়ালী যদি ওর দলে না আসে নটবর পিয়ালীকে শেষই করে দেবে। ভবেশও অনুমান করে তার বাবা গদির জন্য আগে নরেশবাবুকেও সরিয়েছে। তার খুনের এখনও কিনারা

হয়নি। আর তাতেই ওদের সাহস অনেক বেড়ে গেছে। এবার মরিয়া হয়ে পিয়ালীকেও শেষ করে সব প্রমাণ লোপ করে দেবে।

ভবেশ পিয়ালীর প্রতিবাদে খুশিই হয়েছে। মেয়েটা তার সমূহ বিপদ জেনেও মাথা নিচু করেনি ওই নটবরের কাছে। ভবেশ আজ নতুন করে ভাবছে। তার বাবার এই জঘন্য কাজগুলোকে সে আর নীরবে মেনে নেবে না। সেও এখন নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। আজ সে এতবড় জঘন্য কাজের প্রতিবাদ করবে। কীভাবে করবে তাই ভাবছে সে। নিজের কটেজে ফিরে আসে।

সতীশ চাটুজ্যে মন্দিরে সন্ধ্যা-আরতির পর শীতলভোগ দিয়ে মন্দির বন্ধ করে বাড়িতে আসে। অন্য দিন তবু নাটমন্দিরে কিছু লোকজন আসে। নানা আলোচনা হয়ও। এসব চুকিয়ে সে মন্দির বন্ধ করে, আজ বৃষ্টি আর শীতের কনকনে হাওয়ার জন্য মন্দিরে লোকও বেশি আসেনি। সতীশ মন্দির বন্ধ করে বাড়ি আসে। দিনের সংগৃহীত প্রণামির টাকা-পয়সা গুনে বাক্সে পুরে এবার হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে। এখন সতীশের ছেলেরাও কোনও ধান্দা করছে। এক ছেলে সদরে পুলিশের চাকরি করছে। আর একজন শহরে থাকে ব্যবসাপত্র করে। সতীশ হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসে। স্ত্রীকে বলে,

—পিয়ালী ফেরেনি? বলল কিশোরবাবুদের বাড়ি যাচ্ছি জরুরি মিটিং আছে। কালই প্রধানের চার্জ নিতে হবে।

সতীশের স্ত্রী বলে,

—কাল মেয়ে প্রধান হচ্ছে। ওর নামে বাবার পুজো দিতে হবে।

সতীশ বলে,

—তা আর বলতে হবে না। ওসব আয়োজন করেই রেখেছি। পিন্টুও সকালে শহর থেকে ফিরবে কাল ছুটি নিয়ে। শুনলাম কাল বিজয় মিছিলও বের করবে কিশোরবাবুরা।

—নুটু গিন্নির কি কান্না গো! এতদিনের গদি হাতছাড়া হয়ে গেলো। এখানে বাবার আবির্ভাবের পর থেকে নুটু ওর গিন্নি আমাদের মোটেই দেখতে পারে না। কী হিংসে—

সতীশ বলে,

—হবে না? ভাতে হাত পড়েছে যে। এবার গদিও গেল। দেখবে কী হাল হয় নুটুর। ওর পাপের তো শেষ নেই।

ওদের খেয়াল হয় এত রাত হয়েছে তবু পিয়ালী ফেরেনি, সারা গ্রাম প্রায় নিশুতি। সতীশের স্ত্রী বলে,

—পিয়ালী কী করছে? এত রাত হল এখনও ফিরল না।

সতীশেরও মনে কী যেন ভাবনার উদয় হয়। সে বলে,

—আমি রাখালকে পাঠাচ্ছি ও একবার কিশোরবাবুদের ওখানে যাক। ডেকে আনুক পিয়ালীকে।

সতীশের বাড়ির কাজের ছেলেটা ও দিকে খেতে বসেছিল। সতীশ বলে,

—রাখাল! খেয়ে উঠে ছাতা নিয়ে তুই কিশোরদের বাড়ি যা। দিদিমণি ওখানে আছে। ডেকে আন্।

রাখাল বলে,

—যাচ্ছি গো ঠাকুরমশাই।

রাখাল খেয়ে উঠেই টর্চ আর ছাতা নিয়ে বের হয়ে গেল।

টিপটিপ করে সমানে বৃষ্টি পড়ছে, সতীশ চাটুজ্যের শোওয়া তখনও হয়নি। ওর স্ত্রী হেঁশেলের পাট চুকিয়ে পানদোক্তা মুখে দিয়ে তখনও মেয়ের পথ চেয়ে আছে। রাখালও ফেরেনি।

এর পরই বাইরে কাদের হাঁকডাক শুনে বের হয়ে আসে সতীশ। কিশোরের দলের দু-একজন লোক, পাড়ার মান্যগণ্যরাও রয়েছে। রাখাল পিয়ালীর সাইকেলটা নিয়ে আসছে। পিয়ালী নেই। রাখাল বলে,

—কিশোরবাবুদের বাড়ি থেকে সাঁঝবেলাতেই দিদি বের হয়েছে।

বাগানের দিকে খুঁজতে গেছিলাম। আমগাছের তলে দিদির সাইকেল আর ব্যাগটা পড়ে আছে। দিদিমণি নেই—

মদন বলে,

—ওর ডাকাডাকিতে আমরাও বেরিয়ে গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। পিয়ালী নেই, ওর ব্যাগ সাইকেল পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।

সতীশ চমকে ওঠে, সেকী!

—তাহলে পিয়ালী গেল কোথায়? কী হল তার? এখনও বাড়ি ফেরে নি। সতীশ চাটুজ্যে হতচকিত হয়ে গেছে,। এর মধ্যে খবরটা কিশোরদের ওখানেও পৌঁছে যেতে কিশোরবাবুও এসে পড়েন। কিছুদিন আগে অবধি ভোটের উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, তার পর কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল কিশোরদের আশা এবার তারা প্রশাসন দখল করবে। তারাও গরম হয়ে আছে। তাদের শুভ উৎসব কাল। কাল সারা এলাকা ঘুরবে পিয়ালীকে নিয়ে মহাসমারোহে।

এবার নটবরের দিন শেষ। আসবে তাদের দিন।

আর এই সময়ই পিয়ালীর এই অন্তর্ধান। তাদেরও উত্তেজিত করে তুলেছে।

মদন বলে,

—এ ব্যাটা নটবরের কাজ,

কিশোরও সেরকমটা ভাবছে, নরেশের গদি পেতে সেদিন নটবরই নরেশকে শেষ করেছে। ঠিক তেমনিভাবেই পিয়ালীকেও আজ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এতে নটবরের হাত থাকা স্বাভাবিক। কিশোর বলে,

—পুলিশে খবর দিই,

ন্যাপা-মদন-পরিতোষ অন্য সভ্যরা এখন ভোটের সেই গরম ভাবটাকে ভোলেনি। এর মধ্যে আরও লোকজন জুটে গেছে।

কিশোরের দল আশপাশের গ্রামেও এর মধ্যে পিয়ালীর এই ভাবে অন্তর্ধানের কথাটা জানিয়ে দিতে তারাও এসে পড়েছে। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে। জনতাও ক্ষুব্ধ। বাড়ির ভিতর থেকে পিয়ালীর মা ভানুমতীর কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে।

—একী সর্বনাশ হল রে। ওরে মা, তুই কোথায় গেলি রে।

মাধব কবরেজও এসে জুটেছে। নটবরদের উপরও তার রাগ ছিল। আজ মাধবও সেই রাগটাকে প্রকাশ করে, বলে,

—নটবর সব পারে, ব্যাটা একটা বেইমান। শয়তান। জনতা চিৎকার করে,

—ওর বাড়িতেই রেখেছে নিশ্চয় পিয়ালীকে। ওর বাড়ি ঘেরাও করতে হবে, ওকে ছাড়ব না।

কিশোর জনতাকে সামলাবার চেষ্টা করে। তাদের কমিটিও গড়া হয়নি। আইনত প্রশাসন এখনও নটবরদের হাতে। এ সময় কোনো গোলমাল করতে চায় না কিশোর।

সে থানায় খবর দিয়েছে। পুলিশও এসে পড়ে। এবার জনতা পুলিশকে ঘিরেই ক্ষোভ জানাতে থাকে।

—নটবর একটার পর একটা অন্যায় করে যাবে, আর পার পেয়ে যাবে। কী করেন আপনারা।

জনতা চিৎকার করে।

—এর বিহিত করতেই হবে। চলুন নটবরের বাড়িতে। ও ব্যাটাকেই ধরতে হবে। না হলে আজ রাতেই হয়তো গদির লোভে শেষ করে দেবে পিয়ালীকে।

পুলিশ অফিসারও বুঝেছে নটবরের ক্ষমতা আর নেই। তাই শেষবারের মতো তাদের দখল রাখতে মেয়েটাকে জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে সই করে তার দলে আনার চেষ্টা করবে। এ ব্যাপারে নটবরের ভূমিকা থাকতেও পারে। নটবরের বাড়িতেই যেতে হবে। এর মধ্যে বেশ কিছু লোক নটবরের বাড়িটা ঘিরে রেখেছে। হইচই করছে। নটবর একটু আগেই ফিরেছে তার ফার্মহাউস থেকে।

পিয়ালীকে গোপনে তুলে এনেছে। মনে হয় একটু চাপ দিলেই পিয়ালীও বাধ্য হবে তার দলের হয়ে প্রধান হতে। আর এ-খবরটা কেউ জানে না। তখনও গ্রাম শুনশান রয়েছে। নটবর ভাবছে ওরা পিয়ালীর খবর নেবার চেষ্টা করবে। কিন্তু হঠাৎ করে নটবরকে ওরা ঘাঁটাবে না। আর একটা দিন সময় পেলে সে ও সব দিক সামলে নিতে পারবে। এরকম কিছুটা আশা নিয়েই বাড়ি ফিরেছে সে। ওর স্ত্রী বাসন্তী বলে,

—গদি তো গেছে। এখনও কী করছিলে পঞ্চায়েতে?

নটবর বলে,

—গদি এবার পাকাপাকি দখল করার ব্যবস্থাই করেছি। বাসন্তী যেন গদির শোকে মুহ্যমান। সেও তাড়াতাড়ি বলে,

—তাই নাকি গো। তাহলে গদি পাব?

—তুমি না পেলেও গদি আমাদের হাতেই থাকবে। দেখা যাক তোমার বাবা রত্নেশ্বর কী করেন।

—দ্যাখো।

—ভবেশ নেই! উনি তো দুপাতা ইংরেজি পড়ে এখন বাবা-মা কেই ভুলে গেছেন। গেল কোথায়?

বাসন্তী বলে,

—ও তো দুপুরের পরই ওই বাগানবাড়িতে গেছে ওখানে কীসব লেখাপড়ার কাজ করতে।

নটবর হাত-মুখ ধুয়ে লুচি আর মুরগির মাংস খেতে বসেছিল। সবে মাত্র মাংসটায় কামড় দিয়েছে। এমন সময় গিন্নির ওই কথা শুনে বলে,

—অ্যাঁ, ভবাটা ওখানে গেছে। আমাকেও বলে যায়নি।

বাসন্তী এভাবে নটবরকে শক্ খেতে দেখে বলে,

— কেন? কী হলো? ও তো ওখানে প্রায়ই গিয়ে থাকে। পড়াশোনা করে।

নটবরের মাথায় রক্ত উঠে গেছে। ভবেশের সঙ্গে পিয়ালীর পরিচয় নিয়ে এর আগেও নটবর পিয়ালীকেও যা-তা বলেছে। ভবেশকেও সাবধান করেছে।

এখন ভবেশ যদি জানতে পারে পিয়ালীকে ওর বাবাই ওখানে আটকে রেখেছে নিশ্চয়ই ভবেশও প্রতিবাদ করবে। আজকালকার ছেলেদের বিশ্বাস নেই। ওরা করতে পারে না হেন কাজ নেই। আর পিয়ালীও সাংঘাতিক মেয়ে। সে যদি উল্টে নটবরকে ঘা দেয়। কী সর্বনাশ হবে কে জানে।

কিন্তু এখন তার করার কিছুই নেই। তবে একটা সান্ত্বনা তার নতুন বাড়িটা তার কটেজটা থেকে একটু দূরে। পুকুরের ওপারে। ওখানে যাবার পথও আলাদা। ভবেশ হয়তো এসব ব্যাপার জানতে পারবে না।

বাসন্তী দেখছে নটবরকে, সে বলে,

—কী হল? এমন ছটফট করছ কেন? ভবেশ তো আর ছোট খোকা নয়।

সেইটাই তো নটবরের ভয়। সেও জানে তার ভয় কোন জায়গায়। ঘি আর আগুনকে সে পাশাপাশি রেখে এসেছে কিন্তু এসব কথা নটবরও জানাতে পারে না বাসন্তীকে। কোনওমতে খেয়ে উঠে পড়ে।

রাত নামে। ফার্মে স্তব্ধতা নেমেছে, নটবর তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে অনেকক্ষণ আগেই চলে গেছে। কেয়ার টেকার ফার্মের গেটে তালা বন্ধ করে বাইরের আলো নিভিয়ে ওদিকে তার ঘরে চলে যায়। পিয়ালীর ঘরের আলোটা জ্বলছে। টেবিলে খাবার পড়ে রয়েছে। পিয়ালী শুধু জলই খেয়েছে। সে নটবরের কথা ভাবছে। নটবর তাকে বন্দি করে এনে জোর করে তাদের কাজে লাগাতে চায়।

পিয়ালী জানে আজকাল নটবরের মতো লোক তার সর্বনাশ করবে। এই লোকটাই নরেশবাবুকে খুন করেছে। তার জন্য খুন জখম অপহরণ কোনও কিছু করতে তার বাধে না। হঠাৎ কাচের জানলায় একটা টোকার শব্দ ওঠে —ঠক্ ঠক্ ঠক্।

চমকে ওঠে পিয়ালী। দামি কাচের জানলা। কাচগুলোর মধ্য দিয়ে সব জিনিসই ওই বিকৃতভাবে দেখা যায়। একটা মানুষের মুখ বিকৃত আকারে ওই কাচে ফুটে উঠেছে। স্তব্ধ চারিদিক। এই রাতের অন্ধকারে এবার নটবর তার লোককে পাঠিয়েছে। যে তার চরম সর্বনাশ করার চেষ্টা করবে। পিয়ালী নটবরের কাজের প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল তাই তাকে এবার চরম শাস্তিই দেবে।

কী করবে ভাবছে। জানালায় টোকাটা জোরে জোরে পড়ছে। এবার জানলাটা একটু ফাঁক করে পিয়ালী। জানলার একফালি আলোয় দেখে বাইরে ভবেশকে। সেই তাকে ডাকছিল এতক্ষণ ধরে। পিয়ালী ভবেশকে দেখে এবার ভরসা পায়। যেন ডুবন্ত মানুষ একটা কাঠের তক্তাই পেয়েছে হাতের কাছে। যা ধরে সে বাঁচতে পারবে।

দরজা খুলে বাইরে বারান্দায় আসে পিয়ালী। কিন্তু বারান্দায় শক্ত গ্রিলের বেষ্টনী। গেটে তালাও ঝুলছে। পিয়ালী বলে,

—ভবেশ! তোমার বাবা আমাকে জোর করে তুলে এনে আটকে রেখেছে। আমি যদি ও দলের বিরুধে যাই ও আমার চরম সর্বনাশ করে আমাকে শেষ করবে। এ আমি

পারব না—আমার আদর্শ—আমার—স্বাধীন মতের জন্য মরতে হয় তাই মরব। তবু ওই লোভী স্বার্থপর লোকটার দলে যেতে পারব না।

ভবেশ বলে,

—আমি সব কথা শুনেছি পিয়ালী। আমিও বাবার নীচতাকে সমর্থন করি না। এর প্রতিবাদই করব। তাই তোমাকে বাঁচাবই। যাতে তুমিও এই নীচ কাজের যোগ্য জবাব দিতে পারো।

পিয়ালী বলে,

—কী করবে তুমি?

ভবেশ এতক্ষণ ধরে সেই কথাগুলোই ভেবেছে। আর মনস্থির করে ফেলেছে। পিয়ালী বলে জানলার এপাশের গ্রিলের এদিক থেকে,

—এখন কী হবে? তোমার বাবা যদি শেষ করে দেয় দিক—এ কাজ তার কাছে নতুন কোনও কাজ নয়। তবু আমি ওর কথামতো চলতে পারব না।

—তুমি ভেবো না পিয়ালী। বাবা তোমার কোনও ক্ষতিই করতে পারবে না। আমাকে বিশ্বাস করতে পারো। আমি তোমায় ওর হাত থেকে বাঁচাবই। পিয়ালী যেন কী আশ্বাস পায়। ভবেশকে সে বিশ্বাস করে। পিয়ালীর কাঙাল মন ভবেশকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিল। কঠিন বাস্তবের ঊষরতায় সেগুলো হারিয়ে গেছে।

—পারবে ? পারবে তুমি ভবেশ আমাকে এই শয়তানের জাল থেকে মুক্তি দিতে। আমি হারিয়ে যেতে চাই না ভবেশ, আমিও কিছু করতে চাই। আমিও বাঁচতে চাই। সামান্য নিয়ে খুশি হয়ে বাঁচতে চাই। পারবে ভবেশ, পারবে আমাকে বাঁচাতে?

ভবেশ বলে,

—আমি দেখছি পিয়ালী। একটা কিছু তো করতেই হবে। তুমি তৈরি থাকো আমি আসছি।

এই বাগানবাড়ির কাজকর্ম দেখাশোনা করে মতিলাল। নটবরের জমিজমা অনেক। ফার্মের বাইরে মাঠেও অনেক ধানজমি আছে। এই চাষবাস সেই দেখাশোনা করে। এখানে গোরু বলদ ট্রাক্টর পাম্পসেট সবই আছে। তা ছাড়া নটবরের ভোটের ব্যাপারেও তাকে কাজ করতে হয়। ওদিকে একটা ঘরে সে থাকে। ওদিকে কাজের লোকেদের ঘর। তা ছাড়া গোয়ালও রয়েছে।

এবারে ভোটে নটবর নাকাল হবার পর পিয়ালীকে তুলে এনেছে। কাজটা বেআইনি। এ সময় ওই মেয়ে চুরির কেসে জড়িয়ে গেলে নটবর নিজেকে বাঁচাবার জন্য সাফ জবাব দেবে ফার্মে কী হয়েছে রাতে সে জানে না। তাই ফেঁসে যাবে মতিলাল। সেই এ বাড়ির দায়িত্বে রয়েছে। আর নটবরের মতো লোক বিপদে পড়লে এই কথা বলে সব দায় তার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে তা জানে মতিলাল।

মতিলাল তাই ভাবনায় পড়েছে পিয়ালীকে নিয়ে। সে জানে পিয়ালী এখন প্রধান হতে চলেছে। তাকে অপহরণ করা মানে সেটা গড়াবে অনেকদূর পর্যন্ত। কারণ নন্দবাবু কিশোরবাবুরাও এবার গদি পেতে চলেছে। তাই তাদের শক্তি-সামর্থ্যও বাড়বে। ফাঁক থেকে মতিলালই ফেঁসে যাবে অপহরণের দায়ে। তার দুশ্চিন্তায় ঘুম আসে না। রাত

বাড়ছে। হঠাৎ মোটরবাইকের শব্দ শুনে মতিলাল উঠে আসে। দেখে ভবেশকে। ভবেশ বলে,

—মতিলাল! বাবা ফোন করেছিল। এখুনিই পিয়ালীকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। আমি ওকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। তুমি এসে ওর ঘরের তালা খুলে দাও। লোকজন জেনে ফেলেছে ও এখানে আছে। ওরা এসে পড়লে হাতেনাতে ধরা পড়ে যেতে হবে।

ভবেশ নিজেই এরকম একটা ফন্দি বের করেছে। এভাবেই ওই মতিলালের সামনে থেকে সে পিয়ালীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। মতিলালও খবরটা শুনে অবাক হয়। গ্রামের লোক যদি খবর পেয়ে কিছু গোলমাল করে মতিলালই অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। মেয়েটাকে সরিয়ে দিতে পারলে তারও কোনও দায় থাকবে না। সে বিপদ এড়াতে পারবে এভাবে, তা সে ভাবেনি। ভবেশ এসে ওর সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। সেও খুশি হয়ে ঘরের ভিতর দৌড় দেয় চাবি আনবার জন্য।

গ্রামের মানুষ তখন ঘেরাও করেছে নটবরের বাড়ি। বিনয়বাবু, রমলা ও অন্য মেয়েরা পিয়ালীর অপহরণের খবর পেয়ে এসে পড়েছে। নটবর ভাবেনি এইভাবে ওই গ্রামের মানুষ চড়াও হবে তার বাড়ি। পচাটাও নেই এখন। নটবরের বাড়ির দুচার জন কাজের লোক গেট আগলেছে। সতীশ চাটুজ্যে পাগলের মতো চিৎকার করছে।

—পিয়ালীকে ছেড়ে দাও।

বিনয়বাবুও এবার ভাবনায় পড়েছেন। কারণ, নরেশবাবুকেও এইভাবে কারা সরিয়ে দিয়েছিল। এবার যেন পিয়ালীর পালা।

পুলিশও এসে গেছে। কিশোর বলে,

—এখানেই আটকে রেখেছে পিয়ালীকে, কাল যাতে মিটিং-এ যেতে না পারে তার জন্য।

নটবরও বীরদর্পে বলে,

—এখানে নেই। বিনয়বাবু, কিশোর তোমরা দুজনে পুলিশ নিয়ে এসে আমার বাড়ি তল্লাশি করে যাও।

জনতাও চিৎকার করে।

—তাই যান বিনয়বাবু।

নটবরও জানে এখানে কিছু পাবে না তারা। তাই সেও বলে,

—আসুন,

ওরা ভিতরে যায় পুলিশ নিয়ে। সারা বাড়িতে তল্লাশিও করছে। বাইরের জনতার ভিড়ও বাড়ছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বিনয়বাবু, পুলিশ, সতীশরা হতাশ হয়ে বের হতে কে বলে ওঠে,

—ও ব্যাটা এখানে রাখেনি ওর ওই খামার বাড়িতেই রেখেছে। যত কুকর্ম ওখানেই হয়।

জনতা চিৎকার করে,

—চলো সেখানে। যদি পিয়ালীকে সেখানে পাই ব্যাটার খামারবাড়িতে আগুন লাগিয়ে ছাই করে দোব। চলো,

ওই রাতেই জনতার ঢল ছুটল মাঠের ওদিকে খামারবাড়ির উদ্দেশে, বিনয়বাবু বলেন পুলিশ অফিসারকে,

—ওখানে চলুন। যদি সত্যি সত্যি কোনও গোলমাল বেধে যায়।

সতীশ চাটুজ্যে বলে,

—ওখানেই আটকে রেখেছে মেয়েটাকে। কী জানি কী হাল করেছে মেয়েটার।

জনতা ছুটেছে ওই বাড়িটার দিকে, এবার নটবর সত্যিই বিপদে পড়েছে। তার বাড়িতে যে জোর নিয়ে সে পুলিশ বিনয়বাবুদের ঢুকতে দিয়েছিল সেই জোর তার শেষ হয়ে গিয়েছে। মেয়েটাকে ওরা সত্যিই পেয়ে যাবে খামারবাড়িতে। আর তার পর কীভাবে কী হবে ভাবতে পারে না। ওখানে তার বেশ কিছু খড়ের পালুই আছে, গোলাতে কয়েক হাজার মন ধানও রয়েছে।

বাসন্তীও দেখেছে জনতার আক্রোশ। ওর বাড়ির চারিদিক তন্নতন্ন করে খুঁজেছে পুলিশ। সে এমনিতেই চটেছিল। এবার রাত দুপুরে ওই হানাদারির অত্যাচার দেখে সতীশকে বলে,

—মেয়ে কোনো হতচ্ছাড়া বাঁদরের সঙ্গে ভেগেছে কি না তাই দ্যাখোগে। তা নয় এসেছে আমার বাড়ি ঘরপালানো মেয়ের খোঁজ করতে।

সতীশ কিছু বলতে পারে না। তবে জানে তার মেয়ে এমন কাজ কোনওদিন করবে না। কিন্তু এবার তারও মনে হয় পিয়ালী কি সত্যিই সেসব কিছু করেছে। তার উত্তর জানা নেই।

বাসন্তী তখনও গজগজ করছে।

—এমন মেয়ের মুখে নুড়ো জ্বেলে দিই। দ্যাখো গে কোথায় ভেগেছে কাউকে নিয়ে।

নটবর ছটফট করছে। তার ফার্মে পিয়ালীকে পেয়ে যাবে। তখন আর ওই লাখ টাকার ফার্ম হাউস, ধান-খড় সব কিছু উন্মত্ত জনতা পুড়িয়ে দেবে। তাই সেও ছোটে —ন'কড়ি এসেছে।

সেও বলে,

—এখন কী হবে নুটুদা,

নটবর গিন্নিকে কিছু বলতে পারে না। শুধু ন'কড়িকে ডেকে বলে,

—চলো ফার্মে। যদি ওটাকে বাঁচানো যায়। ব্যাটা পচাটাই বা কোথায় গেল। ওর দলবল থাকলে তবু ঠেকানো যেত। এখন ধরা তো পড়বই। কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আর কাজকর্ম কী হবে কে জানে। শেষে প্রাণে মারা না পড়ি।

ওরাও ছোটে খামার বাড়ির উদ্দেশে। মাঠের উপর অন্ধকার রাতেও লোকজন ছুটে চলেছে ওই দিকে।

কামিনী শুনেছে কথাটা, আজ সন্ধ্যার পর থেকে পিয়ালীকে পাওয়া যাচ্ছে না। কামিনীও এখন পিয়ালীর ভক্ত হয়ে পড়েছে। পিয়ালীদি-কে কারা তুলে নিয়ে গেছে শুনে সেও চমকে ওঠে। রাত তখন অনেক। আজ সন্ধের সময় তখন বাইরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে সে সময় পচা ওদের বারান্দায় বসে দুতিনজন সাগরেদকে নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। কামিনী

মুড়ি-চা দিতে যেতেই ওরা চুপচাপ হয়ে যায়। কামিনী ব্যাপারটা দেখেও গুরুত্ব দেয়নি।

অনেক রাত হয়েছে। পচা তখনও বাড়িতে ফেরেনি।

বাইরে তখন বৃষ্টি পড়ছে, হঠাৎ পচাকে বৃষ্টিতে ভিজে ঢুকতে দেখে ঘরে, চোখে মুখে একটা উত্তেজনা।

কামিনীর চোখ এড়ায় না। ওর মনে পড়ে আগের দিনগুলোর কথা। কামিনী বলে,

—কোথায় গেছলে?

পচা জবাব দেয় না। জামা-কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরে এসে বলে,

—এমনিই।

কামিনী খেতে দেয়। আর তার সন্ধানী চাহনিতে ওকে দেখতে থাকে কামিনী। পচা চুপচাপ খেয়েদেয়ে শুতে চলে যায়। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। তারপরই কামিনী গ্রামের হইচইয়ের শব্দ শুনে উঠে পড়ে। দেখে, পচা বিছানায় নেই। বাইরে উঠানে এসে বেড়ার ওদিকে লোকজনের চিৎকার করতে দেখেছে। কামিনীও বের হয়ে আসে। আর তখনই শোনে পিয়ালীকে কারা তুলে নিয়ে গেছে বাগান থেকে। কামিনী দেখছে পচাকে। পচা ওই চাহনির সামনে কেমন বিব্রত বোধ করে। কামিনী বলে,

—কারা তুলে নে গেল পিয়ালীদিকে? ওর মতো মেয়ের সঙ্গে এ ব্যাভার কে করল?

পচা বলে,

—তা আমি কী করে জানব?

কামিনী তীব্র কণ্ঠে বলে ওঠে,

—তবে আজ রাতে গোবর হয়ে ফিরেছিলি। ঠিক করে বল কোথায় গেছলি? বল—সেবার নরেশবাবুর খুনের রাতেও এমনি করে ঘরে ঢুকেছিলি। এবার কি পিয়ালীদির সব্বনাশ করেছিস?

পচা ধমকে ওঠে,

—একদম যা-তা বলবি না।

কামিনীও একটা ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যাবার সময় বলে যায় পচাকে,

—সব বেত্তান্ত শুনে আসি। তার পর তোকে দেখব। সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও তুই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না।

বের হয়ে যায় কামিনী। তারও মনে হয়, এসব ওই নটবরবাবুরই কীর্তি আর এসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে পচাও। তাই যদি থাকে এবার কামিনীই ওর সব কথা পুলিশকে জানাবে। কামিনী চায় ওই নটবরের মতো শয়তানদের দিন শেষ হোক। সেই কাজে কামিনীও হাত মেলাবে। সেও আর পাঁচজনের মতো শান্তি স্বস্তি পেতে চায়।

কামিনীও জনতার ভিড়ে মিশে চলে এসেছে ওই খামারবাড়িতে। বেশ কয়েকটা মশাল জ্বেলে এনেছে গ্রামের লোক। কাঠের লাঠির মাথায় ন্যাকড়া বেঁধে কেরোসিন দিয়ে ভিজিয়ে মশাল বানানো সহজ কাজ। ওদিকে নটবর ন'কড়ি-অন্যান্যরাও প্রায় ছুটতে ছুটতে এসেছে। উত্তেজিত জনতা বন্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। কেউবা ধাক্কা মারছে। ফার্ম হাউসের চারপাশে বেশ উঁচু পাঁচিল। কেউবা পাঁচিল টপকাবার চেষ্টা করছে। আর জনতার গর্জন ওঠে।

—গেট ভেঙে ফ্যালো, বের করে আনো পিয়ালীদি-কে, তারপর দেখব নটবর ভটচাযকে। ভাঙো গেট,

পুলিশও এসে পড়েছে। বিনয়বাবু কিশোরবাবু, গ্রামের বেশ কিছু মান্যি লোক কোনওমতে জনতাকে থামিয়ে রেখেছেন। ওদিকে নটবর, ন'কড়িরাও এসে পড়ে। নটবরের মুখ বিবর্ণ, এইবার তার সব অপরাধ হাতেনাতে ধরে ফেলবে এরা।

এখন দারোগাবাবুও জনতার চাপে বদলে গেছে। নটবরের গদি-র সাথে সাথে তার ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। এখন দারোগাবাবুও আর আগেকার মতো সমীহ করে না। তার চোখে নটবরের পরাক্রম যে নেই সেটাও পরিস্ফুট। দারোগাবাবু বলে,

—আমরা আপনার ফার্ম হাউসে তল্লাশি করব।

নটবর কঠিন কণ্ঠে বলে,

—সার্চ ওয়ারেন্ট এনেছেন?

বিনয়বাবু বলেন,

—আপনার বাড়িতে ঢোকার আগে তো একথা বলেননি? তবে এখন একথা বলেছেন কেন? আমরা পিয়ালীর সন্ধান করেই চলে যাব।

—সে এখানে কেন আসবে? সে নেই এখানে।

নটবরের কথায় দারোগাবাবু বলেন,

—না থাকলে আপনার বাড়ি থেকে যেমন বের হয়ে এসেছি, এখান থেকেও তেমন বের হয়ে যাব। আর জরুরি সময়ে সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়াও তল্লাশি করার আইন আছে।

জনতা চিৎকার করে,

—গেট খুলে দিতে বলুন, নইলে আমরা গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে সব কিছু তছনছ করব।

গেটে দুমদাম ধাক্কা পড়ছে। ওদিকে ফার্মের কেয়ার টেকার মতিলালও গেটের কাঁক থেকে বাইরে উত্তেজিত জনতাকে দেখছে।

ন'কড়ি বলে,

—নুটুদা গেট খুলতে বলো।

নুটু নিজের কথা ভেবে শিউরে ওঠে, এবার জনতা তাকে না শেষ করে না দেয়। পালাবার পথও নেই। সকলে তাদের ঘিরে ফেলেছে। ওদিকে জনতার চাপে জীর্ণ গেটটা কয়েকটা আঘাতের পর ভেঙে পড়ে আর জনস্রোতও হুড়মুড় করে ভিতরে ঢোকে। মতিলালও সরে যায়। কারা আলোগুলো জ্বেলে দিয়েছে। লোকজন হই হই করছে ভিতরে। নটবরও কাঁপতে কাঁপতে ভিতরে ঢোকে। তার শখের সাজানো বাগান, শৌখিন ফুলের গাছ জনতার পায়ের চাপে পিষে যায়।

পুলিশ অফিসার বিনয়বাবুরা সারা বাড়ি খুঁজছে। নটবর বাইরে একটা চেয়ারে বসে পড়েছে। এখুনি পিয়ালীকে বার করে আনবে তারা। আর পিয়ালী সকলের সামনে তার শর্তের কথা শোনালে তারপর নটবরের চামড়া আস্ত থাকবে না আর। হাঁপাচ্ছে নটবর।

ওদিকে পুলিশ অফিসার জনতা এর মধ্যে বাড়ির সর্বত্র খুঁজেও পায় না পিয়ালীকে। তার কোনো চিহ্নই নেই। হতাশ হয় তারা। পুলিশ অফিসার বলেন,

—পিয়ালীকে তো এখানেও দেখছি না।

বিনয়বাবুও বলেন,

—অকারণে নটবরের ফার্মে হানা দেওয়া হল। এখানে তো কেউ নেই। তা হলে পিয়ালী গেল কোথায়?

নটবর এবার ধড়মড় করে উঠে বসে। সেও যেন বেঁচে গেছে। যেখানে যায় যাক মেয়েটা। তবে এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে তাকে মুক্ত করে গেছে। নটবর এবার বলে কঠিন স্বরে,

—আমার এত ক্ষতি করলেন দারোগাবাবু। এত গাছ ফসল নষ্ট করে দিলেন, আমিও ছাড়ব না। মিথ্যা সন্দেহ করে আমার মানহানি, অর্থহানি করেছেন। আমিও আদালতে যাব। এর বিচার চাইব।

জনতাও এবার এখানে কিছু না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেছে। তাদের সেই উৎসাহ বীরত্ব আর নেই। এখন নটবরের ওই সব কোর্ট-কাছারির কথা শুনে তারাও সরে পড়েছে। থানা অফিসার বলে,

—তা হলে মেয়েটা গেল কোথায়?

নটবর বলে,

—কোন বাঁদরের বাচ্চার সঙ্গে পিরিত করে কেটে পড়েছে কি না তাই দেখুন গে। উঃ কত ক্ষতি হয়ে গেল, আমিও ছেড়ে দোব না।

জনতা, পুলিশ, বিনয়বাবুরা এবার চিন্তায় পড়েছে। কিশোরও ছিল এই অভিযানে। সে ভেবেছিল পিয়ালীকে এখানেই পাওয়া যাবে। আর হাতেনাতে ধরতে পারলে নটবরকে এখনই অ্যারেস্ট করা যেত। ওর দলের মাথা নিচু হয়ে যেত। কিন্তু সেই সুযোগ মিলল না। এবার তারাও ভাবনায় পড়েছে। তাহলে পিয়ালী গেল কোথায়?

কিশোরদের গদি দখল করা কালও হবে না।

জনতার ভিড় চলে যাবার পর নটবর, ন'কড়ি এবার ভাবনায় পড়ে। আপাতত পিঠ বাঁচাতে পেরেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি মেয়েটাকে না পেলে তাদের গদিও থাকবে না। এবার ন'কড়ি বলে,

—জোর বেঁচে গেছ নুটুদা। মেয়েটা নির্ঘাত কোনওরকমে পালিয়েছে। যা গেছো মেয়ে।

নটবর বলে,

—পিঠ তো বাঁচলো হে, কিন্তু গদি? গদি তো বাঁচবে না। ও যদি বের হয়ে কিশোরদের ওখানে ফিরে যায়। তাহলেই সব্বনাশ। কোথায় পালাল হে!

মতিলালও এতক্ষণ বাড়ির মধ্যে পড়েছিল। এবার সেও এগিয়ে এসেছে, নটবর বলে,

—কী কর হে? জলজ্যান্ত মেয়েটা পালালো চোখে ধুলো দিয়ে আর তুমি ঘুমোচ্ছিলে? দোব পিছনে লাথি মেরে দূর করে।

মতিলাল বলে,

—এসব কী বলছেন বড়বাবু। পিয়ালী তো পালায়নি।

নটবর ফুঁসে ওঠে,

—পালায়নি। কী বলছ তুমি? অ্যাঁ ইয়ারকি হচ্ছে।

—আজ্ঞে আপনি চলে যাবার একটু পরই ছোটবাবু এসে আমাকে বললেন যে আপনি নাকি ফোন করে ছোটবাবুকে বলেছেন, পিয়ালীকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে, লোকজন হামলা করবে বলে—

নটবর অবাক হয়,

—সেকী! আমি তাকে এসব বলেছি?

—আজ্ঞে, ভবেশবাবু তো তাই বললেন, তাঁর কথামতোই ওই ঘরের চাবিও তাঁকে দিলাম। ছোটবাবু পিয়ালীকে তার মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে নে চলে গেল। আমিও দরজা গেট সব বন্ধ করে দিলাম।

ন'কড়ি বলে,

—ভবেশ বেশ বুদ্ধিমান হে। ও বিপদের গন্ধ পেয়ে আগেই মেয়েকে নিয়ে গেছে বাড়িতে। পুলিশ ওদিকে দেখে আসার পরই ওর বাড়িতে পৌঁছে গেছে। কী বুদ্ধি হে ভবেশের!

নটবর দুহাত জোড় করে,

—জয় বাবা রত্নেশ্বর। সবই তোমার মহিমা। না হে ন'কড়ি ভবেশকে যত ঠাণ্ডা প্রকৃতির ভাবতাম তা নয় আর বাপ কা বেটা। তাহলে পিয়ালী এখন ও বাড়িতেই। ব্যস! চলো, কালই গদির ব্যবস্থাও হয়ে যাবে।

ওরা দুজনে ওই রাতের অন্ধকারে গ্রামের বাড়িতে ফেরে। তখন গ্রামের লোক হতাশ হয়ে যে যার ঘরে ঢুকেছে। রাত প্রায় শেষ,

নটবর, ন'কড়ি বাড়ি ফিরেই, বাসন্তীকে শুধোয়,

—মেয়েটা কোথায়? ঠিক বাগে রেখেছ তো?

বাসন্তী যেন আকাশ থেকে পড়ে।

—মেয়েটা? কোন মেয়েটা?

—কেন? পিয়ালী? ওকে তো ভবেশ গোলমালের ভয়ে এখানেই নিয়ে এসেছে ওর মোটরবাইকে।

—কই না তো। ওরা কেউই আসেনি এখানে।

এবার নটবর চমকে ওঠে, তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

—ভবেশও ফেরেনি এখানে পিয়ালীকে নিয়ে?

—তাহলে দুজনে গেল কোথায়? ওগো এ যে সব্বনাশ হয়ে গেল গো। তুমি গেছলে মেয়েটাকে চুরি করে তুলে এনে তোমার দলে ভেড়াতে। গদি পাবে। এখন মেয়েটাই আমার ছেলেকে ফুঁসলে নিয়ে চলে গেল। ওরে আমার কি সব্বনাশ করল গো, আমও গেল। আঁটিও গেল।

নটবর ঘাবড়ে গেছে। মেয়েটা যে ভবেশকে নিয়ে কেটে পড়বে তা ভাবেনি। নটবর ফুঁসে ওঠে।

—কী ডেঞ্জারাস মেয়ে রে বাবা। এ যে আমাকেও ঘোল খাইয়ে দিল। গদিও গেল, একমাত্র ছেলেও।

পিয়ালী যে উলটে এমনভাবে নটবরের ঘরেই সিঁধ দেবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি নটবর। বাসন্তী তখনও কাতরাচ্ছে,

—একী সব্বনাশ করল। এমন কালসাপ তুলে এনেছিলে,

—এ যে বুকে শেল দিয়ে গেল। ওরে বাবা ভবেশ।

নটবর বলে,

—আঃ এখান থেকে চিৎকার কোরো না। দারোগা, বিনয়বাবু কিশোরের দল যদি জানতে পারে ভবাকেও বমাল ধরে একেবারে জেলে দেবে। সেই সঙ্গে আমাকেও ফাঁসাবে। অপহরণের দায়ে আগে ধরা পড়তাম আমি, আর এখন মেয়ে চুরির দায়ে ধরা পড়বে তোমার ছেলে,

ন'কড়ি বলে,

—ওদের তো আগে থেকেই ভাব-ভালোবাসা আছে শুনেছি।

—ওইখানেই তো ভয়। মেয়েটা যদি ভবেশকে বিয়ে করতে বলে —আর ওই হারামজাদাও যদি বিয়ে করে বসে তখন কী হবে?

বাসন্তী এবার আরও ভেঙে পড়ে,

—ওই মুখপুড়িকে ঘরের বউ করে আনতে হবে? তার চেয়ে আমায় বিষ এনে দাও। এসব দেখার আগে নিজেকে শেষ করে দিই। বাঁচতে আর ইচ্ছা নেই গো!

নটবর বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তার ছেলের জন্য শহরের নামী-দামি ঘর থেকে সম্পর্ক আসছে, তার দু'তিনটে প্রায় রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব নিয়ে আসবে।

বড় ব্যবসায়ীর মেয়ে—লাখ দশেক নগদ পাবে। শহরে বাড়ি-গাড়িও। সেই ভবেশকে ফুসলে দখল নেবে ওই পিয়ালী,

একটা ভণ্ড পূজারীর মেয়ে। নটবর যে কী কুক্ষণে পিয়ালীকে তুলে নিয়ে যাবার প্ল্যান করেছিল জানে না।

নটবর বলে,

ন'কড়ি কালই শহরে গিয়ে ভবাকে নিয়ে আসবে, ওই ব্যাটা বোধ হয় মেয়েটাকে নিয়ে শহরেই গেছে।

—একা আমি গিয়ে লাভ হবে না। তার চেয়ে আপনিও চলুন। সেখানে ভেবেচিন্তে যা করার করবেন। তবে দেখতে হবে পিয়ালী সদরে যেন পুলিশের কাছে না যায়। তা হলে বিপদে পড়বেন।

নটবরের বিপদ এখন কাটেনি। মেয়েটাকে না পাওয়া অবধি সে একদম স্বস্তি পাচ্ছে না। সত্যিই একটা ভাবনায় পড়া গেছে।

ভবেশ সে-রাতে গ্রামে ফেরেনি। দেখছে গ্রামে হইচই হচ্ছে। মশালের আলো জ্বেলে কারা বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি করছে। জনতার চিৎকারও শুনেছে। ভবেশ ওর বাবাকে চেনে, তাই পিয়ালীকে বলে,

—বাবাই হয়তো গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করেছে, এখন গ্রামে ফিরে কাজ নেই।

—তা হলে কোথায় যাবে?

—শহরেই চলো। তারপর কাল সকালে ভাবনাচিন্তা করে যা হয় করা যাবে।

সে রাতেই ভবেশ পিয়ালীকে নিয়ে চলে আসে তাদের শহরের বাড়িতে। বাড়িটাতে

তাদের কাজের লোক দরজা খুলে দেয়। সে ওদের দেখে অবাক হয়।

—এত রাতে ফিরলে?

ভবেশ বলে,

—কিছু খাবার থাকে তো দে। খুব খিদে পেয়েছে।

লোকটা বলে,

—পাউরুটি আর ডিম আছে, আর কিছু নেই। আমি বরং ওমলেট করে দিচ্ছি—

পিয়ালীরও খিদে পেয়েছে। এতক্ষণ দৌড়ঝাঁপের মধ্যে খাবার কথা ভুলে গেছে, এবার তারও খাবার কথা মনে পড়ে।

তখন রাত অনেক। ভবেশ বাইরের ঘরের সোফায় আর পিয়ালী ভিতরের বেডরুমে শুয়ে পড়ে। ঘুম নামে ওদের চোখে। ওরা জানে না রাতভর গ্রামে কী কাণ্ড চলছে।

ভবেশও মনস্থির করে ফেলেছে, পিয়ালীর জন্য তার সামনে একটা স্বপ্ন ছিল। পিয়ালীও শত বাধার মধ্যে ভবেশের জন্য ভাবত। দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় সান্নিধ্য গড়ে উঠেছিল ওদের অজান্তে। সকালে ভবেশই বলে,

—গ্রামের সবাই পরে জানবে যে তুমি আমার সঙ্গে চলে এসেছ। তোমার একটা সামাজিক পরিচয় আছে। সম্মান আছে। তাই একটা কিছু করা দরকার। আমি সর্বদা তোমার পাশে থাকতে চাই।

—কিন্তু তোমার বাবা-মা!

—তাঁদের সাহায্য আর আমার চাই না। আমি নিজে এখন কলেজে একটা কাজও করছি। থিসিসটা হয়ে গেলে ভালো কাজই পাব। তাতে আমাদের দিন চলে যাবে। আমার বাবা যে অন্যায় করেছেন তাকে সমর্থন করতে পারি না, তোমার উপরেও তিনি অন্যায় করেছেন,

পিয়ালী ওর কথা শুনছে, ভবেশ বলে,

—তোমার সেই সম্মান বজায় রাখার জন্য আমিই তোমাকে স্ত্রীর অধিকার দিতে চাই।

পিয়ালী ভবেশের দিকে চেয়ে থাকে। গ্রামসমাজে এর মধ্যে রটে গেছে পিয়ালীর অন্তর্ধানের কথা। এর পর লোকে যখন জানবে পিয়ালী ভবেশের সাথে রাত্রিবাস করেছে, তখন ওই গ্রামবাসী, বিশেষত মেয়েদের মধ্যে তার চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। পিয়ালীর পক্ষে এটা সম্মানজনক হবে না। প্রতিপক্ষ তাকে হেনস্তা করবে।

এবার কথাটা নতুন করে ভাবছে পিয়ালী। ভবেশ তাকে তার হারানো সম্মানই ফিরিয়ে দিতে চায়। পিয়ালী ভাবছে—

ভবেশ বলে,

—দুজনে একসঙ্গে কাজ করতে চাই পিয়ালী, সত্যিকারের ভালো কাজ।

পিয়ালী বলে,

—ভবেশ!

—তোমায় জোর করব না। তবে এতে মঙ্গল হবে আমাদের এবং আরও অনেকের, আর তার জন্য বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে আমি ভয় পাই না।

পিয়ালীও খুশি। আজ তার নারীমনের সেই স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে।

সকাল থেকেই গ্রামে পুলিশের আনাগোনা বেড়েছে। কিশোরও দলবল নিয়ে বের হয়েছে। সারা এলাকার মানুষও জেনে গেছে পিয়ালীকে পাওয়া যাচ্ছে না; কামিনী পচাকে বলে,

—সব তোর কাজ, বল কোথায় রেখেছিস দিদিকে, রেখেছিস না শেষ করেছিস? বল লাশ কোথায়?

পচাও অবাক, সে মেয়েটাকে ওই চাষবাড়িতে তুলেছিল কিন্তু তারপর নটবর তাকে না জানিয়ে অন্য কাউকে দিয়ে কী করেছে তা জানে না পচা, না হলে মেয়েটা উবে গেল কোথায়?

পচা বলে,

—কিছুই জানি না মাইরি বলছি,

—খবর পাবই। সেদিন তোকেও দেখাব মজা।

পচাও বুঝেছে যে নটবর এখন আর ষোলো আনা ওকে বিশ্বাস করে না। তার দলে এখন আরও কাজের লোক জুটেছে। তাই পচাকে সব খবর দেয় না। পচাও বুঝেছে ওই নটবরের সঙ্গে আর বেশি দিন থাকা যাবে না। তাকে বের হয়ে এসে নিজের মতো কাজ করতে হবে। তখন নটবরও তাকে ছাড়বে না, কারণ নটবরের অনেক কুকাজের খবর জানে পচা। তবু সেই সাংঘাতিক মুখোমুখি হবার জন্য পচাও তৈরি হয়।

নটবর ন'কড়িকে নিয়ে সকালেই বের হয়ে গেছে শহরের দিকে। হয়তো সেখানেই ভবেশ নিয়ে গেছে পিয়ালীকে। নটবর ওর খোঁজ পেলে পিয়ালীকেই তার দলে আনার চেষ্টা করবে। না হলে কী হবে তা জানে না।

ন'কড়ি বলে,

—এমন ঝামেলায় ফেলবে মেয়েটা ভাবিনি নুটুদা।

নটবর বলে,

—আমার ছেলেটার সাহসও কম নয়। আমি তুলে আনলাম। আর ভবা কিনা আমার সামনে থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেল।

নটবর ন'কড়ি যখন শহরে পৌঁছেছে তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। ওদের বাড়িটা শহরের অন্য দিকে। এসব অঞ্চলে নতুন বসতি হচ্ছে। নটবর বাড়িটা বেশ ভালোই করেছে। বাড়িতে কাজের লোকটা দরজা খুলে দেয়।

—বড়বাবু!

নটবর বলে,

—ভবা আছে?

তারপর নিজেই গলা তুলে হাঁক দেয়,

—ভবা! অ্যাই ভবা?

লোকটা বলে,

—আজ্ঞে কাল রাতে ছোটবাবু এসেছে, সঙ্গে একটা মেয়ে।

—কোথায় তারা? মেয়েটাকে ডাক!

নটবর এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। সে বলে,

—বুঝলি ন'কড়ি, ছেলে বাপের বিপদ বুঝে বেশ কায়দা করে মেয়েটাকে বের করে এনেছে। পিয়ালী মা—

ও পিয়ালী—

কাজের লোকটা বলে,

—তারা তো নেই।

—সে কী! গেল কোথায়?

—তা তো জানি না। ওরা চানটান করে দুজনে বের হয়ে গেছে বেলা নটা নাগাদ। কখন ফিরবে তাও কিছু বলে যায়নি।

ন'কড়ি বলে,

—ফিরে আসবে দাদা, যাবে কোথায়? কাল রাতভর ধকল গেছে। ততক্ষণ এখানে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নাও। ভবেশ যখন পিয়ালীকে এত দূরে এনেছে। তাকে এখানেই পাবে।

নটবরও বলে,

—তাই মনে হয়। তাহলে এবেলা স্নানাহার করে নিই।

ন'কড়ি কাজের লোকটাকে বলে,

—তুমি আমাদের জন্য রান্নাবান্না করো। এবেলা এখানেই থাকব।

ওরাও নিশ্চিন্ত। পিয়ালীও তা হলে নিরাপদ জিম্মাতেই আছে, তারাও স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে থাকে এখানে।

ভবেশ পিয়ালী স্নান করে এসেছে মন্দিরে। পাশেই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারও থাকেন। এই মন্দিরের দেবীমূর্তির সামনে বিয়ে হয় অনেকের আর সেটাকে আইনানুগ করার জন্য তো সরকারি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারও রয়েছেন। ভবেশ পিয়ালী ওখানেই মন্দিরে আজ বিয়ের পর্ব চুকিয়ে ফেলতে চায়।

আজ এতদিন পর তারা স্বামী-স্ত্রী, পিয়ালীও এই পবিত্র সম্পর্ক মেনে নেয়। আজ তারা জীবনের পথ চলার সঙ্গী পেয়েছে। ওকে পাশে নিয়েই এখান থেকে শুরু হবে তার নতুন জীবন। পিয়ালী বলে,

—সেই চলার শুরু হল এবার।

ভবেশ বলে,

—সব বাধাকে তুচ্ছ করে আমরা এগিয়ে যাব পিয়ালী।

কিশোরবাবুরা অবশ্য আজকের দিনে পূর্ব ঘোষণামতো নবনির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে মিটিং ডেকেছে। আইনত এই মিটিং করতে হবে। তার পর ভোটপর্ব স্থগিত রাখতে হবে সাময়িকভাবে। কারণ নির্বাচিত প্রধানকেই পাওয়া যাচ্ছে না। যাই হোক, কিশোরবাবুরা মিটিং ডাকে। কিশোরবাবুর আশা ছিল আজই তাদের বোর্ড গড়া সম্ভব হবে। কিন্তু কাল থেকে বিচিত্র সব ঘটনা চলেছে তাতে এরাও হতাশ হয়েছে।

তবু সভ্যরা এসেছে। দুই পাশের সভ্য সংখ্যা ছয়জন করে। নটবর অবশ্য এর মধ্যে কিশোরের দলের দুতিনজনকে ভাঙাবারও চেষ্টা করেছিল। কিশোরও ভেবেছিল নটবরের দলের দু-একজনকে হাতে পাবে। কিন্তু তারা যে টাকা চেয়েছিল তা অনেক। ওরা বলে,

—জাত দেব, পেট ভরবে না তা তো হতে পারে না। এদল টপকে তোমার দলে যাব। দুলাখ করে টাকা দিতে হবে। আর সহপ্রধান করে দিতে হবে।

কিশোর রাজি হয়নি। তার আশা পিয়ালী ঠিক ফিরবেই, আর সেই আশাতেই সভ্য

কেনাবেচা করেনি সে, অবশ্য আজ নটবর নেই। সে কোথায় গেছে। কিশোরের ধারণা নটবর মেয়েটাকে হাতে আনার জন্যেই তাকে সরিয়েছে আর চেয়েছে পিয়ালীকে রাজি করিয়ে এখানে নিয়ে আসতে।

তাই তারাও হাল ছাড়েনি। গদিটা খালিই পড়ে আছে। তার দাবিদার কেউ নেই।

সভার কাজ শুরু হয়েছে। তখনও দুপক্ষই চেয়ে আছে তাদের পরিত্রাতা বোধ হয় এসে পড়বে। নটবরের দলের সভ্যরা সেই আশায় আছে।

মোরাম বিছানো গ্রামের রাস্তায় গাড়িটাকে আসতে দেখে দুপক্ষই উদগ্রীব হয়ে ওঠে। কী ঘটবে কেউ জানে না। কিশোর আর নটবরের দলের কেষ্টও বেরিয়ে আসে। গাড়িটা এসে থেমেছে। দেখে নামছে পিয়ালী, পরনে নতুন শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর, সঙ্গে ভবেশ, পিয়ালী এসে কিশোরকে প্রণাম করে। কেষ্ট বলে ওঠে,

—পিয়ালী আমাদের হয়েই সই করবে।

পিয়ালী জবাব দেয় না। কিশোরকে বলে,

—চলুন কিশোরদা। আমি আপনাদের সাথেই রয়েছি। সভার কাজ শুরু করুন।

কিশোর ওর কথামতো সইসাবুদ করিয়ে নেয়।

খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে সারা গ্রামে। পিয়ালী ফিরেছে। আর এবার নটবরের দিনও শেষ হয়েছে। কিশোরের দল এর মধ্যে গ্রামে ঢাক-ঢোল-তাসা যা আছে এনে হাজির করেছে।

সতীশ চাটুজ্যে কাল রাত থেকেই মন্দিরে পড়ে আছে। মেয়ের কোনও খবরই পায়নি। কোথায় গেল মেয়েটা কে জানে? বাড়িতেও কান্নাকাটি চলছে। সতীশের ছেলেও খবর পেয়ে শহর থেকে বাড়িতে এসেছে। হঠাৎ কে এসে খবর দেয়।

—পিয়ালী এসেছে গো। প্রধানও হয়েছে আর যা কাণ্ডটা ঘটেছে সাংঘাতিক!

হাঁপাচ্ছে সে! সতীশ মন্দির থেকে বের হয়ে এসে বলে,

—কী ? কী হয়েছে, রে ?

ছেলেটা বলে,

—ওই নটবরের ব্যাটা ভবেশকে বিয়ে করেছে গো পিয়ালীদি। একেবারে নতুন বউ-এর মতো সেজেছে। ভবেশও সঙ্গে এসেছে।

—অ্যাঁ! সতীশ চমকে ওঠে।

তার পরই দৌড়োয় বাড়ির দিকে। এই খবরটা দিতে মেয়ে শুধু প্রধানই হয়নি, নটবরের একমাত্র ছেলে ভবেশের মতো সুপাত্রের সঙ্গে বিয়েটাও সেরে ফেলেছে। সতীশকে কানাকড়িও খরচ করতে হয়নি। মেয়ে একেবারে রাজরানি হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তার মেয়ে নটবরের মতো লোকের মুখে ঝামা ঘসে দিয়েছে।

এর মধ্যে প্রধানের গদিতে বসেছে পিয়ালী। বাইরে তখন সারা অঞ্চলের মানুষ উদগ্রীব হয়ে ভেঙে পড়েছে। আর কিশোরবাহিনী এর মধ্যে বিজয় মিছিল সেরে ফেলেছে।

রমলাদি, সমবায়ের মেয়েরাও এসেছে অফিসে। সতীশ চাটুজ্যেও এসে দেখে মেয়েকে তার নতুন রূপে। পিয়ালী উঠে এসে ওকে প্রণাম করে। সভার কাজ মুলতুবি হয়ে যায় প্রধান নির্বাচনের পর।

কিশোর বাহিনী এর মধ্যে বাদ্যি ভাণ্ড নিয়ে হাজির। সারা এলাকার মানুষ কাল থেকে বিচিত্র নাটকই দেখছে। এইবার সেই নাটকের যবনিকাপাত ঘটতে চলেছে। জনতা সেই

বাজনা বাজিয়ে চলেছে। গাড়িতে রয়েছে আবির মাখা পিয়ালী। পাশে ভবেশ, কিশোর। আবিরের ছড়াছড়ি চলছে। এবার বিপুল সমারোহে ওরা চলেছে জয়ধ্বনি করতে করতে।

তারাও আশা করে নতুন এক অধ্যায় শুরু হবে। অনেকদিন পর। দুরাচারী নটবরকে এবার পরাজিত করতে পেরেছে তারা। গ্রামের আকাশ-বাতাস ওদের জয়ধ্বনিতে কেঁপে ওঠে।

খবরটা পৌছে গেছে বাসন্তীর বাড়িতেও। বাসন্তী কাল রাত থেকেই চিন্তায় পড়েছে। স্বামীর কাজকর্ম তার পছন্দ হয় না। ওর জ্বালায় দিনরাত অস্থির হয়ে পড়েছে—গদির জন্য নটবর পাগল হয়ে পড়েছে। বাসন্তীও জেনেছে নটবরই কাল পিয়ালীকে তার লোকজন দিয়ে তুলে নিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর এইসব হামলা গোলমাল দেখে ঘাবড়ে গেছে বাসন্তী। বাড়িতে পুলিশ ঢুকে তদন্ত করে গেছে।

আর মেয়েটা যে ভবেশকে নিয়ে কেটে পড়বে তা ভাবেনি। এখনও কোনও খবর নেই ছেলের। এ সময় পিয়ালীর ফেরার খবরটা পায়। বাসন্তী অবাক হয়, ভবেশ এত কাজের পর ফিরে এসেছে অথচ বাড়িতে আসেনি। একজন বলে,

—আসবে বইকি! গিন্নিকে প্রধান করেছে, যুগলে প্রণাম করতে আসবে। পিয়ালীকে বিয়ে করেছে।

—অ্যাঁ! আর্তনাদ করে ওঠে বাসন্তী, —বলিস কীরে! শেষে বিয়ে করল ওই হতচ্ছাড়িকে? ওমা কী সর্বনাশ হলো গো! আর সেই ঘরের মানুষটাই বা গেল কোথায়? একী হল গো একী সব্বোনাশ করলে বাবা রত্নেশ্বর!

নটবর এসব খবর জানে না। নকড়ি আর নটবর স্নানটান সেরে খাবার পর একটি নিদ্রা দেয়। কাল রাতে ঘুম হয়নি। তাই শোয়ার সাথে সাথে দুচোখ জুড়ে ঘুম নামে। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে খেয়াল নেই।

কাজের লোকটাও ডাকেনি। যখন ঘুম ভাঙে বেলা প্রায় তিনটে। নটবর ধড়ফড় করে ওঠে। কাজের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করে,

— ভবাটা ফেরেনি এখনও?

—না তো, কখন ফিরবে বলে যায়নি কিছু।

নটবর ভাবনায় পড়ে। বাড়িতে ফোন করে। ওদিকে বাড়িতে এখন বাসন্তী ওই সব খবর পেয়ে দাপাদাপি শুরু করেছে। বাড়ি মাথায় তুলেছে। তাই ফোন ধরারও কেউ নেই। ফোনটা বেজে বেজে থেমে যায়।

নটবর বলে,

—লাইনটা খারাপ বোধ হয়। কী জানি আবার কী হলো?

ন' কড়ি বলে,

—গ্রামেই চলো। ওরা বোধ হয় গ্রামেই গেছে।

পঞ্চায়েত অফিসে ফোন করে। সেখানে তখন অফিস ছুটি হয়ে গেছে। বাইরে চলছে বিজয় মিছিল।

নটবর ভাবনায় পড়ে। ন' কড়ি বলে,

—বাড়ি চলো নুটুদা, ওদিকে আবার কী হচ্ছে দেখতে হবে।

নটবরও তাই বের হয়ে পড়ে। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। পঞ্চায়েতের খবরটা নিতে হবে। গেল না রইল। ওরা গ্রামে রওনা দেয়।

গ্রামে যখন ফিরেছে, তখনও দূরে কিশোরবাবুদের বিজয় উল্লাস চলছে। জয়ধ্বনি ওঠে। চমকে ওঠে নটবর। গাড়িটা বাড়ির সীমানায় ঢুকেছে। সারা বাড়িতে যেন শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাসন্তী নটবরকে দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে।

—সব্বোনাশ হয়েছে গো। গদি দখল করে নিল ওই হতচ্ছাড়ি আর সেই সঙ্গে ছেলেটাকে আমার কাছ থেকে চিরকালের জন্য কেড়ে নিল গো। একী সর্বনাশ হলো গো। হে-বাবা রত্নেশ্বর একী সর্বনাশ হল গো। হে-বাবা রত্নেশ্বর, একী সর্বনাশ করলে বাবা।

নটবরও ঘাবড়ে যায় বাসন্তীকে ওইভাবে কাঁদতে দেখে। সে বলে,

—কী হয়েছে? কী হয়েছে বলবে তো? ভবা কোথায়? ভবা! এমন সময় ভবেশ গ্রাম পরিক্রমা সেরে পিয়ালীকে নিয়ে বাড়ি ফেরে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা এগিয়ে আসে। ভবেশেরও মাথায় আবির। সঙ্গে নববধূ পিয়ালী। প্রথমে এতটা খেয়াল করেনি নটবর পিছনে কিশোরের দল জয়ধ্বনি দিচ্ছে। নটবর ফুঁসে ওঠে,

—শেষ অবধি কিশোরের দলে গেলো পিয়ালী। আমার গদি কেড়ে নিলো। বাসন্তী বলে,

—শুধু কি তাই? দেখতে পাচ্ছো না তোমার ছেলেকেও বিয়ে করেছে ওই সর্বনাশী, আমার ছেলেকেও কেড়ে নিল।

ভবেশ প্রণাম করতে এগিয়ে আসে।

—বাবা! আমরা বিয়ে করেছি।

—চোপ! নটবর এবার রাগে ফেটে পড়ে —বিয়ে করেছ? এ বিয়ে আমি মানি না। এ সব ওই হতচ্ছাড়া মেয়েটার শয়তানি। তাড়িয়ে দে ওটাকে—

ভবেশ বলে, —ও আমার বিবাহিতা স্ত্রী—

নটবর চিৎকার করে,

—আমার শত্রু। ও একটা সর্বনাশী, ওর এ বাড়িতে ঠাঁই হবে না।

ভবেশ বলে,

—ওর যদি এ বাড়িতে ঠাঁই না হয় এ বাড়িতে আমারও থাকা সম্ভব নয় বাবা,

বাসন্তী গর্জে ওঠে,

—একদিনেই সর্বনাশী কানে মন্তর দিয়েছে গো। ওরে ভবা। ভবেশ জানত বাবা তাকে সহজে মেনে নেবে না। তাই বলে, —আমি আজ ফিরে যাচ্ছি। এখন তোমরা ভেবে দ্যাখো যদি ওকে মেনে নিতে পারো এ বাড়িতে ফিরব, না হলে নয়। চলো পিয়ালী। নটবর কিছু বলার আগেই ভবেশ পিয়ালীকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বেরিয়ে গেল। বাসন্তী তখনও পিয়ালীর উদ্দেশে চিৎকার করছে, —ধম্মে সইবে না। আমরা ছেলেটাকে পর করে দিলি। তারপরই গালিগালাজ করতে থাকে।

নটবরকে উদ্দেশ করে গর্জায় বাসন্তী।

—গদির জন্য মেয়েটাকে চুরি করেছিলে। এখন দ্যাখো ওই মেয়ে ডাকাতি করে গেল তোমার ঘরে। গদিও গেল তার সঙ্গে গেল ছেলেও। হে বাবা—

বিনয়বাবু রমলাদি ওদের বিয়েতে সত্যিই খুশি হয়েছেন। পিয়ালী ভবেশ ওদের ওখানে এসেছে। কিশোরও সঙ্গে রয়েছে। আজ বিনয়বাবু কিশোর ভবেশকে দেখতে থাকে। ভবেশও আজ পিয়ালীর প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। তার এত বিষয় সম্পদকে তুচ্ছ করে ভবেশ বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে। বিনয়বাবু বলেন,

—পিয়ালী তুমি সত্যিই ভাগ্যবতী। এমন একজন প্রতিবাদী ছেলেকে পাশে পেয়েছ।

কিশোর বলে,

—আমাদের ওদিকে একটা বড় খামার আছে। ওখানেই চলো তোমরা।

সতীশ চাটুজ্যের দিন বদলেছে। সে বলে,

—জোর বেঁচে গেছে নটবর। এখন দেখা যাচ্ছে ও-ই পিয়ালীকে অপহরণ করেছিল। ভবেশ তার বাবাকে জেল থেকে বাঁচিয়েছে। আর সেই বাবাই কিনা ছেলে বউকে ঠাঁই দিল না।

কিশোর বলে,

—তাই তো দেখছি।

সতীশ বলে,

—আমার নতুন বাড়িতেই চল তোমরা।

ভবেশ বলে,

—শহরের কলেজে তো লেকচারার-এর কাজ করতে হচ্ছে। ওখানেই থাকব আমরা। আর পঞ্চায়েতের কাজের জন্য এসে এখানেই উঠব।

পিয়ালীও সে রকমটাই চায়। তাই বলে,

—ও ঠিকই বলেছে বাবা, আমরা শহরেই যাচ্ছি। পরে দরকার মতো আসব।

পিয়ালী-ভবেশ ফিরে যায় শহরে, পিয়ালী আজ ভবেশের ব্যবহারে ভীষণ খুশি, শহরের বাড়িতে ফিরেছে ভবেশ। সারা দিনের ক্লান্তির পর এবার একটু বসতে পায় তারা। কাজের লোকটা অবশ্য তার বাবার আসার খবরটা দেয়।

ভবেশ বলে,

—আমরা বাড়ি থেকেই আসছি।

সন্ধ্যা নামছে, পিয়ালীও এবার স্নান করে নিজেই চা করে আনে, সঙ্গে কয়েকটা টোস্ট, সে বলে,

—চা খাও, পরে ভূষণ খাবার বানাচ্ছে।

পিযালী চা খেতে খেতে বলে,

—আমার জন্য নিজের এতবড় বিপদ কেন ডেকে আনলে?

ভবেশ চাইল ওর দিকে, সাধারণ শাড়িতে পিয়ালীকে আজ ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে। সিঁথিতে সিঁদুর। ভবেশ বলে,

—নিজেদের লড়াই নিজেই লড়ব পিয়ালী। আজ থেকে আমাদের নতুন পথ চলা শুরু। তোমাকে পাশে পেলে সব দুঃখ-কষ্ট আমার সইবে। পিয়ালীকে কাছে টেনে নেয় ভবেশ। পিয়ালীও আজ একজনের নিবিড় বাঁধনে নিজেকে মেলে ধরে, ভবেশ আজ তাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে। ভবেশ বলে,

—এর মধ্যে বাড়ি গিয়ে তোমার স্কুলের কাগজপত্র, মার্কশিট এসব নিয়ে এসো। এখানে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে যাও। নিজেকে গড়ে তুলতে হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনও কাজই হয় না। সব কিছুর জন্য প্রস্তুতি সাধনার দরকার, দেশসেবার কাজেও।

পিয়ালীও ভাবছে কথাটা। ভবেশ বলে,

—বাড়ির কোনও সাহায্যের দরকার হবে না। নিজেরা এবার নিজেদের সংসারের সব কিছু দিয়ে সামলে নেব।

পিয়ালীর বুক ভরে ওঠে। তাদের এই ছোট ঘরে শূন্য জীবনের দুজনের ভালোবাসা পূর্ণ হয়ে উঠবে।

ভোটের ডামাডোলে বেশ কিছুদিন ওদের কয়লার ব্যবসা মার খেয়েছে। নটবর ঠিকমতো ওদিকে লোকজন দিতে পারেনি। পচাও এদিকে ব্যস্ত ছিল। ভোট যা হবার হয়ে গেছে। আবার নটবরকে ওই কাজে নামতে হবে। তাই নটবর আবার সুরেশ আগরওয়ালের অফিসে এসেছে। সুরেশজির কাজ কিন্তু বন্ধ নেই। এখন তার আয়ও বেড়েছে। সেও দেখেছে এখানে নটবরের দলকে ভাগ দিতে হচ্ছে। এখন তাই সে নিজের লোকজন দিয়েই কাজ চালু করেছে তাতে তার লাভও বেড়েছে আর নটবরের হাতে ক্ষমতাও নেই।

গদির দখল এখন কিশোরদের হাতে। নতুন প্রধান-এর গদিতে বসা নিয়ে নটবর অনেক খেল খেলেছে। তারপর হার মেনে এখন এসেছে সুরেশজির কাছে। সুরেশজিও জানে কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়। সেও নন্দীপুরের সব খবরই রেখেছে। তাই আজ নটবরকে তেমন গুরুত্বই দেয় না।

এখন ব্যস্ত রয়েছে নিজের কাজে। সুরেশজি ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে এবার স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাকটরি চালু করতে চলেছে। তাই এখন ওর দরকার কিশোরদের, বিশেষ করে নতুন প্রধানকে। ওদের নো অবজেকশন না পেলে ব্যাংকও টাকা দিতে চাইছে না।

কিন্তু পঞ্চায়েতের নতুন কমিটি বেশ কড়া মনোভাবই নিয়েছে। তারা এর মধ্যে কোল ইন্ডিয়াকে কড়া ভাষায় চিঠি দিয়েছে এখানের কয়লা পাচার বন্ধ করতে।

কোল অথরিটির অফিসারও এসেছে সুরেশজিকে সেই খবর দিতে। নতুন বোর্ড চায় কোল অথরিটি এখান থেকে তার কোম্পানির কাজ শুরু করুক। সরকারেরও ট্যাক্স আদায় হবে। অপচয় বন্ধ হবে। আর কোলিয়ারি চালু হলে স্থানীয় বেকার লোকেদের কাজও মিলবে।

সুরেশ জানে ওরা সঠিক দাবিই করেছে। আর এই দাবি না মিটলে নতুন বোর্ড দিল্লিতেই খোদ কয়লামন্ত্রকেই জানাবে তাদের অভিযোগ। কোল অথরিটির অফিসার এবার বলে,

—তাদের থামান সুরেশবাবু, না হলে আপনাদের এসব কাজ আর চলবে না।

সুরেশও সেই কথাই ভাবে। বেশ বুঝেছে নতুন বোর্ড তাদের এখানের পরিবেশকে নষ্ট করে ওই ধরনের লোহা কারখানা করতে দেবে না। আর এখানের পাচার করা বিনে পয়সার কয়লাই যদি না পায় কারখানা করা যাবে না।

এ সময় নটবর এসেছে সুরেশজির অফিসে। সুরেশ তাকে ইচ্ছে করেই বসিয়ে রেখেছে।

নটবরও বুঝেছে এবার তার গদির মাহাত্ম্য। দেখেছে নতুন লোক দিয়ে কয়লার কাজ করে ভালো টাকাই কামাচ্ছে। নটবরের লোকদের মায় পচাকেও ওখানে কাজ করতে দেয় না সুরেশজির সরকার।

নটবর কী করবে তাই ভাবছে। এমন সময় প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে তার ডাক আসে। সুরেশজি হাতজোড় করে বলে,

—মাফ কিজিয়ে নটবরজি। ফরেন সে একজন দোস্ত এসেছিল তাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। বলুন কী নেবেন—ঠান্ডা আউর গরম।

নটবর বলে,

—আপনার ওই কাজে কাল আমার লোকজন গেল। ওদের কাজ দেয়নি। আপনার সরকার, লোকাল লোকেদের কাজ না দিলে তারা যদি গোলমাল করে।

এবার সুরেশ বলে,

—তারা গোলমাল করে আর কী করবে নটবরজি, এসবই বন্ধ করে দিতে হবে। পুরা কাম। শুধু তাই নয় মালুম আয়রন ফাউন্ডারি ভি বন্ধ করে দিতে হবে।

নটবর সুরেশজির কথাগুলো শুনছে। ওই কয়লার কারবার নতুন ফ্যাক্টরির কাজ তার চাই। আর সব হতে পারে যদি প্রধান এ বিষয়ে আর গোলমাল না করে।

সুরেশ জানে পঞ্চায়েতের প্রধান এখন নটবরের ছেলের বউ, অবশ্য নটবর জানায়নি ভবেশের সঙ্গে তার ইদানীং দূরত্ব বেড়ে গেছে। নটবর চতুর ব্যক্তি। সে ভেবে নিয়েছে যে সুরেশজিকে এখনও সে হাতে রাখতে পারবে ওই পরিচয়-এর কথা শুনিয়েই। সুরেশও বলে ও তো তোমার ঘরের বহু। এখন তোমার ছেলে বহুকে একটু বলো। ও যদি গোলমাল না করে কোল কোম্পানি ভি কিছু করে না। আর বাকি আমি সালটে নেব। ওই স্পঞ্জ আয়রন কারখানা ভি বানাবে, ও শুধু নো অবজেকশন লিখে দেবে, তুমিও যেমন কাম কাজ করছ করবে। আর ফ্যাক্টরির পঁচিশ পার্সেন্ট শেয়ারও তোমার হবে।

নটবর যেন অন্ধকারে আশার আলো দেখে। বলে,

—সে আমি দেখছি সুরেশজি।

সুরেশও সাফ জানায়

—এসব তুমি সালটে নাও—ব্যস, তোমার চাকরি চালু হবে।

অর্থাৎ এসব কাজ না হলে সুরেশজিও তাকে কাজ দেবে না।

নটবর এবার ভাবছে কীভাবে অবশ্য তার বউমাকে হাতে আনবে। ছেলেটাও একেবারে বিগড়ে গেছে।

নতুন বোর্ডের কাজ শুরু হয়েছে। এখন পিয়ালী নিয়মিত পঞ্চায়েত অফিসে বসছে। সকাল থেকে বেলা তিনটে অবধি এখানে কাজ করে শহরে গিয়ে নিজের পড়াশোনা করে।

এখন পঞ্চায়েত অফিসেও কাজকর্ম ঠিকমতো হচ্ছে। মহিলা সমবায়ের কাজও বেড়েছে। বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে গিয়ে পিয়ালী মেয়েদের নিয়ে মিটিং করে। তারা বিভিন্ন স্কুল করে সরকারি সাহায্য নিয়ে নিজেরাই তাঁত, গোরু, ছাগল পোষা, মুরগির খামার, নানা ছোট বড় প্রকল্পের কাজ করে নিয়মিত ব্যাঙ্কের টাকা লোন শোধ দিয়ে নিজেরাও রোজগার করছে।

কয়েকটা রাস্তার কাজ—বিভিন্ন গ্রামে কুয়ো, টিউবওয়েল তৈরির কাজ শুরু করেছে,

পিয়ালী কিশোরবাবুরা নিজেরাও খোঁজ নিতে যায়। কাজকর্ম দেখাশোনা করে, আর গ্রাম-সভার সভ্যদের এবার কাজে নামাচ্ছে পিয়ালী।

কৃষিঋণও ঠিকঠাক পাবার ফলে চাষিরাও এখন খুশি। পিয়ালী ধীরে ধীরে এলাকার রূপটাকে বদলাবার চেষ্টা করছে। আর মানুষও এতদিন পর সৎভাবে সব কাজ হতে দেখে নিজেরাও সচেষ্ট হয়ে ওঠে কিছু করার জন্য। সমাজের মধ্যে যে শুভশক্তি রয়েছে ওই লোভী স্বার্থপরের দল এতদিন নিজেদের লোভ-লালসা দিয়ে তার প্রকাশ ঘটাতে দেয়নি। কিন্তু পিয়ালীর নিঃস্বার্থ কাজগুলোই মানুষের মনে আবার সেই শুভশক্তিকে জাগ্রত করে তুলেছে। গ্রামে গ্রামে একটা কর্মপ্রবাহ শুরু হয়েছে, মানুষও সচেতন হয়ে উঠেছে। তাই এবার পিয়ালীও শক্ত হাতে আরও বড় অন্যায়ের প্রতিকার করতে চায়। এই অঞ্চলে কোনও শিল্প ছিল না, সামান্য যা চাষবাস ছিল, তাও সেচের ব্যবস্থা না থাকার ফলে বেশির ভাগ জমিতেই ফসল হবার নিশ্চয়তা নেই। এবার পঞ্চায়েত সমিতি সেচ বিভাগকে দিয়ে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প করে গ্রামে গ্রামে বেহড় বাঁধ তৈরির কাজ শুরু করেছে। তাতে বৃষ্টির বাড়তি জল আটকে রেখে বেশ কিছু জমিতে চাষও শুরু করে।

অরণ্যের মাটির গভীরে জমে থাকা কয়লা তোলার কাজ কোল অথরিটি যদি শুরু করে এলাকার শিল্প অঞ্চল গড়ে উঠবে। কিন্তু কিছু অসাধু লোক কোল অথরিটির কিছু অফিসারের যোগসাজশে প্রচুর কয়লা রাতের অন্ধকারে তুলে নিচ্ছে। পঞ্চায়েতের সমূহ ক্ষতি হচ্ছে তাতে। এতদিন নটবর নিজে সুরেশজির মতো বিরাট কোল মাফিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কয়লা লুঠ করেছে। এবাব পিয়ালী নতুন বোর্ড থেকে সব খবর সরকারকে জানাচ্ছে। তারা এই লুঠপাট বন্ধ করে সরকারি কোলিয়ারি চালু করতে চায়।

এতে সুরেশজির মতো লোকেদের টনক নড়েছে। এবার নটবরকেও তারা কাজে লাগিয়ে এসব আন্দোলন বন্ধ করতে চায়। নটবরও জানে তার রোজগার চালু রাখতে হবে। আবার তার হারানো গদির দখল পেতে হবে। তাই ভেবেচিন্তে একটা পথ তাকে বের করতেই হবে।

কামিনী দেখছে ক মাসেই এখানের পরিবেশটা বদলে গেছে। পঞ্চায়েতি রাজ ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা হলে সব পরিকল্পনার কাজ যথাযথ রূপায়িত হলে গ্রামাঞ্চলের মানুষের অভাব কষ্ট খানিকটা দূর হবে। মানুষের মনে আসবে আশা, কাজ করার ইচ্ছা। সেও বুঝবে সমাজের প্রতি তারও কিছু কর্তব্য আছে। পরিবেশও বদলে যাবে।

এই শুভশক্তির জাগরণে পচাদের মতো মানুষদের বিপদ ঘটে। পচা দেখছে ইদানীং সুরেশজির কয়লার কাজেও তাদের কোনো ভূমিকা আর নেই। নটবরের আমলে এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটা হাটে তারাই জোর করে তোলা তুলত। তার সামান্য ভাগ পঞ্চায়েতে জমা পড়লেও বেশিটা ওরাই পেত। এখন পচা বেশ বুঝতে পারে যে সুরেশজি আর তাকে পাত্তাই দেয় না। এখন ওর সরকার বাইরে থেকে লোকজন এনে পুরোদমে কাজ চালাচ্ছে।

পচা বলে,

—আমরা কাজ পাব না?

সরকার এখন পচাদের ওপর ভরসা করে না। তার নিজের লোকজনও কম নয়। আর প্রধানও বদলে গেছে। তাই সরকার বলে,

—এখন লোকের দরকার নেই।

পচা দেখে এখন ওরাও তাকে পাত্তা দিচ্ছে না। পচা এবার নটবরের কাছে আসে। যদি কোনও কাজের ব্যবস্থা হয় নটবরের কর্মব্যস্ত বৈঠকখানায়। এখন আর লোকজনের ভিড়ও নেই। পচা এসেছেন নটবর ওকে দেখে চাইল। সারা ঘরে স্তব্ধতা নেমেছে। পচা বলে, —কাজকর্ম তো কিছু নেই নুটুবাবু। কয়লার কাজে গেলাম তা শালা সরকার আজ চিনতেই পারে না। বল্লেক কাজ নেই, শালারা উড়ে এসে জুড়ে বসবে আর আমরা আঙুল চুষব।

নটবর-ও বুঝেছে একটা কিছু করা দরকার। পচাকে বলে,

—দিন কতক সবুর কর। এখন বেইমানি করছে আমি দেখছি যদি কিছু করা যায়।

পচা বলে,

—তাই দ্যাখো। নইলে আমাদের বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবে, আর আমরা চুপ করে দেখব। হবে নাই—

নটবর জানে সুরেশজিকে। এখন তাদের ক্ষমতাও নেই। ঝামেলা করলে পুলিশ পচাদেব সঙ্গে সঙ্গে নটবরকেও আটকে দেবে। তাই নটবর বলে,

—মাথা গরম করিস না। ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে দে। দিন কতক চুপচাপ থাক, দেখবি দিন বদলাবেই।

পচা বলে,

—দ্যাখো কী হয়। তারপর কাম কাজ না পেলে তখন দেখো কী হয়।

একটা কিছু করা দরকার, পিয়ালীকে সামলাতে হবে নইলে কাজ-কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। আর এ দিকে পঞ্চায়েত বোর্ডও তাদের অপকর্মের সব হিসেব নিতে শুরু করেছে। বিপদে পড়ে নটবর। ওরা যদি সেসব খরচের হিসাব খুঁচিয়ে তোলে বিপদ হবে নটবরের। তার আগেই পিয়ালীকে সামলাতে হবে। তার গদি চলে যাবার পর আমদানিও কমেছে। সেই হাঁকডাকও আর নেই। এখন পাড়ার বউ-গিন্নিরাও বাসন্তীর কাছে বড় একটা আসে না। সবাই সুযোগ বুঝে কেটে পড়েছে, নটবর বলে,

—একটা কথা ভাবছি।

বাসন্তী চাইল, নটবর বলে,

—ছেলেটা বাড়িতে নেই, কেমন সব ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। কাদের জন্যে সংসার।

বাসন্তীর মনেও এই শূন্যতা প্রকট হয়ে উঠেছে। সে বলে,

—তা সত্যি বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

নটবর বলে,

—হাজার হোক ছেলে, ওরা যদি বিয়ে করে সুখী হয়, আমরা বাধা দেব কেন? তা ছাড়া মেয়েটা তো পর নয়, এখন আইনত তোমার ঘরের বউ। আর তাও যে সে নয় অঞ্চলের প্রধান বলে কথা। সে ঘরে থাকলে গদিটা তো আমাদের ঘরেই থাকবে।

নটবর অ্যাদ্দিন ধরে যে প্ল্যান করেছিল সেটা এবার গিন্নির সমর্থনের জন্য বেশ করে পেশ করেছে। বাসন্তীও জোরালো কোনও প্রতিবাদ করছে না। বরং মন দিয়ে তার কথা শুনছে,

নটবর বলে,

—তাই ভাবছি ওদের ঘরেই আনব। বেচারা শহরে থেকে এতদূরে যাতায়াত করে প্রধানের কাজ সামলাচ্ছে। ওর বাপের বাড়িতেও যায় না। ওকে বাড়িতে রাখলে আবার বাড়ি সরগরম হয়ে থাকবে।

বাসন্তীও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,

—পিয়ালী কি আসবে?

নটবর বুঝেছে এ ব্যাপারে বাসন্তীর তেমন অমত নেই। বরং সেও চায় পিয়ালী-ভবেশ বাড়িতে ফিরুক। নটবর বলে, — কেন আসবে না। আর প্রধান ঘরে থাকলে ওসব কাজেও আমি পরামর্শ দিতে পারব।

বাসন্তী বলে,

—দ্যাখো যদি আসে, একা একা ভালো লাগছে না বাপু।

পিয়ালী এখন খুবই ব্যস্ত, ভবেশও তাকে এসব পরিকল্পনার কাজে সাহায্য করছে। বিনয়বাবু, রমলাদিও আসেন এদের এখানে। পিয়ালী শহরে থাকার জন্য পঞ্চায়েতের সব কাজে উপরমহলের নির্দেশ মঞ্জুরি বের করতে সুবিধা হয়।

পিয়ালী এবার ওই কয়লার চোরাকারবারও বন্ধ করতে চায়। সুরেশবাবুর মতো বাইরের লোক এসে এখানের সম্পদ এভাবে লুঠ করে নিয়ে যাবে এটাকে সে মেনে নিতে পারে না। এর মধ্যে সে কোল অফিসার, পুলিশকে জানিয়েছে, দরকার হলে দিল্লিতেও জানাবে। আর ওই পরিবেশদূষণকারী নোংরা স্পঞ্জ আয়রন ফ্যাক্টরিও গড়ার জন্য অনুমতি চেয়ে লিখেছে সুরেশজি। পিয়ালী ওদের অন্ধকারের ব্যবসার খবর জানে। সে ওদের প্রশ্রয় দেবে না।

বিনয়বাবু ছাড়া কিশোরবাবুও বলে,

—ওই চক্রকে কোনো ঠাঁই দেব না এখানে।

এমনি দিনে ওদের শহরের বাড়িতে এসে হাজির হয় নটবরের সঙ্গে বাসন্তী। ভবেশও মা-বাবাকে আসতে দেখে অবাক হয়।

পিয়ালী অবশ্য ওদের প্রণাম করে ঘরে নিয়ে যায়। পিয়ালীকে দেখছে বাসন্তী। এর মধ্যে চোখে মুখে ওর ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটে উঠেছে। শহরে থাকে। কলেজে পড়ে তাই কথাবার্তায় মার্জিত রুচি।

বাসন্তী বলে,

—ভবা, তোর বাবা তখন রাগের বশে কী বলতে কী বলেছিল সেই কথাটাই মনে রাখলি। আমাদের তোরা ছাড়া আর কে আছে বল, তোরা চলে আসার পর মানুষটা গুমরে গুমরে অন্ন-জল প্রায়ই ছেড়ে দিয়েছে।

ভবেশ বাবাকে দেখতে থাকে, নটবরের গদি হারানোর দুঃখটাই অবশ্য নটবরের চেহারায় ভাঙন এনেছে। নটবর বলে,

—তোদের জন্য মন কেমন করে রে। গ্রামে যাস, বউমাও যায় কিন্তু একবারের জন্য বাড়ি যাস না। বাবা-মাকে কি ভুলে যাবে তোমরা? এখন অঞ্চলের প্রধান বউমা। পাঁচজন তোমায় দেখে শিখবে। তুমি যদি এমন করো। অন্যজন, তারা কী শিখবে মা?

পিয়ালী শুনেছে তাদের কথা,

পিয়ালীকে সব দিক থেকেই আদর্শ নারী হতে হবে, সংসারে থেকেই সে সব কর্তব্য করতে চায়, জনসেবার কাজ করতে চায়, তাই পিয়ালী বলে,

—না, না, আপনাদের কথা ভুলিনি মা।

নটবর পিয়ালীর মনের নরম জায়গাতে একটা আঘাত দিতে পেরেছে। সে বলে,

—কিন্তু লোকে তো তা দেখছে না। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। বাবা ভবেশ তোদের সংসার তোরা বুঝে নে। আমরা দুজন না হয় কাশী-বৃন্দাবন গিয়েই থাকব। তবু তোরা ঘরবাসী হ বাবা।

—এসব কথা উঠছে কেন বাবা?

নটবর কাতর স্বরে বলে,

—তোমরা বাড়ি না ফিরলে যে নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে পদে পদে। এই অপরাধের কি ক্ষমা নেই মা।

পিয়ালীও তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। সে এবার গ্রামেই ফিরবে। সে বলে,

—আমরা বাড়িতেই ফিরব বাবা,

বাসন্তী বলে,

—সত্যি মা, ওরে ভবেশ।

নটবর বলে,

—তোদের কর্তব্য তোরা ঠিক কর বাবা। আমি আমার কথাটা বললাম, এবার তোদের ব্যাপার।

ভবেশ দেখে পিয়ালীর অমত নেই। গ্রামে থাকলে তাদের সব সমস্যাই মিটে যাবে। তাই বলে।

—যাব বাবা, তবে আমার তো কলেজের চাকরি। সপ্তাহে পাঁচদিন এখানে থাকব, বাকি দুদিন গ্রামে। তবে পিয়ালী বাড়িতেই থাকবে। নটবরও তাই চায়। ভবেশের চেয়ে পিয়ালীকেই তার বেশি দরকার। আর ভবেশের অনুপস্থিতিতে সে পিয়ালীর মগজে তার নিজের প্ল্যানগুলো ঠিকমতো ঢোকাতে পারবে। তাই নটবর বলে, —সে তোরা তোদের মতো করেই থাকবি। আমি বাধা দেব না। তবে ঘরের লক্ষ্মী বাইরে পড়ে থাকবে। এতে বাড়ির মানমর্যাদা যে নষ্ট হচ্ছে বুঝেই এসেছি রে, তাহলে চল এবার— পিয়ালী ভবেশও রাজি।

সতীশ চাটুজ্যে ভেবেছিল পিয়ালী নটবরের বাড়িতেই থাকবে। প্রধান-এর কাজও চালাবে। সতীশও এর মধ্যে কিছু জমির দখল নেবার চেষ্টা করেছে। গ্রামের বাসনা বুড়ির কিছু জমি ভাগে চাষ করত সতীশ। তার হাল-বলদ নিয়ে। এবার বুড়ির ওই জমি সে কৌশলে বাবা মহাদেবের নামে দেবোত্তর বলে খাতায় লিখে নেবে। তার জন্য সরকারি জি-এল ও অফিসে দু-একজনকে ফিটও করেছে, আর মেয়ে প্রধান সে যদি লিখে দেয় সতীশের জমিটা পেতে সুবিধা হবে।

কিন্তু সতীশ পিয়ালীকে এখনও ধরতে পারেনি। মেয়েটা গ্রামে আসে—সব সময় ব্যস্ত

থাকে। আবার শহরে ফিরে যায়। সতীশের রাগ তাই নটবরের উপরে। তার মেয়েকে সে ঘরে নাকি ঠাঁই দেয়নি। কিন্তু হঠাৎ সেদিন অন্য কথা শোনে। গ্রামে ফিরেছে ভবেশ-পিয়ালী। ভবেশের বাবা নটবর খুশি। তার ছেলে-বউ-এর সঙ্গে সংঘাতও মিটে গেছে। সতীশও খুশি হয়েছে। তা হলে মেয়েকে এবার নিরিবিলিতে পাবে।

নটবরের বাড়ির বাইরের ঘরটা নিয়েছে পিয়ালী। নতুন চেয়ার-টেবিল, পাখা-টেলিফোন লাগিয়েছে সে। পিয়ালীর নামে নতুন বোর্ডও বসেছে। 'অঞ্চল প্রধান'।

নটবরও খুশি। গদিটা তাহলে তার ঘরেই রয়েছে। আবার তার নিঃঝুম বাড়িটা যেন সজাগ হয়ে উঠেছে লোকজনের আনাগোনায়। পঞ্চায়েতের অন্য সদস্যরা আসছে পিয়ালীর কাছে। অঞ্চলের বহু মানুষজনও আসছে। মহিলা সমিতির মেয়েরাও আসে।

নটবর আবার তার আগেকার কর্মেই যাচ্ছে। কিন্তু খেয়াল করেছে পিয়ালী যা করে সে নিজেই করে। সমস্ত সভ্য গ্রামের পঞ্চাশজনকে জানিয়ে তাদের মতামত নিয়েই করে, নটবর প্রকাশ্যে বলে,

—বউমা সত্যিই দারুণ কাজের হে, এবার পঞ্চায়েতে কাজের কাজ কিছু হবে, আমিও বলি, কাজ করতে হবে বউমা, মানুষের জন্য—

মনে মনে চটে আছে নটবর। প্রমাদ গুনছে সে তার সময়কার রাস্তার কাজ, পানীয় জলের উন্নয়ন মায় বিল্ডিং ফান্ডে কয়েক লাখ টাকার গোলমাল ধরা পড়েছে। এ নিয়ে পঞ্চায়েতে মিটিংও হয়েছে। নটবরের দল এখন আরও সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। তাদের দলের দুজন এখন কিশোরদের সমর্থন দিচ্ছে। তারা স্বীকার করেছে ওইসব কেলেঙ্কারির কথা।

পিয়ালী বলে,

—এসবের তদন্ত করা হবে, তার জন্য কমিটি গড়া হয়েছে।

তবু নটবর চুপ করেই ছিল। হঠাৎ সেদিন সুরেশজি নটবরকে ডেকে পাঠায়। নটবরও খুশি মনে সেখানে যায়। সুরেশজি বিপদে পড়েছে। পচার দল কিছুদিন চুপচাপ থেকে দেখে নটবর তাদের জন্য কিছুই করছে না। বরং সুরেশজি তাদের সামনে দিয়ে লাখ লাখ টাকার মাল তুলে নিয়ে যায়। পচাও নটবরের ভরসা না করে কিছু অন্ধকার কাজের লোকেদের নিয়ে দল গড়ে। রাতের অন্ধকারে সুরেশজির কয়েকটা ট্রাক ডাম্পার কয়লা বোঝাই করে যাচ্ছে। বনের মধ্যে তেমন পথও নেই। এদিকে পচার দলও তৈরি হয়েছিল। বনের মধ্যে তারা রাস্তা কেটে রাখে। গাড়িগুলো থামতেই এবার ওরা বোমা মারতে থাকে। দু একটা ট্রাকে আগুনও ধরিয়ে দেয়—

অবশ্য সুরেশজির লোকরাও নিরস্ত্র ছিল না। তারাও হঠাৎ আক্রমণে হকচকিয়ে যায়। ট্রাকগুলোও জ্বলছে। বনের এদিকটা ওদের তেমন চেনা নয়। পচার দল আগে থেকেই আত্মরক্ষার জন্য এদিকের আড়াল থেকে ওদের গুলিরও জবাব দিতে থাকে।

ফলে সুরেশের দলের বেশ কিছু লোক আহত হয়। বাকিরা পালায়। মালপত্র ট্রাক, ডাম্পার ফেলে রেখেই। প্রচুর লোকসান হয় সুরেশের আর এরপরই পুলিশও সজাগ হয়ে ওঠে।

স্থানীয় পুলিশও ঘটনাটাকে চাপতে পারে না। অঞ্চল প্রধান পিয়ালীও আবার সরকারকে

এই কয়লা পাচার বন্ধ করার জন্য, কোলিয়ারি চালু করার জন্যই লিখছে। এই হাঙ্গামার এদিকে সাড়া পড়ে যায়। সুরেশের কাজ কারবারও আপাতত বন্ধ হয়ে যায়। পুলিশ সন্দেহের বশে স্থানীয় বেশ কিছু দোষী আসামীদের ধরে, সেই এই প্রথম পাচারও ধরল।

পচা ভাবেনি যে পুলিশ তাকেও ধরবে। এতদিন সে নটবরের ছত্রচ্ছায়ায় ছিল। এখন নটবরের কর্তৃত্ব আর নেই। তাই পচার পায়ের তলা থেকেও মাটি সরে গেছে। কামিনী বলে,

—এসব কাজ আর করিস না। আমাদের দিন তো কুনোমতে চলছে।

কিন্তু পচার রক্তে আছে ওই মত্ততা। রাতের অন্ধকারে ওর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। শিরায় শিরায় কী মত্ততা জাগে। কিছু একটা করতে হবে। এই ভাবটাকে সে সামলাতে পারে না।

পচা এবার বুঝেছে তার মাথার ওপর ছাতাটা আর নেই—পিয়ালীর সামনে যাবার সাহসও নেই। সেই রাতে পচাই তাকে তুলে নিয়ে গেছল নটবরের খামারবাড়িতে। এখন পচা দেখেছে নটবর পিয়ালীকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু পচা আমের আঁটির মতো দুধ আমে মেশা জগৎ থেকে ছিটকে পড়েছে। তাই পুলিশও তাকে তুলে নিয়ে যায়।

সুরেশজি এবার একটা আপস করতে চায়। সুরেশজি এবার নটবরকেই খাতির করে অফিসে তার নিজের ঘরে বসায়। ঠান্ডা পানীয় আনিয়ে দেয়। নটবর দেখছে প্রধান সে নাই থাক তার দূর থেকেই যে ছত্রধান রয়েছে ওটা বুঝেছে সুরেশজি। এবার নটবরও তৈরি হয়—মনে মনে, সুরেশজি বলে,

—নটবরজি, এবার প্রধান তো তোমার বউমা। শুনি তোমার কথামতোই চলে ও।

নটবরও সায় দেয়,

—হ্যাঁ, মাঝে মাঝে পলিসি বদলে দিতে হয়।

সুরেশজি বলে,

—এবার ওকে বলো। ফির যেন কোল অথরিটিকে চিঠি না দেয়। এবার কয়লার কারবারে তুমি ভি পঁচিশ পার্সেন্ট পাবে। আর ওই আয়রন ফ্যাক্টরি ভি-পঁচিশ পার্সেন্ট। ওরা এবার নো অবজেকশন দিয়ে দিক। আমি কাজ শুরু করে দেব। কালকের ব্যাপার হামি সালটে নেব।

নটবর ভাবছে কথাটা। একটু দর বাড়াবার জন্য বলে,

—দেখি বলে বউমাকে।

—এইসা কর। তুমি আমার সঙ্গে বাতচিত করিয়ে দাও তোমার বউমার আর আমি ভি ওকে সমঝে দিব কী কী পাবেন উনি প্রধান হয়ে আমার সঙ্গে হাত মিলালে, ব্যস—তারপর জিন্দগী আরাম সে কেটে যাবে। তুমিও আরাম সে থাকবে নটবরজী। সামনের ইলেকশনে গদি ভি তোমার বউমারই থাকবে।

নটবর ভাবছে সুরেশজি যদি পিয়ালীকে হাতে আনতে পারে, নটবরেরই লাভ। নটবর বলে,

—তাই দেখছি। আমিও সেইরকম ব্যবস্থা করে খবর দেব।

—তাই করুন।

ভবেশ এখন স্বনির্ভর। সে এখন কলেজে অধ্যাপকের কাজই পেয়েছে। শহরে থাকে।

শুক্রবার রাতে আসে। সোমবার ভোরেই ফিরে যায়। পিয়ালী পঞ্চায়েতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সতীশ চাট্যুজ্যেও অনেক আশা নিয়ে বাসনা বুড়ির বিঘে দশেক সরেস জমি গিলে ফেলার জন্য কাগজপত্র করে মেয়ের কাছে আসে।

পিয়ালী আগেই বুড়ির কাছে খবর পেয়েছিল।

—তোমার বাবার মতিগতি ভালো নয় গো। আমার মুখের গ্রাসও কেড়ে নিতে চাইছে। জমিটা নাকি বাবার ভোগে লাগবে। আমি কোথায় যাব মা রে!

পিয়ালী বাবার স্বভাব-চরিত্তির জানে। জানে সব ইতিহাস। আবার তার বাবা নতুন ইতিহাস গড়তে চলেছে। পিয়ালী বলে,

—তুমি যাও মাসি। আমি দেখছি। এ অন্যায় হতে দেব না। তুমি বরং একটা দরখাস্ত লিখে দাও।

সতীশ চাটুজ্যে সব কাগজপত্র রেডি করে এনেছে এখন প্রধান শুধু রেকমেন্ড করে দিলেই জি. এল. ও. অফিসেও এটাকে মেনে নেবে। অবশ্য নটবরের যুগ হলে মোটা টাকা প্রণামি লাগত। এখন নিজের মেয়ে রয়েছে এটাই ভরসা।

সতীশ বলে,

—এই কাগজটাতে সই করে দে মা।

পিয়ালী আগেই জানত। তাই বুড়ির দরখাস্তখানা বের করে বলে,

—ও আপত্তি জানাচ্ছে। তা ছাড়া জমি ও দেয়নি। এটাতে সই করা যাবে না বাবা!

—সে কী! আমি তোর বাবা।

— তাই বলে এত বড় অন্যায় করবে? এটা বেআইনি কাজ। একজনকে বঞ্চিত করা যাবে না। এসব চেষ্টাও কোরো না। আমি আপত্তি করব।

সতীশ আকাশ থেকে পড়ে। দু-একবার ওকে বোঝাবার চেষ্টাও করে—বাবা মহাদেবের ইচ্ছে।

—বাবা মহাদেবের আবির্ভাবের সেই ছোলা ভেজানো কথাটাও তা হলে প্রকাশ পাবে বাবা।

সতীশ চমকে ওঠে, দেখে কেউ ধারেকাছে আছে কি না। পিয়ালী বলে,

—ওই নিয়েই খুশি থাকো। কারও সর্বনাশ কোরো না, যাও।

—ঠিক আছে যাচ্ছি। তবে কাজটা ঠিক করলি না। বাবা মহাদেব এর বিচার করবেন। মেয়ে হয়ে বাপকে দেখলি না।

পিয়ালী বলে,

—তুমি চুরি করবে আর আমাকে তাই মেনে নিতে হবে? যাও।

—সতীশ চাটুজ্যে রেগে ওঠে, বলে—

—অমন মেয়ের মুখদর্শন করব না।

পিয়ালী অবশ্য এসব নিয়ে ভাবে না।

গ্রামের অনেকেই শুনেছে। নটবরও। সে চিন্তায় আছে। গ্রামের লোকেরা বলে,

—সত্যিই ভালো মেয়ে পিয়ালী।

ভবেশ বাড়ি আসে ছুটিতে। সে ওসব কথা শুনেছে। সতীশ চাটুজ্যে তাকেও শুনিয়েছে কথাটা। ভবেশ পিয়ালীকে বলে,

—তোমার বাবাকেও ফিরিয়ে দিলে?

—জেনেশুনে অন্যায়কে সমর্থন করব না। তুমিই তো বলেছিলে অন্যায়ের সাথে আপস না করতে।

—সত্যি আমি খুশি হয়েছি পিয়ালী। হয়তো এর চেয়ে বড় আরও প্রলোভন আসবে।

—তুমি পাশে থাকলে সব প্রলোভন জয় করে চলতে পারব।

—জেনেশুনে সমস্যাগুলোকে ডেকে আনলে। সত্যিকার ভালো কাজ করার বিপদ যে এ যুগে অনেক।

—তবু চিরকালই কি অন্যায় অবিচার চলবে? এর শেষ হবেই, তার জন্যও আমাকেও খেসারত দিতে হবে। তবু প্রতিবাদ থামবে না।

নটবরের এখন জীবন-মরণ সমস্যা। সুরেশবাবু চায় পিয়ালীর সাথে কথা বলতে। এদিকে নটবরেরও সুরেশবাবুকে দরকার। তা ছাড়া সামনের বার নির্বাচনে তার গদি পাবার আশাটা তো আছেই। তার জন্য জমি তৈরি রাখতে হবে। কারণ ওদিকে কিশোরবাবুও আসরে নামবে। কিশোর এখন পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হয়ে ভালো কাজই করছে। আর কিশোরকে হারিয়ে তার গদি পুনরুদ্ধার করতে হলে ওই সুরেশজিকেই তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।

পিয়ালী এ বাড়িতে রয়েছে নটবর-বাসন্তীর কথাতেই, তবে ওদের দিকটা আলাদা। পিয়ালী সেখানে নিজের কাজকর্ম আর পড়াশোনা নিয়ে থাকে। তবে খায় দায় বাসন্তীর কাছেই, মাঝে মাঝে বাসন্তীর কাছে আসে-যায়। বাসন্তীও ক্রমশ পিয়ালীকে সহজভাবে মেনে নিতে পেরেছে। হাজার হোক ছেলের বউ। আর ভবেশ তার একমাত্র সন্তান।

বাসন্তীর মনে এখন আর গদির নেশাটা নেই, বরং পিয়ালীকে দিন-রাত খাটতে দেখে একটা বিরক্তিই এসেছে। রোদ-জলে বেরুতে হয় এখানে-ওখানে। সেদিন বনের মধ্যে গুলিগোলা চলার পর সেখানে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করতে হয়েছে। বাসন্তী বলে,

—কী ঝকমারির কাজ বাছা, কী দরকার ওসবে?

কোনও উত্তর দেয়নি পিয়ালী। সে ওই অসহায় মেয়েদের কাজকর্মের ব্যবস্থাও করেছে। গৃহহীনদের ঘরও করে দিয়েছে। মানুষ পানীয় জল পেয়েছে। মরুভূমির মতো দেশে স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়েছে।

বাসন্তী বলে, আগে তো এসব কাজ হয়নি মা। তবু লোকের উপকার হচ্ছে।

পিয়ালী বলে, সরকার তো তাই চায় মা, সেই কাজ করার চেষ্টা তো করতে হবে।

বাসন্তী বলে,

—তা হলে করো মা। মেয়েরাও যে সব কাজ ছেলেদের থেকে ভালো পারে তাই দেখাও।

নটবরও দেখেছে বাসন্তীর সঙ্গে পিয়ালীর সম্পর্কটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। কিন্তু নটবর নিজের স্বার্থের জালে এভাবে জড়িয়ে গেছে যে সেই জাল কেটে বের হতে পারছে না। তাই তার আর পিয়ালীর মধ্যে একটা যেন অদৃশ্য প্রাচীর-ই রয়ে গেছে।

তবু নটবরকে সহজ হতে হবে। সেই চেষ্টাও করে নটবর। মাঝে মাঝে পিয়ালীর শরীরের খবরও নেয়।

বলে,

—এত ঘোরাঘুরির কাজ—বাড়ির গাড়ি তো রয়েছে। নিয়ে যাও—

পিয়ালী বলে,

—সাইকেলেই সব জায়গায় যাওয়া যায়।

নটবরও দেখেছে পিয়ালীর কর্মক্ষমতা। সেদিন নটবর বলে,

—বনের মধ্যে ওইসব গুলি গোলা চলল। তার জন্য ধরাও পড়েছে গ্রামের অনেকে। ওদের ছাড়াবার ব্যবস্থা কিছু করো।

পিয়ালীও বলে,

—পুলিশ ওদের জামিনে ছেড়ে দেবে,

—আর এসব ঝামেলা যাতে না হয় তার জন্য সুরেশবাবু তোমার সঙ্গে দেখা করে কথা বলতে চায়,

পিয়ালী ওই নামটা শুনে বলে,

—উনিই তো এসবের মূল। আসানসোল ফিল্ডে অশান্তি পাকিয়ে এবার এ দিকে আসতে চান।

নটবর বলে, —তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে দেখো। যদি ওকে পথে আনতে পার। এদিকে কোনও কারখানা নেই। তবু যদি কারখানা হয় এদিকের উন্নতি হবে। লোকে কাজ পাবে।

পিয়ালীও ভাবছে। এদিকে শিল্প কারখানা গড়তে আসলে সে তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাবে। এযুগে উন্নয়নের জন্য এসবের দরকার। পিয়ালী বলে,

—তা হলে ওঁকে আসতে বলুন। কথা বলে দেখি।

নটবর আশার আলো দেখে।

তৈরি হয়েই এসেছে সুরেশজি। নটবরের বাড়িতেই আসে সুরেশজি তার দামি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়িতে। ভিতরটা এত গরমেও বেশ ঠান্ডা। সুরেশজিকে বরণ করে নিতে নটবরও তৈরি। জানে নটবর আজ সুরেশবাবুকে যদি খুশি করতে পারে, শুধু অনেক কিছু পাবে না, হারানো জমি ফিরে পাবে সে।

নটবর চায় না এসব আলোচনা বসার ঘরে হোক, তাই বাড়ির দোতলার ঘরে ওদের আলোচনার ব্যবস্থা করেছে। আর তারপর অতিথি সৎকারের জন্যও বিশেষ আয়োজন করেছে। শহর থেকে ভালো সন্দেশ ফলমূলও আনিয়েছে। সুরেশজি নাকি শাকাহারি, তার জন্য নিরামিশ রান্নার ব্যবস্থাও হয়েছে। বাড়ির দুধের তৈরি ক্ষীর, ছানা ইত্যাদির আয়োজনও করেছে।

পিয়ালীও দেখেছে বাড়িতে বিশেষ অতিথির জন্য নানা আয়োজন হচ্ছে। নটবর গ্রামে থাকলেও তার গাড়ি আছে। বাড়িতে আধুনিক সব কিছুই এনেছে সে। এমনকী, বাড়ির মেঝেতেও টালি বসিয়েছে। পিয়ালী দেখে রান্নাঘরের ব্যস্ততা। সে বুঝেছে নটবরের কাছে সুরেশবাবুর কদর যে অনেকখানি।

সুরেশজির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে পিয়ালী আগেই খোঁজখবর নিয়েছে, পচাও জামিনে খালাস পেয়েছে। আর পঞ্চায়েত থেকে পিয়ালী সেটা করিয়েছে। ওই পচাই অনেক খবর দিয়েছে। এ নিয়ে পঞ্চায়েতে অনেক আলোচনাই হয়েছে। ওই সুরেশজির দল এতকাল ধরে এত কয়লা পাচার করছে। পুলিশ ওদের বাধা দেয়নি। নীরবে সমর্থন করেছিল ওদের কাজ কিন্তু পচার দল ওদের বাধা দিয়েছিল ওই কয়লা পাচারের কাজে। আর ওদের তোলা প্রচুর কয়লা ডাম্পারও আটকে দিয়েছিল। সে সব কয়লার গাড়ি পুলিশ সব সিজ করে। কিন্তু কোনও গাড়িরই নাম্বার ঠিক ছিল না। ফলে আসল মালিকরা কৌশলে এড়িয়ে গেছল। ধরা পড়েছিল চুনোপুঁটির দল। সুরেশজির গায়ে হাতও পড়েনি।

সে ছিল ধরাছোঁয়ার বাইরে।

সেই সুরেশজি এসেছে পিয়ালীর কাছে। সুরেশ তৈরি হয়েই এসেছে। আলোচনার সময় সুরেশ নটবরও রয়েছে। সুরেশ এর মধ্যে অ্যাটাচি থেকে একটা দামি নেকলেস আর বালা বের করে।

পিয়ালী এসব দেখেনি আগে। তবে ওর চাকচিক্য দেখে বুঝতে পারে, এর দামও অনেক। এ ছাড়াও সুরেশ নোটভর্তি ব্যাগ এগিয়ে দেয়। পিয়ালী এসব দেখে অবাক হয়, নটবরের চোখ জ্বলে ওঠে।

সুরেশজি বলে,

—পিয়ালীজি প্রথম এলাম। আপনার জন্য থোড়া ভেট। কবুল করলে খুশি হবে।

পিয়ালী চুপ করে থাকে, নটবর ওকে চুপ করে থাকতে দেখে খুশিই হয়। তার মনে হয় পিয়ালী এসব মেনে নিয়েছে। এবার সুরেশজি বলে, —আমি আর নটবরজি দুজন ওই কয়লার কিছু কারবার করছি। দুসরা লোক চোরি করে লিচ্ছে। আমরাই তার চুরি বন্ধ করে নিজেরা কিছু করব। কোল অথরিটিকে আপনি কিছু লিখবেন না। চুপচাপ থাকুন। কোলে অথরিটির কর্তাদের আমি সামলে নোব। আর দুসরা বাত,

এই বলে, সে ওই স্পঞ্জ আয়রন কারখানা করার জন্য দরখাস্তটাই বের করে বলে,

—এদিকে হামরা কারখানা করব। লোকের কাজ হবে। আপনি শুধু নো অবজেকশনটাই সই করে দিন। দুটো কারখানা চালু হয়ে যাবে। আপনার এলাকার হাল একদম বদলে যাবে।

পিয়ালী জানে ওই কারখানা নিয়ে এবার তার পাশের পঞ্চায়েত গঙ্গামাটি পঞ্চায়েতে জনরোষ শুরু হয়েছে। এদিকে জমিতে কিছু ধান শুধু হয়। কিন্তু কারখানার ওই বিষাক্ত ধোঁয়া ছাই সমস্ত এলাকার ওই ধানচাষকে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। হাহাকার পড়ছে ওদিকে। আর ওই সব কারখানার কাজের লোকও বেশি লাগে না। সে সব শ্রমিক আসে অন্য কারখানার ছাঁটাই করা শ্রমিক। স্থানীয় লোকেদের কণামাত্র উন্নতি হয়নি। সর্বনাশই হয়েছে। ওর নিজের এলাকায় সে সর্বনাশ কিছুতেই হতে দেবে না পিয়ালী।

ওকে চুপচাপ থাকতে দেখে সুরেশজি বলে,

—নটবরজিও ওই কয়লার কারবার কারখানার পঁচিশ পার্সেন্ট মালিক হবে। বছরে কয়েক লাখ টাকা পাবে। আপনাকেও হামি খুশি করে দেবে।

নটবর বলে,

—এত কী ভাবছ বউমা, নাও উনি কী কাগজপত্র এনেছেন সই করে দাও। তা ছাড়া

নিজেরও তো ভবিষ্যৎ আছে। এসব কেউ জানতে পারবে না। পরে না হয় দলের দু চারজনকে কিছু দিয়ে সামলে নেবে।

সুরেশজি বলে,

—মাসে মাসে ওদের ভি কিছু টাকা দিব। ও ভি খুস থাকবে আপনার ভি কিছু আসবে।

নটবর বলে,

—আমাদেরও ভবিষ্যতের কিছু একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে মা, সই করে দাও মা।

পিয়ালী সিন্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এমনই একটা প্রস্তাব নিয়ে সুরেশজি আসবে সেটা সে অনুমান করেছিল। পিয়ালী ওই গহনার বাক্স আর টাকার ব্যাগটা সুরেশজিকে ফিরিয়ে দিয়ে বলে,

—এসব নিয়ে যান,

নটবর চমকে ওঠে, সে বলে,

—কী বলছ মা, উনি এনেছেন তোমার জন্য। কত দামি জিনিস।

—উনি আমার বিবেক আদর্শ মনুষ্যত্বকে কিনতে এসেছেন ওই টাকা গহনা দিয়ে। ওই কয়লা চুরির মদত দিতে হবে আমাকে? সারা এলাকায় মানুষের চাষবাস বন্ধ করে উনি দূষণ করে কারখানা চালাবেন তাতে মত দিতে হবে? আপনারা দেশের সম্পদ লুঠ করেন। মানুষের অন্ন কেড়ে নিয়ে আকাশ-বাতাসকে বিষিয়ে দিয়ে মানুষকে তিলে তিলে মারবেন তাতে মদত দিতে আমি পারব না। এ আমি হতে দেব না।

সুরেশজির মুখচোখ অপমানে রাগে লাল হয়ে ওঠে। সে বলে,

—কাজটা কিন্তু তুমি ঠিক করছে না প্রধানজি। আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে তোমার লাভই হবে।

—না হলে ? তেজদৃপ্ত কণ্ঠে পিয়ালী বলে ওঠে।

—না হলে, আখেরে পস্তাতে হবে। জবাবটা কঠিন স্বরে জানিয়ে দেয় সুরেশজি।

নটবর বলে,

—বউমা কথাটা ভেবে দ্যাখো। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না। আরে শুধু ওদিকটায় একটু চুপচাপ থাকবে। এদিকের পথঘাট স্বাস্থ্যকেন্দ্র পানীয় জলের ব্যবস্থা ওইসব কাজ আরও করো। সুরেশজির কথা শোনো।

—আপনাদের কথা আমি রাখতে পারলাম না। জেনেশুনে এত বড় ক্ষতি আমি হতে দেব না। আমায় মাফ করুন। আর এ ব্যাপারে আমি কোল ইন্ডিয়া এবং দিল্লিতে মন্ত্রীদের সাথে কথা বলব। আপনারা ওই সর্বনাশা কারখানার কথাও ভাববেন না। আমরাই বাধা দেব।

উঠে পড়ে পিয়ালী।

সুরেশজি কঠিন স্বরে বলে,

—শুনলে নটবরজি। আমাকে এইখানে এনে এভাবে ইনসাল্ট করলে। একটা মামুলি লেড়কি আমাকে চমকাবে। ঠিক আছে।

সুরেশ এবার মালপত্র বন্ধ করে উঠে পড়ে।

নটবর বিপদে পড়ে, সে বলে,

—নারাজ হবেন না সুরেশজি। আমি আজ রাতে আবার ওর সঙ্গে কথা বলব। ওকে বোঝাব, আমাদের কাজ ঠিকই হবে।

—দেখুন বুঝিয়ে। কাল পরশুর মধ্যে আমাকে খবর দেবেন।

নটবর ওকে চটাতে চায় না, বলে,

—ভাববেন না। আমি ঠিক মতো করাবই—

—রাজি না হলে একটা পথ আছে। ঠিকমতো করতে পারলে সবদিকে বজায় থাকবে।

—পথটা কী শেঠজী! বলুন সোজাপথে কাজ না হলে ওই পথই নেব। কাজটা করতেই হবে।

সুরেশজি বলে,

—আগে ওর সঙ্গে বাতচিত করেন, তারপর গড়বড় করলে তখন দুসরা রাস্তা নিতে হবে। চলি—

—একটু কিছু খেয়ে গেলেন না গরিবের বাড়িতে!

—কাম হোক, তখন খাব নটবরজি—

সুরেশজি ক্ষুণ্ণ মনেই না খেয়ে চলে যায়।

ভবেশ এসেছে শহর থেকে সেই রাত্রে। পিয়ালী অবশ্য কথাটা পঞ্চায়েত অফিসেও কাউকে বলেনি। ভবেশকে বলে, ভবেশ পিয়ালীর কথা শুনে কী ভাবছে সে তার বাবাকে চেনে। এর আগেও ওর বাবা অনেক কুকাজই করেছে। দুর্বার লালসা ওর। এবার সে ওই সুরেশজির মতো লোকের পাল্লায় পড়ে একেবারে বদলে গেছে। নটবরের স্বার্থেই নটবর সুরেশজিকে এনেছিল এখানে। পিয়ালীকেও কিনতে চেয়েছিল ওরা। ভবেশ বলে,

—তুমি ঠিক কাজই করেছ। তবে ওদের বিশ্বাস নেই পিয়ালী। ওদের স্বার্থে ঘা লাগলে ওরা কাউকে ক্ষমা করে না। তোমাকেও করবে না। তাই বলি সাবধানে থেকো।

পিয়ালী সেটা বুঝেছে। তবু এমনিতে সাহসী আর বেপরোয়া। তাই বলে,

—ওরা আমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আমি ওদের এই চোরাকারবার বন্ধ করব। আর ওই কারখানা করে এলাকার মানুষের পরমায়ু শেষ করতে দেব না। কিছুতেই দেব না। আমি দেখছি এখানে যাতে সরকারি কোলিয়ারি চালু হয়। তা হলে পথ-ঘাট অফিস সব চালু হবে। বহু লোকের অন্ন-সংস্থান হবে।

পঞ্চায়েতের বেশির ভাগ সদস্য এটা চায়। সারা এলাকার মানুষ। পিয়ালী তাই দিল্লিতে দরবার করেছে এ নিয়ে, যাতে কাজ চালু হয়।

নটবর পরিদিনই কথাটা আবার পিয়ালীকে জানায়। সে বিশ্বাস করে পিয়ালী ঠিকই রাজি হবে, এর ওপর নটবরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। গদি-র সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত টাকা আমদানি হবে তার। নটবর বলে,

—কেউ গোলমাল করলে তার মুখ টাকা দিয়ে বন্ধ করে দেবে, দেখবে টাকার জন্য কারও কোনো আপত্তি থাকবে না। ওদিকের কাজও যেমন চলছে চলবে। যা পাবে তাতে সারাজীবন ভালোভাবে চলে যাবে।

পিয়ালী বলে,

—ওসব কথা বলবেন না। কমিটিতে এ নিয়ে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমরা দিল্লিতে লিখছি। এখানে কোলিয়ারি চালু করে ওরা এসব কয়লার সদ্ব্যবহার করবে।

নটবর চমকে ওঠে। কোলিয়ারি চালু হলে পাহারা বসাবে কোম্পানি আর তাদের বেআইনি ব্যবসা চলবে না। কয়লার ব্যবসা না চললে আয়রন ফাউন্ডারিও হবে না। একেবারে পথে বসতে হবে। আর সুরেশজিও চুপ করে থাকবে না। তার মনে হয় এই পিয়ালী যেন জেনেশুনে তাকে শেষ করার চক্রান্ত করেছে।

পিয়ালীও উপর মহলকে জানিয়েছে এখানে প্রচুর কয়লার কথা। স্থানীয় পুলিশও ব্যাপারটা জেনেছে। ফলে কয়লা মন্ত্রকও নড়েচড়ে বসেছে। ওরাও রিপোর্ট নিয়ে দেখেছে। এখানে উন্নতমানের কয়লা মাটির খুব কাছাকাছি রয়েছে। কয়লার প্রথম স্তর মাটির দশ-পনেরো ফিট নীচেই রয়েছে। দ্বিতীয় স্তর রয়েছে তিনশো ফিটের মাথায় আর জিওলজিক্যাল সার্ভে তা জানিয়েছে কয়লার তৃতীয় স্তরও আছে আট-নশো ফিট নীচে। অর্থাৎ এখানে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কয়লা তুলতে পারলে এই সম্পদ দীর্ঘদিন ধরে বজায় থাকবে। আর তা সরকারি লাভজনক ক্ষেত্রও হবে। এসব রিপোর্ট আগে অবশ্য কোনও রহস্যজনক কারণে পেশ করা হয়নি।

এবার এই খবর পেতে কোল অথরিটি এখানে কোম্পানি করার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তার প্রাথমিক পর্ব হিসেবে এখানে বনের মধ্যে বেশ কয়েকটা ক্যাম্প করে সেখানে স্পেশাল পুলিশ ফোর্সও বসায়। সুরেশজি এসব খবর পায় আগে থেকেই। কিছু লোক সুরেশজির কাছ থেকেও প্রতি মাসে একটা করে খাম পেত, তাদের প্রণামিও বন্ধ হয়ে যায়। তারও হাত থেকে এই সম্পদ বেদখল হয়ে যায়।

পচা লোহার এর আগেও ডাকাতির দায়ে হাজতবাস করেছে। তখন দেহে অসুরের মতো শক্তি ছিল। এখন নটবরের দলে থেকে বেশি কিছুটা আয়েসী হয়ে পড়েছে। এ কাজে ঝুঁকি ছিল না। টাকাও ভালো আসত। দু একটা খুনখারাপি করেও বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু নটবরের গদি চলে যেতে সেও বিপদে পড়ে। ওই কয়লা পাচারকারীদের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে হাজতবাসও করতে হয়। সেই মামলা এখনও চলছে—আবার জেলে না যেতে হয়।

কামিনী এখন পিয়ালীর সমবায়ের একনিষ্ঠ কর্মী, সারাক্ষণ পিয়ালীর সঙ্গেই থাকে। পিয়ালীও জানে পচাকে, কামিনী বলে,

—লোভের বশে অনেক খারাপ কাজ করেছে গো লোকটা। তবে লোকটা খারাপ লয় গো। ও এসব আর করতে চায় না।

—আমি তো ওকে চিনি।

—মুখপোড়া, তোমার সঙ্গেও শয়তানি করেছে ওই নটুবাবুর কথায়, সেই লাজে তোমার সামনে আসতে চায় লাগো। না হলে ও এসে তোমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইত।

পিয়ালী জানে পচার মতো মানুষেরা অভাবের বশেই নিজেদের এইভাবে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। আর শয়তানের দলও ওদের কিনে নিয়ে তাদের দিয়েই নানা অন্যায় কাজ করিয়ে নেয় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। মানুষকে এইভাবে তারা অমানুষ বানিয়ে তোলে। পিয়ালী এদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে। সে অঞ্চলের গরিব মানুষের কাজের ব্যবস্থা করতে চায়। কোল অথরিটির কর্তারাও এবার পিয়ালীর প্রস্তাবমতো এখানে এসে নিজেরা সবিস্তারে

মাপজোক করে চলেছে। কোথায় মেন পিট হেড হবে। কোথায় তারা ওপেন কাস্টকোলিয়ারির কাজ শুরু করবে। কোথায় ক্রেন বসবে—এসব সার্ভে চলছে।

ওদিকে বনের মধ্যে ফাঁকা প্রান্তরে শুরু হবে কোয়ার্টার অফিস বিলডিং তৈরির কাজ, শুরু হবে ডিপ টিউবওয়েল তৈরির কাজ, বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হবে এবার।

পিয়ালীও কর্তাদের বলে,

—এ অঞ্চলের কিছু লোককে কাজে নিতে হবে, এককালে যারা চুরি করত তাদের পাহারাদার করুন। অন্য কাজ দিন। কোনো সমস্যা হবে না।

কর্তারাও বলে,

—এখান থেকেই লোক নেব। বাইরের লোক আসবে স্পেশাল কাজের জন্য। সদরে তদ্বির করে পচার মতো কয়লা চোরদের কাজে লাগিয়ে সরকারি সম্পদ বাঁচিয়েছে। মহামান্য আদালত তাদের বাঁচিয়েছে।

সেদিন পচা পঞ্চায়েত অফিসে এসে পিয়ালীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ায়। ওর চোখে জল। এতদিন সে লোককে ভয় দেখিয়েছে। আর নটবরেব কাছে পেয়েছে শুধু ধমক। মানুষের ভালোবাসার কোনও স্পর্শ সে পায়নি কোনও দিন। তার কথা কেউ ভাবেনি কখনও। তাই পচা পিয়ালীকে বলে,

—দিদিমণি, তুমি নিজে আমাকে ছাড়িয়ে আনলে। আমি তোমার সঙ্গে কত মন্দ ব্যবহার করেছি। এসব আমি কবতে চাইনি গো, তবু করেছি। আমি মহাপাপী।

পিয়ালী দেখছে পচাকে। একটা ঘৃণ্যদস্যু. সমাজ যাকে ঘৃণা করে এসেছে। কিন্তু মানুষই তাকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু পচাও মানুষের পরিচয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। আজ চোখের জল আর অব্যক্ত কান্নায় সেই কথাটাই ফুটে উঠেছে। ওরাও চায় সমাজের মূল স্রোতে ফিরতে। কিন্তু জঘন্য স্বার্থপর কিছু মানুষ রাজনীতির নোংরা আর্বতে ফেলে পচাদের সমাজের পচা দুষ্ট ক্ষতেই পরিণত করেছে। পচাও তবু মানুষের মতো বাঁচতে চায়।

পিয়ালী বলে,

—ওসব কথা ভুলে যাও, আবার ওসব ছেড়ে নতুন করে বাঁচবে। আমি ওই কয়লা অফিসের কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছি। চিঠিও দিয়েছি। ওরা কাজ করার জন্য লোক চায়। ওখানেই পাহারাদারের কাজ করতে হবে। পারবে?

পচা বাঁচার একটা নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে। সে বলে,

—এতদিন চুরি করেছি আর এবার পাহারা দিতে হবে, খুব পারব দিদি, দেখবেন মাছিটিও গলতে দেব না, এখানের সব শালা এই পচাকে চেনে।

পিয়ালীও চিঠি লিখে দেয় পচাকে।

নটবর আসে সুরেশজির কাছে। এখন আর ওই কয়লা পাচারের আশা নেই। সেখানে এখন কড়া পাহারা বসেছে। ওখানে বিজলির আলোয় উদ্ভাসিত, নানা কাজ চলছে,

সুরেশজি বলে,

—আর কী হবে নটবরজি। এখানের কাজ-কারবার আমি গুটিয়ে নিচ্ছে। কোলিয়ারির কিছু বিল্ডিং রোড এসবের কাজই করব। তোমার জন্যে আর কিছু করতে পারব না।

তোমার ওই বন্ধু আমাদের সঙ্গে দুশমনি করল। লাখো রুপেয়া কামাচ্ছিলাম, সব চোপাট করে দিল।

নটবরও সেটা জানে। তারও পায়ের নীচে মাটি নেই। দেখেছে এলাকার মানুষ আজ সুখী। এখন এখানের মানুষ ওই নতুন কোলিয়ারিতে কাজ পেয়েছে। জমির ফসলের ভালো বাজার পাচ্ছে। নটবরের আমলের ঘুমিয়ে থাকা একটা স্তব্ধ-গ্রাম নতুন প্রাণের হিল্লোলে জেগে ওঠে।

আকাশ এখানে আজও নীল বাতাসে ওঠে ভিজে মাটির মিষ্টি সোঁদা গন্ধ। সবুজের পাশে জন্ম নিয়েছে কোলিয়ারির জাগ্রত রূপ। এসবই সম্ভব হয়েছে পিয়ালীর জন্য। সে ওই লোভী স্বার্থপর মানুষদের কাছে আত্ম-বিক্রয় করেনি। সব প্রলোভনকে তুচ্ছ করে নতুন সমাজ গড়ার কাজে এগিয়ে এসেছে। তার পাশে নতুন প্রজন্ম। যারা পুরোনো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদের প্রাচীর গড়ে তুলেছে।

সুরেশ বলে,

—ক্যা দেখতা নটবর, তোমার মতো অকম্মা লোকেদের জন্যই আজ আমাদেরও সব হারিয়ে গেল। যাও—

ক্ষুব্ধ অপমানিত নটবর ফিরে আসে বাড়িতে। আজ সে ওই একটা মেয়ের কাছে হেরে গেছে। হতাশ হয়ে সে বাড়িতে ফিরে এসেছে দেখে বাইরের ঘরে তার আগেকার কমিটির ন'কড়ি, মধুও অপেক্ষা করছে। নটবরকে দেখে তারা বলে,

—সর্বনাশ হয়েছে নুটুদা।

নটবর চাইল, তার সর্বনাশ যা হবার হয়েছে। আবার নতুন কী সর্বনাশ হবে তা জানে না। ন'কড়ি চিঠিখানা দেখিয়ে বলে,

—তোমার নামেও চিঠি আসছে—তুমি তো প্রধান ছিলে, আজকের কমিটি আমাদের নামে নালিশ করেছে। আমরা নাকি লাখ লাখ টাকা নানা খাত থেকে সরিয়ে তছরুপ করেছি।

মধু বলে,

—তোমার বউমা গো।

নটবরের নামেও চিঠি এসেছে সরকারি অফিস থেকে। অ্যাকাউন্টের যাবতীয় হিসেব নতুন কমিটিকে বুঝিয়ে দিতে হবে। নইলে আদালতে কেস করবে। শাস্তিও হতে পারে।

মধু বলে,

—এসব কেসে জেল-জরিমানা দুইই হতে পারে,

ন'কড়ি বলে,

—শেষে এই বুড়ো বয়সে জেলে যেতে হবে নুটুদা। এসবের হিসেব তুমিই তো রাখতে। এখন কী হবে?

নটবর নতুন করে এক ভাবনায় পড়ে। পিয়ালী যেন চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে তাদের। এত অন্যায় করেছে যে এবার মুক্তি পাবারও পথ নেই। মান-সম্মান-অর্থ সবই যাবে। আর জেলবাসও করতে হবে তাদের।

নটবর বলে,

—আমি দেখছি কী করা যায়।

ন'কড়ি বলে,

—তাই দ্যাখো, না হলে আমরা কিন্তু আদালতে তোমার কীর্তি-কাহিনি সব ফাঁস করে দোব।

ওরা নটবরকে একপ্রকার শাসিয়েই চলে গেল। এতদিন নটবরের সামান্য কৃপা পাবার জন্য তার আশপাশে ঘুরত। আজ সেই স্তাবকদের দলই শাসিয়ে গেল তাকে।

তবে নটবরও থামবে না। এর শেষ দেখেই ছাড়বে সে। বাসন্তী এখন পিয়ালীর দিকেই বেশি ঝুঁকছে। সে মহিলা সমবায়ের কাজকর্ম দেখাশোনা করে, গ্রামের মেয়েরা পড়াশোনা আর কাজ নিয়ে ব্যস্ত। অভাবের কালো ছায়াটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, বাসন্তীর মনে হয় একজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এ সব সম্ভব হয়েছে। নটবরের সময়ে এসব হয়নি।

বাসন্তী দেখছে কদিন নটবর যেন কেমন আনমনা থাকে। সেই সুরেশজিও আর আসে না। রাতে ঘুম ভেঙে যায়, দেখে নটবর জেগে আছে। বাসন্তী বলে,

—কী ব্যাপার বলো তো। কদিন থেকেই দেখছি কী ভাবো দিনরাত এত ভাবনার কী আছে?

নটবর চেপে যায়, বাসন্তীকে সব কথা বলা যাবে না।

এখনও নটবরের গদির মোহটা যায়নি। পিয়ালী সরে গেলে নতুন করে নির্বাচন হবে। আর নটবরের দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আবার সব কিছু সামলে নিতে পারবে।

গদি তার চাই। তার জন্য দরকার হলে চরম পথই নেবে, তার সামনে বাঁচার এই একটা পথই খোলা আছে।

কদিন ধরেই কথাটা ভাবছে নটবর। তাই পচাকেই ডেকেছে রাতে।

পচা তার বিশ্বাসী অনুচর আর এসব কাজে পচা সিদ্ধহস্ত।

নটবর পচাকে বলে,

—কিছু টাকা রাখ।

একটা পাঁচ হাজার টাকার বাণ্ডিল বের করে দেয় পচার সামনে।

পচা দেখছে অতগুলো নোট। নটবর বলে,

—একটা কাজ করতে হবে। নরেশকে যেভাবে সরিয়েছিলি। সেইভাবেই আর একজনকে সরাতে হবে। কাজ হয়ে গেলে আরও কুড়ি হাজার টাকা।

পচা জীবনে অনেক কুকাজ করেছে। এখন সে আর এসব কাজ করতে চায় না। চুপ করে থাকে, নটবর ভাবে পচা রাজি হয়েছে, নটবর এবার তার শিকারের কথাটা বলে,

—সন্ধ্যার পর সাইকেলে করে আসে। বনের মধ্যে ওটাকে শেষ করে দিতে হবে। পাঁচ হাজার না বরং দশ হাজার আগাম রাখ।

পচা নটবরের মুখে ওই নামটা শুনে চমকে ওঠে। সে নটবরকে দেখতে থাকে, নটবর বলে,

—কী হল? কথা বলছিস না।

পচা বলে,

—এখন ওই কয়লা খাদানে কাজ করছি। ইসবে আর যাব নাই, আর তুমিও ইসবে যেও না নুটুবাবু।

নটবর ফুঁসে ওঠে।

—ব্যাটা জ্ঞান দিচ্ছিস চাকরি পেয়ে।

পচা বলে,

—তুমাকেও বলছি নুটুবাবু, দিন বদলেছে কিনা, তোমার দিন শেষ। ইসবে আর যেও না।

পচা টাকাগুলো ফেলে রেখেই চলে যায়। নটবর ভ্যাঙায়,

—ব্যাটা খুনে আজ ভদ্দরলোক হয়েছে, ঠিক আছে।

নটবরকে তার নিজের পথ এবার নিজেকেই করতে হবে। আর সেটা করতে হবে আজই, না হলে ওই পচাকে বিশ্বাস নেই। ও হয়তো কথাটা জানিয়ে দিতে পারে সকলকে। তাতে বিপদ আরও বাড়বে। তাই নটবরকেই একাজ করতে হবে। আর প্ল্যানটাও তার মাথায় এসে যায়, সেই রাতেই বাসন্তী তার ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে বাপের বাড়ি গেছে। ভবেশ রয়েছে শহরে, বাড়িতে নটবর, পিয়ালী আর কাজের দু-একজন লোক।

নটবরের শরীরটা ভালো নেই। সে শুয়ে আছে —পিয়ালীও রাতে ফিরেছে মহিলা সমবায়ের কাজ সেরে। নীচে খাবার ঘরে বামুন মেয়ে খাবার দেয় পিয়ালীকে। পিয়ালী জিজ্ঞাসা করে,

—বাবা-মায়ের খাওয়া হয়েছে?

বামুন মেয়ে জবাব দেয়।

—মা তো নেই, বাপের বাড়ি গেছে, বাবু উপরে, ওঁর শরীর খারাপ। খাবে না বললেন। তুমি খেয়ে নাও বউদি, রাত হয়েছে। পিয়ালী খেয়ে উঠে উপরে আসে। শ্বশুরমশাইয়ের শরীর খারাপ, খবর নেওয়া দরকার।

রাত নেমেছে। সারা গ্রাম স্তব্ধ। নটবর বাড়ির নীচে পিয়ালীর বাড়ি ফেরার কণ্ঠস্বর শুনেছে। সে জানে পিয়ালী খেয়েদেয়ে উপরে আসবে তার খবর নিতে।

এর মধ্যে উঠে গিয়ে নটবর উপরের কিচেনে ঢোকে। উপরের কিচেনে বিশেষ রান্নার ব্যবস্থাও রয়েছে।

নটবর ফিরে এসে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ে। পিয়ালী নটবরের ঘরে এসেছে। আলোটা জ্বালতে নটবর ফিরে তাকায়। পিয়ালী বলে,

—আপনার শরীর খারাপ শুনলাম।

—হ্যাঁ! মাথাটা ধরেছে। বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগেছে।

—কিছু খাননি?

পিয়ালীর কথার নটবর বলে.

—এক কাপ গরম দুধ হলে খেতাম। থাক্ তোমাকে আর হাঙ্গামা করতে হবে না। খেটেখুটে এলে।

—হাঙ্গামা আর কী বাবা! আমি আনছি সব কিছুই তো উপরের কিচেনে রয়েছে।

নটবর বলে,

—আবার কষ্ট করবে কেন? নীচে বামুন মেয়েকে বলো—

—ওরা এতক্ষণে খেয়ে দেয়ে হেঁশেল তুলে শুতে গেছে। আমিই আনছি।

পিয়ালী এগিয়ে যায় কিচেনের দিকে।

নটবর এবার উঠে বসে। ওর বুকে যেন ঝড় বইছে। তার জীবনের এ যেন একটা চরম লগ্ন। প্রতিটি মুহূর্তে যেন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে। স্তব্ধ চারিদিক, ঘড়ির টিকটিক শব্দটাও কানে বাজে নটবরের।

হঠাৎ স্তব্ধতা ভেদ করে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ওঠে। পিয়ালী খেয়াল করেনি যে কিচেনে শয়তান তার জন্য মৃত্যুফাঁদ পেতে রেখেছে। দুটো গ্যাস সিলিন্ডারের প্রায় অর্ধেকের বেশি গ্যাস ততক্ষণে বের হয়ে কিচেনের বন্ধ গ্যাসকে বিষাক্ত করে তুলেছে।

পিয়ালী খেয়াল করেনি।

আলো জ্বেলে ফ্রিজ থেকে দুধ বার করে। গ্যাস ওভেন জ্বালবার জন্য দেশলাই কাঠি জ্বালতেই নিমেষের মধ্যে সারা ঘর জতুগৃহে পরিণত হয়। আর ওই আগুনের মধ্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সারা বাড়ি কেঁপে ওঠে। রান্নাঘরে তখন জানলা দিয়ে বের হয়ে আগুনের লেলিহান শিখা। নটবরের চিৎকার শুরু হয়। যদিও সেটা খুশিতে না আতঙ্কে তা বোঝা যায় না। তার কাজ প্ল্যানমাফিকই হয়েছে নিখুঁতভাবে।

নটবরের চিৎকারে কাজের লোকরাও বেরিয়ে আসে। ওদের চিৎকারে গ্রামের লোকজনও এসে হাজির হয়। তারাই আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কে থানাতেও ফোন করে। বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন আয়ত্তে আসে। ততক্ষণে রান্নাঘরের পাশের ঘরেও আগুন লেগেছে। এদিকের দেওয়ালও খসে গেছে। আর ভিতরে পড়ে আছে পিয়ালীর বিবর্ণ পোড়া দেহটা।

নটবর উন্মাদের মতো হাহাকার করছে। এর মধ্যে খবর গেছে বাসন্তীর বাপের বাড়িতেও। বাসন্তীও এসে পড়ে। পুলিশও এসেছে। নটবর তখন আর্তনাদ করছে। বাড়ির লোকজন তখন রান্নাঘরে আগুন লাগার কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করে।

সকালে ভবেশও এসে পড়ে। সারা গ্রাম আশপাশের লোকজন—আবাল বৃদ্ধবনিতাও এসে পড়েছে। তাদের চোখে জল।

এসেছেন বিনয়বাবু—রমলাও।

সতীশ চাটুজ্যের পরিবারও এসেছে। সতীশ চাটুজ্যে চিৎকার করে।

—এ কোনো অ্যাকসিডেন্ট নয়। এ প্ল্যান করে বধূহত্যা করা হয়েছে। ওই নটবরবাবু গভীর জলের মাছ হে। আমার মেয়েকে মেনে নিতে পারেনি। ও সব করতে পারে।

মেয়েদের মধ্যেও এই আলোচনা ওঠে।

পুলিশ ওদের শান্ত করে ডেড বডি পাঠালো শহরে পোস্টমর্টেম করার জন্য। নটবর তখনও হাহাকার করছে—আমার ঘরের লক্ষ্মী চলে গেল।

—আমার কি সব্বনাশ হলো রে, ওই গ্যাস কোম্পানি দায়ী। ওদের আমি ছাড়ব না।

ভবেশ স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার চোখে ভেসে ওঠে পিয়ালীর সংগ্রামী মুখ-চোখ। তার হাসি, ভবেশও চেয়েছিল আজকের এই অবক্ষয় রোধ করতে, মেয়েরাও এগিয়ে আসুক। পিয়ালীও এসেছিল। কিছু করেও দেখিয়েছে। কিন্তু তার পর কী যেন হয়ে গেল।

এমনি ভাবনা ভাবে আরও একজন। সে পচা লোহার। আজ রাতেই পচাকে নটবর কিছু কাজের ভার দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পচা তা করতে চায়নি। কিন্তু সে কাজটাই হয়ে গেল এক রহস্যজনকভাবে। এই রহস্যের মূল আর কেউ না জানুক পচা লোহার জানে। সে দেখেছে এত মানুষের চোখের জল। আজ এলাকার হতদরিদ্র মানুষগুলো যেন তাদের এক আপনজনকে হারিয়েছে।

আর তাকে কে কেড়ে নিয়েছে তা জানে পচা লোহার। সে কিছুই করতে পারেনি। আজই যে এমনি করে ঘটবে তা পচাও কল্পনা করতে পারেনি।

ক'টা দিন নটবরের কাজের মধ্যে দিয়ে কেটেছে, পিয়ালীর মৃত্যু নিয়ে বেশ হইচই কিছুটা হয়েছিল। অবশ্য পোস্টমর্টেমে রিপোর্টে কিছু মেলেনি। নটবর একজন সম্মানীয় ব্যক্তি। এটা যে নিছক দুর্ঘটনাই পুলিশও এমনি কিছু মেনে নিয়েছিল। আর ভবেশও কোনও কথাই বলেনি, বাসন্তীই কেঁদেছিল বউমার জন্য।

ব্যাপারটা নটবরের ভালো লেগেছিল। এবার নটবরও শোক দুঃখ ভুলে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য ভাবছে।

এখন বোর্ডেরও সমস্যা দেখা দিচ্ছে। দুই পক্ষই সমান। তাই বোর্ড-এর নির্বাচন হবে ওই শূন্য আসনে। প্রধান হতেও বাধা নেই নটবরের। কিশোরও থাকছে ওদিকে। নটবরের চোখের জল আর বুকভরা হাহাকার ব্যর্থ হয়নি। প্রকাশ্য সভায় নটবর ঘোষণা করে,

—আমার বউমার অসমাপ্ত কাজে এবার আমি শেষবারের জন্য ভোট চাইছি। তার কাজ আমাকে শেষ করতে দাও। আমার ঘরের লক্ষ্মী। চোখের জলে বুক ভেসে যায় নটবরের। জনতার চোখেও জল।

নটবর বেশ বুঝেছে। পিয়ালীর মৃত আত্মার নাম করেই সে আবার হারানো গদি ফিরে পাবে।

নটবরও স্বপ্ন দেখে আবার তার হারানো গদি ফিরে পাবে। এর মধ্যে সুরেশজিও এসেছে রাতের অন্ধকারে। আবার নতুন করে সাম্রাজ্য গড়ার স্বপ্ন দেখে দুজনে।

নটবর ভোটের হাওয়া তার পালেই এনেছে। গদি তার চাই সেজন্য নটবর জানে তার বাহিনীকে আবার নতুন করে গড়তে হবে। দলের অনেকেই আবার এসেছে নটবরের কাছে। আসেনি পচা লোহার। সে নাকি এখনও কী করবে তাই ভাবছে।

পচা এখন চাকরি করছে। নটবরের তাকে দরকার, সে তার ভোট মেশিনারি। এদিকে ভোটের দিন এগিয়ে আসছে। নটবর পিয়ালীর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেছে। আর ভোটবাক্সে তত বেশি ভোট টানার কথা ভাবছে।

সুরেশজিও বেশ কিছু টাকা দিয়েছে।

সেদিন রাতে অল্পবৃষ্টি নেমেছে, নটবর তার মধ্যে প্রচারের কাজ সেরে বাড়ি ফিরেছে। নিজের ঘরে বসে ভোটের আয়ব্যয়ের হিসেব করছে। সামনে বেশ কিছু টাকাও রয়েছে। হঠাৎ পচাকে তার ঘরে আসতে দেখে চাইল নটবর।

পচা এসেছে তখন গভীর রাত। গ্রামের দিকে লোকে এসময় প্রায় শুয়েই পড়ে। ঘরেও আর কেউ নেই। নটবর বলে,

—আয় পচা তা হলে শেষ অবধি এলি। আরে তুই এতদিন আমার ভোটে কাজ

করেছিস। আমায় জিতিয়েছিস। তোকে না হলে তো চলবেই না। আয়—বোস!

পচা এগিয়ে আসে। চোখে ওর কঠিন চাহনি। যেন ঘৃণার অগ্নিশিখা ছিটিয়ে পড়ছে নটবরের দিকে। পচা বলে,

—এসেছি। তবে তোমাকে জেতাতে নয়। জীবনে অনেক পাপই করেছ। আমাদেরও পাপের ভাগী করছ। আর তোমাকে এ জীবনে জিততে হবে না।

নটবর চাইল। ওর চাহনি দেখে ঘাবড়ে গেছে নটবর।

—কী বলছিস পচা?

আর কোনও কথাই বলতে পারে না নটবর। পচার দুটো শক্ত লৌহ বেষ্টনীর মতো হাত নটবরের গলা টিপে ধরেছে। কঠিন চাপে নটবর ছট ফট করছে। চোখদুটো আতঙ্কে যন্ত্রণায় যেন বের হয়ে আসতে চায়। পচা লোহারের দুটো হাতের মুষ্টিতে এসেছে দুর্বার শক্তি। এতদিনের পুঞ্জীভূত লোভ-লালসা অন্যায়কে সে মেনে নিতে পারেনি এক পলকায় সেসব শেষ করতে চায়।

নটবর পা দুটো দাপাচ্ছে মুক্তির শেষ চেষ্টায়। ওর পায়ে লেগে ছিটকে পড়ে একটা ফুলদানি। ওদিকে রাখা টিনের বাক্স। বাড়ির কাজের লোকেরা ছুটে আসে। ততক্ষণে পচার হাতের কঠিন চাপে নটবরের দেহটা নিথর হয়ে আসে।

পচা পুলিশের সামনে জবানবন্দি দেয়। টাকার লোভে সেই নটবরকে খুন করেছে।

—বাবু মশায় গো আমি তো চোর-ডাকাত। তাই আর একটা ডাকাতকে শেষ করেছি।

পচা লোহার মাথা উঁচু করেই পুলিশের গাড়িতে উঠে সদরে চলে যায়। পিছনে পড়ে রইল এক নতুন নন্দীপুর আর নতুন সদ্যজাগ্রত গণদেবতা। যার প্রতিষ্ঠা করেছিল একটি মেয়ে। কামিনী সবই জানে তবু তার চোখে জল নামে। রাহুর গ্রাস থেকে সে নন্দীপুরের মানুষকে মুক্তি দিয়ে গেছে।